আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[Role of Islam in self-reliant nation building : Bangladesh Perspective]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ কামরুল ইসলাম
রেজিঃ নং : ১৯৬/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ শামছুল আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোঃ কামরুল ইসলাম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত **"আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ [Role of Islam in self-reliant nation building : Bangladesh Perspective]"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যত্র ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য গবেষক প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন।

(ড. মোঃ শামছুল আলম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ [Role of Islam in self-reliant nation building : Bangladesh Perspective]"** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ কোন প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশনার জন্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়নি এবং কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।

(মোঃ কামরুল ইসলাম)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং : ১৯৬/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যার অপার করুনায় " **আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ [Role of Islam in self-reliant nation building : Bangladesh Perspective]**" শীর্ষক এম ফিল অভিসন্দর্ভটি যথা সময়ে উপস্থাপন করতে পেরেছি। লাখ কোটি সালাত ও সালাম জানাই সাইয়েদুল মুরসালিন, রাহ্মাতাল্লিল আ'লামীন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি, উম্মাহাতুল মু'মিনীন, আওলাদে রাসূল, সকল সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যারা শহিদ হয়েছেন তাদের প্রতি ও সকল মুমিন মুসলমানদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম স্যারের প্রতি।

আমার তত্ত্বাবধায়ক ড মোঃ শামছুল আলম স্যারের আন্তরিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভ রচনা করা আদৌ সম্ভব হতো না। যিনি আমাকে হাত ধরে গবেষণা কর্ম শিখিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও ড. মোঃ শামছুল আলম স্যার সর্বক্ষণ আমার গবেষণা কর্মের তদারকি করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ও বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ সহ সার্বিক ব্যাপারে তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি যখনই গবেষণার কাজে কোন সমস্যায় পড়ে তার শরণাপন্ন হয়েছি তিনি আমাকে পিতৃস্নেহে সর্বাত্মক পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমার এ কাজে নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আন্তরিকভাবে সময় দিয়ে আমার এই অভিসন্দর্ভটির আদ্যপান্ত পাঠ করে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতির নিঁখুত প্রয়োগ, অধ্যায় বিন্যাস ও এর অবয়বসহ ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তার সহযোগিতার কারণেই। এজন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বর্তমান অভিসন্দর্ভের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে হুসাইন স্যার, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. মোঃ শাহ জাহান কবীর স্যার ও ডীন ড. মাহমুদুল হাসান স্যার আমার গবেষণা কাজে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সঠিক দিক নির্দেশনা আমাকে এ গবেষণায় উৎসাহ যুগিয়েছে। আমি তাঁদের সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা তাঁদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমাকে গবেষণার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দেশী-বিদেশী সম্মানিত লেখকদের প্রতি যাদের মূল্যবান রচনাবলী আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সেই অগণিত শিক্ষক মন্ডলীর প্রতি যারা ছোটবেলা থেকে অদ্যাবধি আমাকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন।

গবেষণা কর্মের তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, আল-

Dhaka University Institutional Repository

আরাফা ইসলামি ব্যাংক লাইব্রেরি, গণগ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ যারা আমার এ গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। সেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে অনেক সময় আমার পরিবারের সদস্যগণ আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী মিসেস আফরোজা বেগম এবং স্নেহের সন্তানেরা অধিকাংশ সময় আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েও তারা আমার মনোবল যুগিয়েছে। তাদের সকলের অবদানকে আমার জীবনে কল্যাণের সহায়ক জ্ঞান করি। আমার জীবনে সফলতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের দোয়া ও সহযোগিতা আমার অগ্রযাত্রার মাইলফলক হিসেবে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকল কর্মের সর্বোচ্চ প্রতিদান প্রদান করুন।

আমার গবেষণা কর্মের সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা ও মুদ্রণ কাজের সার্বিক তদারকিতে আন্তরিকতার সাথে সময় প্রদান ও অক্লান্ত পরিশ্রমকারী পল্লবী কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রভাষক জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করতে পেরে পরম করুনাময়ের নিকট আবারও শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করছি, তিনি যেন আমাদের সকল ভাল কাজে সহায় হন, কবুল করেন। আমিন!

– মোঃ কামরুল ইসলাম
(এম.ফিল. গবেষক)

প্রতি-বর্ণায়ন

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতি-বর্ণায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবৎকাল কোনো সুপরিকল্পিত ও সর্বজনীন সমাধানের মুখ এখনো দেখতে পায়নি। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবী বা উর্দূ শব্দসমূহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

أ	আ / া / ’	ر	র	ق	ক / ক্ব
إ	ই / ি	ز	য / ঝ	ك	ক
أ	ঊ /ু	س	স	ل	ল
أو	ঊ /ূ	ش	শ	م	ম
إي	ঈ /ী	ص	স	ن	ন
ب	ব	ض	দ / য	و	ওয়া/অ/ও
ت	ত	ط	ত/ ত্ব	ه	হ
ث	ছ	ظ	য/ জ	ء	আ
ج	জ	عَ	‘আ	ى	য় / ইয়া
ح	হ	ع	‘ই / ‘ঈ	ي	য়/ ইয়া
خ	খ	ع	‘উ / ‘	يي	ী / ঈ
د	দ	غ	গ		
ذ	য	ف	ফ		

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত শব্দ সংকেত পরিচয়

আ.	-	‘আলাইহিস সালাম। (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
সা.	-	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)
রা.	-	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা/‘আনহুমা/‘আনহুম/‘আনহুন্না । (আল্লাহ তাঁর/তাঁদের দুজনের/ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)
রহ.	-	রহ্‌মাতুল্লাহি ‘আলাইহি। (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)
তা.বি.	-	তারিখ বিহীন।
হি.	-	হিজরি।
খ্রি.	-	খ্রিস্টাব্দ।
পৃ.	-	পৃষ্ঠা।
ড.	-	ডক্টর (পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত)।
ঢা.বি.	-	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই.বি.	-	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
বা.এ.	-	বাংলা একাডেমি।
ইফাবা.	-	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রাগুক্ত	-	পূর্বে উল্লিখিত তথ্যের অনুরূপ।
আল-কুরআন, ২ : ৪	-	১ম সংখ্যা সূরা, ২য় সংখ্যা আয়াত নির্দেশক।
P., Pp.	-	Page. ; Pages.
Ed.	-	Edited by.
Edi.	-	Edition.
Op.Cit.	-	Opere Citato. (In the same Work).
Ibid.	-	Ibidem. (In the same place).

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[Role of Islam in self-reliant nation building : Bangladesh Perspective]

সারসংক্ষেপ

ইসলাম মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও মনোনীত ধর্ম এবং মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীতে মানুষকে স্বীয় প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। সমগ্র মানবতার মাঝে মুসলিমরাই এ খেলাফতের যোগ্য। অথচ মুসলিম জাতিই বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও পরনির্ভরশীল জাতি হিসেবে স্বীকৃত এবং পেশাগত দিক থেকে সর্বনিম্ন।

ভিক্ষাবৃত্তি মুসলিম জাতির মাঝেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম এ পেশাটিকে অসহায়ত্বের সর্বশেষ পর্যায়ে সর্বনিম্ন বৈধ পেশা হিসেবে বিবেচনা করেছে। বাস্তবতার নিরিখে ইসলাম পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে স্বনির্ভরতা অর্জনে উৎসাহিত করেছে। হযরত রাসূল (সা.) মানবতাকে হীনতম অবস্থা থেকে সম্মানজনক অবস্থায় সমাসীন করার লক্ষে ভিক্ষুকের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বহুল প্রসিদ্ধ ঘটনা, ভিক্ষুকের শেষ সম্বল কম্বল বিক্রয় করে কুড়াল ক্রয় করে দিয়ে স্বনির্ভরতার দীক্ষা প্রদান করেছেন। বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে স্বাবলম্বীতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের যথার্থ দিক নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম জাতিকে হীনমানসিকতা ও দুর্দশা থেকে মুক্তির নিমিত্ত এ বিষয়ে জ্ঞার্নাজন বিশেষ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে **"আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** গবেষণার অবতারণা। যখন বিশ্ব মানবতা বিরাজমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বিসহচাপে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, শোষিত ও বঞ্চিত। কেননা মানব রচিত অর্থব্যবস্থা মানব জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। শুধু তাই নয়, যে অর্থব্যবস্থা বর্তমান বিভিন্ন দেশে কার্যকর রয়েছে, তা পুঁজিবাদ হউক বা সমাজতন্ত্র, মানব জীবনে নিত্য নতুন জটিল সমস্যা ও অর্থনেতিক ব্যাধি সৃষ্টি করছে। যা সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে নির্মম কষ্টদায়ক দারিদ্র ও দুঃসহ অভাব অনটনের গভীরতম পথে। এ অর্থ ব্যবস্থায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে পেট ভরে খাবার, লজ্জা ঢাকার বস্ত্র ও রৌদ্র বৃষ্টি হতে রক্ষাকারী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত পরনির্ভর অসহায় হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় অত্র গবেষণাটি সময়োপযোগী ও যথার্থ নির্বাচন। এ গবেষণাটি দুদর্শাগ্রস্থ নিঃস্ব মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে ইনশা আল্লাহ।

পরনির্ভরশীলতা বিশ্বমানবতার জন্য অভিশাপ। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন; দারিদ্র মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে। এ জন্য প্রায় সবসময় আল্লাহ্র নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার খাদ্যে বরকত দাও, আর আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায রোযা করতে পারব না। আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্য পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

আমার অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে **"আত্মনির্ভরশীলতা ও ইসলাম"** এ অধ্যায়ে আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয়, ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব, দারিদ্র ও বেকারত্ব নিরসনে আত্মকর্মসংস্থান, ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কুরআনের নির্দেশনা, সুন্নাহর আলোকে আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়ের

আলোচনার পাশাপাশি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.), খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর জীবনাদর্শ এবং পূর্ববর্তী নবী ও রাসূল (আ.)গণের জীবনাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **"জাতি গঠন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ"** এ অধ্যায়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমি ও আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মনির্ভরশীলতার পথ নির্দেশনা ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা পরবর্তী আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সূচক সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

"আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা" শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা, মানব সম্পদ উন্নয়নে কুরআনের জ্ঞানের অপরিহার্যতা, আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইসলামী পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম "আত্মনির্ভরশীলতায় বাংলাদেশ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি"। এ অধ্যায়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য কর্মসংস্থান বিষয়ে মূখ্যত আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এ আলোচনায় কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের বাস্তব অবস্থা ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও এসব বিষয়ে ইসলামের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে নবী-রাসূলদের জীবন থেকে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

সর্বশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের গবেষণায় যে সকল তথ্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে সে আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে কিছু সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়ছে- **"গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা"**।

স্বনির্ভরতা অর্জনে কর্মসংস্থান যেমন জরুরী একটি বিষয় তেমনি একটি সুন্দর ও প্রশান্তিময় কর্মসংস্থানই আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে বিকল্পহীন পন্থা। আর ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এ কথা অত্যন্ত বাস্তব। ইসলামী অর্থনীতি, শ্রমনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হলে সে সমাজ বা রাষ্ট্র আত্মনির্ভরতায় গর্বের সাথে বিশ্বের মাঝে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। এ অভিসন্দর্ভটিতে বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যা জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অভিসন্দর্ভের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীলতায় দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে পারবে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনকালে গবেষণার সকল মূলনীতি অনুসরণের সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অভিসন্দর্ভের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। পাঠক মহল এবং সর্বসাধারণ যদি এ গবেষণা কর্ম থেকে উপকৃত হন তাহলেই আমার এ গবেষণা কর্মটি সার্থক হবে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আলহাম্‌দুলিল্লাহ।

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র II

ঘোষণাপত্র III

কৃতজ্ঞতা স্বীকার IV

প্রতি-বর্ণায়ন VI

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত শব্দ সংকেত পরিচয় VII

সারসংক্ষেপ VIII

সূচিপত্র X

ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায় : আত্মনির্ভরশীলতা ও ইসলাম ১৬

১. আত্মনির্ভরশীলতা ও ইসলাম ১৬

১.১. আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় ১৬

১.১.১. ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব ১৮

১.১.২. দারিদ্র ও বেকারত্ব নিরসনে আত্মকর্মসংস্থান ১৯

১.২. ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতা ২০

১.২.১. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কুরআনের নির্দেশনা ২২

১.২.২. সুন্নাহর আলোকে আত্মনির্ভরশীলতা ২৪

১.২.৩. ইসলাম আত্মনির্ভরতা অর্জনের কথা বলে ২৭

১.২.৪. নবী-রাসূলদের জীবন থেকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা ২৮

১.২.৫. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য মানব জীবনে উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : জাতি গঠন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ ৩৯

২. জাতি গঠন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ ৩৯

২.১. বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমি ও আত্মনির্ভরশীলতা ৩৯

২.২. আত্মনির্ভরশীলতার পথ নির্দেশনা ৭ই মার্চের ভাষণ ৪০

২.৩. মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্নে মৃত্যুকেও পরওয়া না করা ৪২

২.৩.১. দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ ৪৫

২.৩.২. আত্মসমর্পণ ৪৫

২.৪. স্বাধীনতা পরবর্তী আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ৪৬
২.৫. আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ৪৬
২.৬. স্বাধীন ও পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে জনগণের ব্যাপক আগ্রহ..... ৪৭
২.৭. জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সূচক সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান..... ৪৯

তৃতীয় অধ্যায় : আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা..... ৫২

৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা..... ৫২
৩.১. মানব সম্পদ উন্নয়ন ৫২
৩.১.১. মানব সম্পদ উন্নয়নে কুরআনের জ্ঞানের অপরিহার্যতা ৫৩
৩.২. সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা ৫৪
৩.৩. ইসলামি অর্থনৈতিক জ্ঞানের অপরিহার্যতা ৫৪
৩.৩.১. অর্থনীতির ইসলামি সংজ্ঞা ৫৪
৩.৩.২. ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৫
৩.৩.৩. অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মূলনীতি ৫৭
৩.৩.৪. কুরআনের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আয়াত..... ৫৯
৩.৪. আল কুরআনে বর্ণিত কর্মসংস্থান ৬২
৩.৪.১. কায়িক শ্রম..... ৬২
৩.৪.২. কৃষি প্রযুক্তি..... ৬২
৩.৪.৩. ভূমিকে যথাযথ উৎপাদনের কাজে লাগানো..... ৬৩
৩.৪.৪. নদী, সমুদ্র ও মৎস প্রকল্প ৬৪
৩.৪.৫. পশু-পাখি পালন ও চামড়া শিল্প..... ৬৪
৩.৪.৬. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ৬৫
৩.৪.৭. মৌমাছি পালন..... ৬৫
৩.৪.৮. বনজ সম্পদ ৬৬
৩.৪.৯. বস্ত্র এবং লৌহ শিল্প..... ৬৬
৩.৪.১০. চিকিৎসা বিজ্ঞান..... ৬৭
৩.৪.১১. গবেষণা ও উন্নতি ৬৮
৩.৪.১২. পর্যটন শিল্প ৬৯
৩.৫. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কর্মসংস্থান ৭৫
৩.৫.১. কর্মসংস্থান হিসেবে মাশরুম চাষ ৭৫
৩.৫.২. মধু সংগ্রহ ও চাষাবাদ ৭৫
৩.৫.৩. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য ব্যবসায় যা কিছু প্রয়োজনীয়..... ৭৭
৩.৫.৪. ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করে ৭৯
৩.৬. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইসলামী পদ্ধতি..... ৮২
৩.৬.১. জীবন হবে কর্মমূখর ৮২
৩.৬.২. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিকানা ৮৩
৩.৬.৩. বাড়ি কেনা-বেচার মধ্যস্থতা করা..... ৮৪

৩.৬.৪. বেচা-কেনায় দালালি করে উপার্জন করা ৮৫
৩.৬.৫. সৃজনশীল দক্ষতা.....৮৬
৩.৬.৬. অনলাইনে চাকরি ৮৭
৩.৬.৭. ওয়েব ডিজাইন.....৮৭
৩.৬.৮. অনলাইন সার্ভে.....৮৭
৩.৬.৯. হোম ডেলিভারি.....৮৯
৩.৬.১০. পেশা হিসেবে শিক্ষকতা ৯০
৩.৬.১১. গবেষণায় সাহায্য.....৯২
৩.৬.১২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন.....৯৪
৩.৬.১৩. কর্মসংস্থান হিসেবে পশুপালন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৯৬
৩.৬.১৪. আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য হালাল উপার্জনে উৎসাহ প্রদান ১০০
৩.৬.১৫. হালাল বা বৈধ উপার্জনের পদ্ধতি.....১০১
৩.৬.১৬. উপার্জনের প্রকারভেদ ১০৫
৩.৬.১৭. হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও ফযিলত.....১০৬
৩.৬.১৮. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য হালাল উপার্জনে করণীয়.....১০৯
৩.৬.১৯. আত্মনির্ভরশীলতা বিরোধী কর্মকাণ্ড অনুৎসাহিত ও নিষিদ্ধকরণ.....১১১
৩.৬.২০. হালাল উপার্জনে বর্জনীয়.....১১৭
৩.৬.২১. হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিক সমূহ.....১১৯
৩.৬.২২. আত্মনির্ভরতা অর্জনে পরনির্ভরশীলতা পরিহার করা.....১২১
৩.৬.২৩. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে আবাসন ব্যবসা ১২১
৩.৬.২৪. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে শ্রম.....১২৪
৩.৬.২৫. ইসলামে শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার.....১২৮
৩.৬.২৬. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য শ্রমিকদের কাম্য গুণাবলী ১৩৬
৩.৬.২৭. আল-কুরআনের বর্ণিত শ্রমিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য.....১৩৬

চতুর্থ অধ্যায় : আত্মনির্ভরশীলতায় বাংলাদেশ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১৩৯

৪. আত্মনির্ভরশীলতায় বাংলাদেশ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি.....১৩৯

৪.১. কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের বাস্তব অবস্থা ও ইসলামের শিক্ষা.....১৩৯
৪.১.১. বর্তমান শ্রমিক মালিকদের মনোভাব আত্মনির্ভরশীলতার পথে অন্তরায় ১৩৯
৪.১.২. নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যের বিলোপ সাধন.....১৪০
৪.১.৩. গৃহকর্মীদের অবহেলার শিকার হওয়া.....১৪১
৪.১.৪. শ্রমিক ও তাঁর শ্রমের গুরুত্ব ১৪২
৪.১.৫. কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে অবহেলা ও ইসলামের নির্দেশনা.....১৪৫
৪.১.৬. শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির সংগ্রাম ও ইসলাম.....১৪৬

৪.২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আত্মকর্মসংস্থান এবং চলমান বাস্তবতা ১৪৮
৪.২.১. কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের অপচয়ের স্পৃহা, এর পরিণতি ও ইসলামের নির্দেশনা১৪৮
৪.২.২. অপচয় ও অপব্যয় : বাস্তবতা.....১৫০
৪.২.৩. মাদকসহ অন্যান্য নেশার প্রতি আসক্তি.....১৫১
৪.২.৪. একজন কর্মীর সুস্থতা আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সহায়ক.....১৫২

৪.২.৫. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে কারিগরি শিক্ষা : ইসলামের নির্দেশনা ১৫৩
৪.২.৬. জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করতে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ১৫৫

৪.৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান : বাস্তবতা ও ইসলামী নির্দেশনা ১৫৬
৪.৩.১. হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি.....১৫৬
৪.৩.২. নবী-রাসূলদের জীবন থেকে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ.....১৬২
৪.৩.৩. শিশু বয়স থেকেই সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেওয়া ১৬৬
৪.৩.৪. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য অর্জনযোগ্য ব্যক্তিগত গুণাবলী.....১৭১
৪.৩.৫. নগদ পুঁজি বিহীন ব্যবসা আইডিয়া ১৭২
৪.৩.৫.১. পরিকল্পনা গ্রহণ.....১৭৩
৪.৩.৫.২. বিজনেস লাইসেন্স করা.....১৭৩
৪.৩.৫.৩. বাজারজাত করণ বা মার্কেটিং.....১৭৩
৪.৩.৫.৪. উপকরণ ব্যবসায়.....১৭৩
৪.৩.৫.৫. পণ্য উৎপাদন.....১৭৩
৪.৩.৫.৯. কনসালটিং ফার্ম.....১৭৪

পঞ্চম অধ্যায় : গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা.....১৭৬

৫. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা ১৭৬

৫.১. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে বাংলাদেশের কতিপয় সমস্যা.....১৭৬
৫.১.১. ইসলামী অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব ১৭৬
৫.১.২. জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় সহায়তা.....১৭৯
৫.১.৩. জনসাধারণের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের উৎসাহহীনতা.....১৮২
৫.১.৪. আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে যাকাতের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা ১৮৩
৫.১.৫. নিকটাত্মীয়দেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য যাকাত দেওয়ার বিধান.....১৮৪
৫.১.৬. সুফল পেতে প্রয়োজন যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো.....১৮৬
৫.১.৭. ইসলামী দৃষ্টিকোণে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য যাকাতের গুরুত্ব.....১৮৭

৫.২. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা.....১৯৩
৫.২.১. জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান.....১৯৩
৫.২.২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা.....১৯৬
৫.২.৩. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আমল.....১৯৭
৫.২.৪. সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার বাস্তবায়ন ১৯৮
৫.২.৫. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সরকারের জবাবদিহিমূলক জনসেবা প্রয়োজন.....১৯৯
৫.২.৬. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান ১৯৯
৫.২.৭. জীবনযাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা.....২০১
৫.২.৮. রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা ২০২
৫.২.৯. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি ২০৪
৫.২.১০. জীবিকা উপার্জনে সতর্কতা অবলম্বন করা ২০৫
৫.২.১১. নিজস্ব আয়ের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ করা ২০৬

৫.২.১২. রিযিকের অভাব মনে করে সন্তান হত্যা না করা ২০৭
৫.২.১৩. দানের অভ্যাস তৈরি করা..... ২০৮
৫.২.১৪. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে মালিকানার ধারণার পরিবর্তন করা ২০৮
৫.২.১৫. জীবিকা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ..... ২০৯
৫.২.১৬. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা..... ২১০
৫.২.১৭. ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করা ২১২
৫.২.১৮. অভাবগ্রস্থদের কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদান..... ২১৩
৫.২.১৯. শিল্প, কলকারখানা ও কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে উদ্যোগ গ্রহণ ২১৬
৫.২.২০. কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা ২১৬
৫.২.২১. ভালো কাজে সহযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা..... ২১৭
৫.২.২২. আধুনিক চাষাবাদের প্রচলন ২২৬
৫.২.২৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ তৈরি করা ২২৮
৫.২.২৪. শিল্পায়নে মানুষকে উৎসাহ দান..... ২২৮
৫.২.২৫. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ২২৮
৫.২.২৬. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে জনশক্তি রপ্তানি ২২৯
৫.২.২৭. সমাজের অপরাধী, বন্দী ও কয়েদীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহযোগিতা ২৩০
৫.২.২৮. লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন..... ২৩২
৫.২.২৯. অমুলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান ২৩২
৫.২.৩০. প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা..... ২৩২
৫.২.৩১. আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণে কতিপয় বিশেষ সুপারিশ..... ২৩৪
৫.২.৩২. অর্থ সম্পদ বৈধ পন্থায় বিনিয়োগ করা ২৩৫
৫.২.৩৩. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য পর্যটন শিল্পে যা করণীয় ২৩৭
৫.২.৩৪. আত্মনির্ভর জাতি গঠনে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা..... ২৩৮
৫.৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাসমুহ ২৪২
৫.৪. গবেষণা থেকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরকরণের উপায়সমূহ ২৪৩
উপসংহার **২৪৭**
গ্রন্থপঞ্জি **২৪৮**

ভূমিকা

ইসলাম একটি আদর্শ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানবজাতির সব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। ইসলামের স্বর্নযুগ ছিল মহানবি (সা.), সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ। বিশেষ করে সে যুগে কোন মানুষ অভাবে, দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করুক মুসলিম খলিফাগণ তা কখনও মেনে নেননি। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এর সময়ে সমাজের অভাবি, দরিদ্র, দাস-দাসী, মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত মানুষগুলোই সবার আগে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা তাদের অধিকার পূরণের পরিবর্তে তাদের উপর জুলুম, নির্যাতন, শোষণ করে সমাজের কতিপয় স্বার্থপর নেতারা খুব আরামে ও স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করছে। তারা জোর করে মানুষকে দাস-দাসীতে পরিণত করে নিজেরা লাভবান হচ্ছে। সমাজের শ্রমিক শ্রেণির মানুষ শ্রম দিয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাদের নেই কোন সম্পদ, নেই মানবিক মৌলিক অধিকার পূরণের ব্যবস্থা। মানুষ হয়ে মানুষের উপর প্রভু সেজে বসেছে। আর তারা আজীবন খেটেই যাচ্ছে তাদের পারিশ্রমিকের মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে এমনকি তাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে তাদের প্রভুদের হাতে। ইসলাম এ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মৌলিক অধিকার পূরণের সুন্দর ব্যবস্থা করছে। দাস প্রথার বিলোপ সাধন, বায়তুলমাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) তৈরি, সমবন্টন, ব্যক্তিগত সম্পদের ব্যবস্থা, নারীদের সম্পদে অধিকার ও তাদের কর্মের ব্যবস্থা, প্রভু-দাস ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রত্যেক মানুষ পরস্পর ভাই ভাই সম্পর্ক সৃষ্টি করে মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিচ্ছে। ফলে মক্কা-মদিনা হতে দ্যুতি ছড়িয়ে ইসলাম বিশ্বময় মানুষের হৃদয়ে তার জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

আজ বিশ্বের অনেক উন্নতি, অগ্রগতি হলেও মানুষ নানাবিধ অভাব অভিযোগে রয়েছে। তারা তাদের মৌলিক অভাব পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। কোন রাষ্ট্র, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান আত্মনির্ভর হতে পারছেনা। মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও ইসলাম রাষ্টীয় মর্যাদায় থাকলেও পরিপূর্ণ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়ায় সেখানেও রয়েছে নানা সমস্যা। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও আমরা নানাবিধ প্রতিকুলতার কারণে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারিনি। ফলে প্রায়ই দেখা যায় শ্রমিক বিক্ষোভ, আন্দোলন, নানা অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, মারামারি, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, প্রতারণা যাকে বলা যায় প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। এ দেশের মানুষ ইসলাম প্রিয় তাই অল্প সময়েই ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহনে যে সাড়া দিয়েছে তা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এক মাইলফলক।

কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতিতে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে না থাকায় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে গিয়ে জাতি, রাষ্ট্র বার বার হোচট খেয়ে বার বার উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করেও সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক মুক্তি ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনের সঠিক পথ খুজে বের করার নিমিত্তে আমার এ গবেষণা। এ গবেষণায় মূলত বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ব্যবস্থার পাশপাশি ইসলামি ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক, পরিবার, রাষ্ট্র কিভাবে আত্মনির্ভর হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। কেননা ইসলাম হলো এক চলমান গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। তাই চলমান সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে সঠিক পথ খুজে পাবার ব্যবস্থা ইসলামই দিতে পারবে। তাই আধুনিক বিশ্বের এই অর্থনৈতিক সংকটে আমার এ গবেষণা আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি। কারণ সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। তাই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রে যত বেশি ইসলাম চর্চা হবে ততই জীবন চলার পথ সহজ হবে। আল্লাহ আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশকে এবং এদেশের সকল মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন।

প্রথম অধ্যায়

আত্মনির্ভরশীলতা ও ইসলাম

১. আত্মনির্ভরশীলতা ও ইসলাম

পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলাম পরনির্ভরশীলতাকে অনুৎসাহিত করেছে এবং আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করেছে। এটি ইবাদাতও বটে। ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে- طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ "হালাল পন্থায় জীবিকা তালাশ করা ফরজ ইবাদতের পর আরেকটি ফরজ ইবাদত"।[১] জীবিকা অন্বেষণে মানুষ মানুষের উপর নির্ভরশীল হবে এটা ইসলাম কামনা করে না। তবে কর্মসংস্থানের জন্য নিজ দক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে যে কোনো কাজের মাধ্যমে উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের কোনো বিধি-নিষেধ নাই। তবে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী সকল মুমিনের সর্বান্তকরণে, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে হবে।[২] নিজের দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম ব্যয় করে উপার্জনের প্রচেষ্টা তথা জাগতিক জীবন-যাপনে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার সাথে তুলনা করলে চলবে না। কেননা মানুষের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই দায়িত্ব।[৩] আল্লাহ চান তার বান্দারা একমাত্র তার গোলামিই করুক। তাই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে শারীরিক সক্ষমতা দান করেছেন, যেন মানুষকে তাদেরই মতো কোনো সৃষ্টির কাছে মাথা নত করতে না হয়। শুধু শারীরিক সক্ষমতাই নয়; জীবিকা তালাশের জন্য আল্লাহ অসংখ্য উপায়-উপকরণও দিয়ে রেখেছেন। মূলত মানুষের জীবিকা আল্লাহ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ অধ্যায়ে আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় এবং এ সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সাথে সাথে মানবতার সামনে ইসলামে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত নবী-রাসূল (আ.) এর জীবনী থেকে কিছু উদাহরণও আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

১.১. আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয়

অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করতে পারার মধ্যেই জীবনের সফলতা নির্ভর করে। আর এটাই হলো আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীলতা এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Self-reliance. যার অর্থ হলো স্বয়ম্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মনির্ভর।[৪] আরবীতে اعتماد على النفس। অর্থ হচ্ছে আত্মনির্ভরতা, আত্মনির্ভরশীলতা।[৫] স্বনির্ভরতা, অপরের উপর ভরসা না করা, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো, নিজের প্রয়োজন পূরণে অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্যের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ কর্মের ব্যাপারে দায়িত্বশীল তা হোক দুনিয়াবী বা ধর্মীয় কাজ। এ কাজগুলো, তার উপর অর্পিত কর্তব্য সমূহ অন্যের উপর নির্ভর না করে

---

১ আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, শু*আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ. ৬, হাদীস নং- ৮৭৪১, পৃ. ৪২০

২ সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১২২

৩ সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৯

৪ https://www.english-bangla.com › dictionary › self-rel

৫ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফি, আধুনিক বাংলা-ইংরেজী-আরবী অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৮খ্রি., পৃ. ১১৮

নিজ দায়িত্বে সঠিকভাবে আদায় করতে পারার মধ্যেই তার জীবনের সফলতা নির্ভর করে। আর এটাই হলো আত্মনির্ভরশীলতা।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন,

أو ويكرمها يتأخر، أو بها يتقدم يضعها، أن شاء حيث نفسه ويضع وتبعتها، نفسه هم يحمل فرد فكل بصيرة على إليه لتسلك طريقه للنفوس الله بين وقد .تفعل بما مقيدة تكسب، بما رهينة فهي يهينها،

"প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব উদ্বেগ এবং নির্ভরতা বহন করে, এবং যেখানে সে এটি রাখতে চায় সেখানে নিজেকে রাখে, এটিকে অগ্রসর করে বা পিছিয়ে যায়, এটিকে সম্মান করে বা অপমান করে, কারণ এটি যা অর্জন করে তার জন্য জিম্মি, এটি যা করে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাঁর কাছে চলার জন্য পথ দেখিয়েছেন"।[৬]

আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, "Self-reliance is the ability to do things and make decisions by yourself, without needing other people to help you."[৭]

আবার কেহ কেহ বলেছেন,

الاعتماد على النفس أن يستيقن الإنسان أنه هو وحده مسؤول عن أعماله وعن الواجبات الملقاة عليه، الدينية والدنيوية وأن نجاحه في هذه الحياة مرتبط بأداء هذه الواجبات بنفسه لا بواسطة غيره.

"আত্মনির্ভরশীলতা হল যখন একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হন যে, তিনি একাই তার কর্মের জন্য এবং তাকে অর্পিত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকতে হবে এবং এই জীবনে তার সাফল্য অন্যের মাধ্যমে নয় বরং নিজের দ্বারা এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অর্জিত হবে"।[৮]

কেহ কেহ বলেছেন,

قيام خير بواجباته فيقوم أعماله، عن مسئولًا نفسه فرد كل يرى أن عن عبارة النفس على الاعتماد فإن العكس؛ وعلى وتقدمه، نجاحه أساس ذلك كل واستمراريته، ومواصلته وجهده، مثابرته أن ويعلم وتعاسته شقائه أساس وتهاونه ويأسه وكسله تسامحه

"আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তি তার কর্মের জন্য নিজেকে দায়ী দেখে, তাই সে তার কর্তব্যগুলি সর্বোত্তম উপায়ে পালন করে, এবং জানে যে তার অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, ধারাবাহিকতা এবং ধারাবাহিকতা এই সবই তার সাফল্য এবং অগ্রগতির ভিত্তি, বরং তার সহনশীলতা, অলসতা, হতাশা ও আত্মতুষ্টিই তার দুঃখ-দুর্দশার মূল ভিত্তি।"[৯]

---

৬ আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব, *তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*, বৈরুত : দারুসশুরুক, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ৩৭৬১

৭ www.colinsdictionary.com

৮ www.midad.com

৯ تربية الطفل على الاعتماد على نفسه شبكة المعارف الإسلامية www.almaaref.org

এ বিষয়ে হযরত রাসূল্লাহ (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "পবিত্রতম উপার্জন হলো- মানুষের নিজের হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক বিশুদ্ধ ব্যবসায় (এর উপার্জন)।"[১০]

এ বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্য হাদিসে আরো বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ

"মুত্তাকী, আত্মনির্ভরশীল ও লোকালয় হতে নির্জনে বাসকারী বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন"।[১১]

ইসলাম মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা দেয়। কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মানুষকে সেদিন দন্ডায়মান অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা হবে দুনিয়ার জীবনে তার হাত কি করেছে? অন্য কারো কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। প্রতিটি শিশুকে শিশুকাল থেকেই আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা উচিৎ। কেননা পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তারা নিজেরাই পিতামাতার সাহায্য ছাড়া খাবার খায় এবং এভাবেই তারা পৃথিবীর বুকে বেড়ে ওঠে। এই পরিবেশ আমাদেরকে এভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়।

১.১.১. ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব

ইচ্ছাশক্তি, শ্রমশক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি অর্জন করতে আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির মৃত্যু নেই। তারা কোনো দিন অধঃপতিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না কিংবা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় না। স্বাভাবিক বাস্তব জীবনেই লক্ষ্য করা যায়, যে যতটুকু কাজ করবে তারই অনুরূপ সে পাবে। ফল ব্যতিরেকে যেমন শস্য বা ফল-ফসলাদি আশা করা যায় না, তেমনি মানব জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি, সফলতা নির্ভর করে স্বাবলম্বীতা ও আত্মনির্ভরশীলতার উপর। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى وان سَعْيه سوْفَ يرٰى ثُمَّ يُجْزٰىهُ الجزَاءَ الاوْفٰى.

"মানুষ তাই পায়, যা সে করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে"।[১২] আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে দৈহিক সামর্থ্য ও মানসিক শক্তি দান করেছেন, ধর্মপ্রাণ লোকেরা যদি তাতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে জীবনে উন্নতি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা চালায়, তাহলে আল্লাহ তাকে সফলতা দান করেন। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানব জীবনে পরনির্ভরশীল না হয়ে প্রত্যেকেরই স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা ও অনুশীলন করা উচিত। স্বাবলম্বনের অনুশীলনে একজন মানুষ যে কোনো পরিবেশে যে কোনো অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তাই নিজের কাজ নিজেই করা উচিত। কেননা পরনির্ভরশীল জাতির যেমন কোনো মর্যাদা নেই, তেমনি পরনির্ভরশীল ব্যক্তিরও কোনো মান মর্যাদা নেই। পরনির্ভর লোক পরগাছা বা পরজীবীর মতো। অপরের দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার উপর সে ভরসা করে। এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, اِنَّ الله لايُغيِّرُمَا بقوم حتّى يُغيرُوْا بانْفُسِهِمْ "নিশ্চয়ই আল্লাহ

---

[১০] আলাউদ্দিন আল-মুত্তাকী আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ফি ফাযায়িলিল কাসবিল হালাল, বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং- ৯১৯৬

[১১] আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী [সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০খ্রি., খ. ৬, হাদীস নং- ৭১৬৩, পৃ. ৪৪৩

[১২] সূরা আন নাজম, আয়াত : ৩৯-৪১

তা'আলা কোনো জাতির ভাগ্য বা অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে"।[১৩]

এ সম্পর্কে মহানবীর (সা.) একটি শিক্ষাই যথেষ্ট তা হলো, হযরত আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক আনসারী ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর নিকট ভিক্ষা চাইতে এলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই? লোকটি বলল, অবশ্যই আছে। জিনপোশের একটি কাপড়; যার অর্ধেক পরি ও অর্ধেক বিছাই। আর একটি বড় পাত্র; যাতে পানি পান করি। নবী (সা.) বললেন, নিয়ে এস সে দুটিকে। লোকটি সে দুটিকে হাজির করলে আল্লাহর রাসূল (সা.) তা হাতে নিয়ে বললেন, এ দুটিকে কে কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব। নবী (সা.) বললেন, কে এক দিরহাম থেকে বেশী দেবে? এ কথা তিনি ২ অথবা ৩ বার বললেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, আমি ২ দিরহাম দিয়ে কিনব। তিনি ২ দিরহামের বিনিময়ে ঐ জিনিস দুটিকে বিক্রয় করে দিলেন। অতঃপর ঐ দিরহাম আনসারীকে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে এক দিরহাম দিয়ে তুমি খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর অপর একটি দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে নিয়ে আমার কাছে এসো।

লোকটি তাই করল। কুড়ালটি নিয়ে মহানবী (সা.) এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। তিনি নিজ হাতে তাতে একটি কাঠের বাট লাগিয়ে দিয়ে বললেন, যাও এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং তা বিক্রয় কর। আর যেন আমি পনের দিন তোমাকে না দেখতে পাই।

লোকটি নির্দেশমত চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। অতঃপর একদিন সে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তখন সে ১০ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড় কিনল এবং কিছু দিয়ে খাবার। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কালো দাগ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে এটা তোমার জন্য উত্তম। আসলে তিন ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়; (১) অত্যন্ত অভাবী, (২) চূড়ান্ত দেনা বা জরিমানার দায়ে আবদ্ধ অথবা (৩) পীড়াদায়ক (খুনীর) রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।[১৪] এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে'- এই নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

১.১.২. দারিদ্র ও বেকারত্ব নিরসনে আত্মকর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান যে কোন দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ দেশগুলো নিজের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেই শিল্পে সমৃদ্ধ হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দেশের শিল্পায়ন, ব্যবসায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক সীমিত তার নানান সীমাবদ্ধতার কারণে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হলে দেশে বেকারত্ব বেড়ে যায়। প্রচুর বেকার থাকা মানে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা। আর শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের বেকারত্ব মানেই এক ধরনের দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা। সমাজে বেকারত্ব বেড়ে গেলে সামাজিক অনাচার ও অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়টি সামনে আসে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীভূত করা সম্ভব হয়। একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান। আর সেই আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহন ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হওয়া খুবই কঠিন কাজ।

---

[১৩] সূরা আর রাদ, আয়াত : ১১

[১৪] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *আবু দাউদ শরীফ*, *ঢাকা :* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., হাদীস নং- ১৬৪১, পৃ. ৪২৫

বেসরকারিভাবে কিছু হলেও তা কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে সামান্যই ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সমাজের কর্মক্ষম বৃহত্তর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে যেহেতু রাষ্ট্রের চাকরিতে প্রবেশ করানোর সুযোগ নেই, সেহেতু আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই হচ্ছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার অন্যতম উপায়।

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা হচ্ছে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিজেই করা। আধুনিককালে এটি কর্মসংস্থানের একটি উপায়ও বটে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ তার নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে এবং নিজের সিদ্ধান্তে অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। মানুষ লেখাপড়া শেষ করে চায় একটি ভালো চাকরি। এসময় প্রয়োজনীয় অর্থ, পুঁজি, প্রশিক্ষণ নিয়ে সরকার বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরিতে এগিয়ে আসলে বদলে যেতে পারে সেই হতাশাগ্রস্ত মানুষের জীবন। আত্মকর্মসংস্থান এর মাধ্যমে একজন মানুষ শুধু নিজেই নয়, এর পাশাপাশি আরো অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজ তথা রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান রাষ্ট্রের চাকরির চাহিদার উপর চাপ কমাতে পারে এবং বেকার সমস্যার মত রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিরসনে অবদান রাখতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু এই আত্মকর্মসংস্থানে যারা জড়িত হবেন তাদের মনে আত্মবিশ্বাস তৈরি খুবই দরকার। নানা ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে আত্মবিশ্বাস। আর এ আত্মবিশ্বাস আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসাবে নিতে উৎসাহিত করে এবং ঝুঁকিও হ্রাস করে। আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে থাকে নিজস্ব অথবা ঋণ করা কিছু সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিতে হয়।

সরকারি ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, এন.জি.ও, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা সহ আরো নানা প্রতিষ্ঠান পুঁজি বিনিয়োগসহ প্রশিক্ষণ, পরামর্শ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বেকারত্ব হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক অভিশপ্ত এক জীবন। একটি দেশের উন্নয়নের হাতিয়ার হচ্ছে শ্রমশক্তি। এই শ্রমশক্তির অপচয় মানে উন্নয়ন গতিহীন হওয়া। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই সরকারের কাজ হতে পারে আত্মকর্মসংস্থানের মত বিষয়কে সামনে এনে অর্থনীতিকে গতিশীল করার পথকে মসৃণ করে দেয়া এবং বেসরকারি পর্যায়েও অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। কারণ রাষ্ট্রের অর্থনীতি বদলে দিতে পারে এমন ক্ষেত্রকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

১.২. ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতা

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টিই মানুষের জীবিকার একেকটি মাধ্যম। জমিনে কৃষিকাজের মাধ্যমে, পশুপাখি পালনের মাধ্যমে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আল্লাহ বলেই দিয়েছেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"নামাজ শেষে তোমরা জমিনে নেমে পড় এবং আল্লাহর দেওয়া রিজিক অন্বেষণ কর"।[১৫]

[১৫] সূরা আল-জুমুআ, আয়াত : ১০

অর্থাৎ আল্লাহ পৃথিবীতে যেসব উদ্ভিদ ও অন্যান্য উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেসবের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করে নিজেই জীবিকার পথ তৈরি করে নাও। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কিভাবে জীবিকা গ্রহণ করতে হয়, সে সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন- "আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না। আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন। তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চাঁদকে এবং তারকা সমূহও তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য যারা বুঝে। আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয় তাতেও নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোস্ত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকারাদি, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর"।[১৬]

এভাবে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মানুষের জীবিকা অন্বেষণের মাধ্যম বলে দেওয়া হয়েছে। আমরা সহজেই এসব মাধ্যমকে ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি। মহান আল্লাহর এসব বর্ণনা দ্বারা শুধু তার শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ পায় না; ইসলামে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্বও স্পষ্ট হয়। তা ছাড়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে ব্যবসা হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসাও জীবিকা নির্বাহের একটি ইসলাম নির্দেশিত সর্বোত্তম পদ্ধতি। হাদিসের বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। তাই আমাদের উচিত, কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত এসব মাধ্যম ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা। অন্যের উপর নির্ভর করা কিংবা অন্যের বোঝা হওয়া মুসলিমের কাজ নয়।

ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে- তোমরা নিজের কাজ নিজে কর, নিজের জীবিকা নিজেই নির্বাহ কর, অন্যের উপর নির্ভরশীল ও বোঝা হয়ো না। ইসলাম অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করতে যেমন নিষেধ করে, তেমনি নিজে কর্মক্ষম হয়েও অন্যের কাছে হাত পাততে নিরুৎসাহিত করে। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখুক ইসলাম এটাই চায়। এ জন্যই ইসলাম চায় মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াক, নিজের শারীরিক শক্তি কাজে লাগিয়ে তার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করুক। নিজের জীবিকার জন্য নিজেই প্রচেষ্টা করুক। আল্লাহ বলছেন, "মানুষ যতটুকু চেষ্টা করবে, ততটুকুই পাবে"।[১৭] আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেছেন, "কোনো জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তনে যতক্ষণ সচেষ্ট না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তার অবস্থার পরিবর্তন করেন না"।[১৮] একজন মানুষ নিজের মতোই দেহ বিশিষ্ট আরেকজন মানুষের কাছে হাত পাতবে কিংবা ভিক্ষা করবে এর মতো লাঞ্ছনা আর হয় না। তাই তো মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, '

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

---

১৬ সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫-১৪

১৭ সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৯

১৮ সূরা আর-রাদ, আয়াত : ১১

"নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন"।[১৯] হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন রাজা ও নবী। দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লোহা দ্বারা বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার কৌশল শিক্ষা দেন। শক্ত ও কঠিন লোহা স্পর্শ করলে তা নরম হয়ে যেত। যুদ্ধাস্ত্র, লৌহ বর্ম ও দেহবস্ত্র প্রস্তুত করা ছিল তাঁর পেশা। এগুলো বিক্রি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। শুধু দাউদ (আ.) ই নন; প্রত্যেক নবীই পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। হযরত রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ "نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

"মহান আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরি চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগন বলেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরি চরাতাম"।[২০]

হযরত রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীরাও পরিশ্রম করে জীবিকা অন্বেষণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। হিজরতের পর মদিনার আনসাররা তাদের সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ করে মুহাজিরদের দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে মুহাজিররা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে ক্ষেত-খামার ও বাজার দেখিয়ে দিতে বললেন, যেন তারা নিজেরাই কর্মসংস্থান করে নিতে পারেন। ইসলাম জীবিকা নির্বাহের কোনো হালাল পেশাকেই তুচ্ছ মনে করে না।

ইসলামে আত্মকর্মসংস্থানের এত গুরুত্ব এবং উপায়-উপকরণ থাকার পরও মুসলমানদের কেউ কেউ জীবিকা নির্বাহের জন্য বেছে নিয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি। কেউ আবার চেয়ারে বসে (অফিসিয়াল চাকরি) উপার্জন ব্যতীত অন্য উপার্জন করতে নারাজ। অনেকে চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিকে জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ইচ্ছা করলে কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়াই খুব সহজে আল্লাহর সৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হালাল পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করতে পারি। এতে দুনিয়ার জীবনে যেমন স্বস্তি লাভ করা যায়, আখিরাতেও লাভ করা যাবে অনন্ত কল্যাণ।

১.২.১. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে নানাবিধ উপকরণের মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। কি খাবে, কি পরবে ও কিভাবে জীবন ধারণ করবে তার সব উপকরণ আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে দান করেছেন। এই সব উপকরণ মানুষ নানাভাবে পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগি করে জীবনধারণ করে। অন্যান্য প্রাণিদের থেকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব। অন্যান্য প্রাণি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে সরাসরি পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আর মানবজাতি পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে জিবিকা নির্বাহ করে। এই জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে তাকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا

"তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, ক্ষার বিশিষ্ট"।[২১]

---

[১৯] আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) [সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৪২, পৃ. ১৭

[২০] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১১৯, পৃ. ১১২

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন, "আর উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক সীমারেখা, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান"।[২২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَ مَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۙ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ؕ

"দুটি সাগর একরূপ নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা ও বিস্বাদ। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত (মাছ) ভক্ষণ করে থাক এবং তোমাদের ব্যবহার্য রত্নাবলী আহরণ কর। আর তোমরা দেখ তার বুক চিরে জলযান চলাচল করে; যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও"।[২৩]

তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ) কিছুরও মালিক নয়"।[২৪]

---

[২১] মিষ্টি পানিকে فُرَات বলা হয়। এর মূল অর্থঃ কেটে দেওয়া, ভেঙ্গে দেওয়া। যেহেতু মিষ্টি পানি পিপাসাকে কেটে দেয় অর্থাৎ, দূর করে দেয়, সেহেতু তাকে ফুরাত বলা হয়। আর أُجَاج অর্থ ক্ষার বিশিষ্ট। যা এক অপরের সাথে মিলিত হতে দেয় না। আবার কেউ কেউ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا এর অর্থ করেছেন حَرَامًا مُحَرَّمًا ওদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে যে, মিষ্টি পানি লবণাক্ত ও লবণাক্ত পানি মিষ্টি যেন না হয়। আবার কেউ কেউ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ এর অর্থ করেছেন خَلَقَ المَاءَين দুই পানি সৃষ্টি করেছেন; এক মিষ্টি ও একটি লবণাক্ত। মিষ্টি পানি ঐসব পানি, যা নদী, ঝরনা ও কূপের পানিরূপে আবাদীর মধ্যে প্রাপ্ত হয়, যা মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আর লবণাক্ত পানি ঐসব মহাসমুদ্রের পানি, যা পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত। যার জন্য বলা হয় যে, পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি ও এক ভাগ স্থল; যার উপর মানুষ ও জীবজন্তু বসবাস করছে। সমুদ্র স্থির, তবে তাতে জোয়ার-ভাটা হয় এবং ঢেউ-সংঘাত বাঁধে। সমুদ্রের পানিকে লবণাক্ত করার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। মিষ্টি পানি কোন জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির থাকলে তা খারাপ হয়ে যায়। তার রঙ, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তন ঘটে। আর লবণাক্ত পানি খারাপ হয় না এবং তার রঙ, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তনও আসে না। যদি ঐ সব স্থির সমুদ্রের পানিও মিষ্টি হত, তাহলে তা দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। আর যার কারণে মানুষ ও জীবজন্তুর পৃথিবীতে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। তার উপর আবার তাতে মৃত জীবের দুর্গন্ধ। আল্লাহর হিকমত এই যে হাজার হাজার বছর ধরে এই সমস্ত সমুদ্র বিদ্যমান এবং তাতে হাজার হাজার জীব-জন্তু মরে গলে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ ওর মধ্যে লবণের এমন ভাগ রেখেছেন যে, যাতে পানির মধ্যে সামান্যতম দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় না। সমুদ্র হতে উত্থিত বাতাসও পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর এবং তার পানিও এ মর্মে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عن أبي هريرة قال: سأل رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركبُ البحر، ونحمل معنا القليلَ من الماء، فإن توضَّأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسولُ الله ﷺ: هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ ميتته

আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *সুনান তিরমিযী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি., খ. ১, হাদীস নং- ৬৯, পৃ. ৬৪-৬৫

[২২] সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত : ৫৩

[২৩] مواخر ঐ সকল জলজাহাজকে বলা হয় যা পানি চিরে চলাফেরা করতে থাকে

[২৪] সূরা আল ফাতির. আয়াত : ১২-১৩

১.২.২. সুন্নাহর আলোকে আত্মনির্ভরশীলতা

১.২.২.১. মহানবী (সা.)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) একজন শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। পরনির্ভরশীল নয় আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। আরবের ধনাঢ্য মহিয়সী নারী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) র ব্যবসায় শ্রম বিনিয়োগ করেছেন। ব্যবসায় নবীজির সততা এবং সফলতার গল্পও মক্কার অলিগলিতে বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমজীবী নবীজির ভক্ত-অনুরক্ত সাহাবারাও গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের উদাহরণ ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.), যিনি জান্নাতী নারীদের নেত্রী হবেন, তিনি বাঁদী বা কাজের লোকের শরণাপন্ন না হয়ে ঘরের সকল কাজ নিজেই করতেন। নিজে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজ হাতে জাঁতা ঘোরাতেন; এতে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে পানির মশক বহন করতে করতে বুকে দাগ বসে গিয়েছিল।

মহানবী (সা.) ছিলেন একজন সফল ও সৎ ব্যবসায়ী। তিনি এরশাদ করেছেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সঙ্গে"।[২৫]

তিনি গৃহের কাজ নিজ হাতে করতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন। নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই ও ধোলাই করতেন, গৃহ ঝাড়ু দিতেন। মসজিদে নববী নির্মাণকালে শ্রমিকের মতো কাজ করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী-রাসূলদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এই যে বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা কখনো ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতেন না এবং সঞ্চয় করা পছন্দও করতেন না। তথাপি যেহেতু তাঁরা মানুষ ছিলেন, সেহেতু বৈষয়িক প্রয়োজনে যতটুকু জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন, ততটুকু সম্পদ অর্জনে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। সদা-সর্বদা নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ করা পছন্দ করতেন। মানুষদের থেকে কখনো তাঁরা নজর-নেওয়াজ, এমনকি বেতনও গ্রহণ করতেন না। বরং যথাসম্ভব নিজেদের উপার্জন থেকে গরিব ও দুস্থদের সাহায্য করতেন। সব নবী-রাসূল ছাগল চরাতেন। "জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বললেন,

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ "نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

মহান আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরি চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগন বলেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরি চরাতাম। এমন কোনো নবী নেই, যিনি ছাগল চরাননি"।[২৬] বিশেষ করে মুহাজিররা ছিলেন ব্যবসায়ী আর আনসাররা ছিলেন কৃষক।

১.২.২.২. খুলাফায়ে রাশিদীন

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন আরবের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। নিজে ব্যবসায় শ্রম দিয়েছেন, অনেকের শ্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। "হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)-কে খলীফা বানানো হল, তখন তিনি বললেন, আমার কাওম জানে যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের ভরণপোষণে অপর্যাপ্ত ছিলো না। কিন্তু এখন আমি জনগনের কাজে

---

[২৫] আব্দুর রহমান ইবনুল কামাল জালাল উদ্দীন সূয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর ফিত্ তাফসীরিল মা'সুর*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ২২০

[২৬] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২১১৯, পৃ. ১১২

সার্বক্ষণিক ব্যাপৃত হয়ে গেছি। অতএব আবূ বকরের পরিবার এই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাদ্য গ্রহন করবে এবং আবূ বকর (রা.) মুসলিম জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে"।[২৭]

বাইশ লক্ষ বর্গমাইল রাজ্যের প্রধান হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন রাখাল, মাঠের শ্রমিক। মক্কার জানজান ময়দানে তিনি উট চড়াতেন। এক সময় তার রাজত্বকালে এই মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ঝাড় ঝাড় চোখের পানি ফেলে কাঁদছিলেন। চোখের পানি মুছতে মুছতে খলিফা ওমর বলছিলেন, আমি এই মাঠে উটের রাখাল ছিলাম। গায়ে পুরো নয়; পড়ার টুকরো কাপড় ছিল। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লে বাবা বেদমভাবে প্রহার করতেন। আজ আল্লাহর করুণায় এই আকাশের নিচে আমি প্রধানতম ব্যক্তি। রাখাল ওমর আজ রেশমি রুমাল দিয়ে নাকের ময়লা পরিষ্কার করে!

ব্যবসা ও বাণিজ্যে শ্রমের প্রবাদ পুরুষ হযরত উসমান (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। যৌবনকালে তিনি জীবিকার জন্য অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা খাতে তার সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়। মক্কার সমাজে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন বলেই তার উপাধি হয়েছিল গনী যার অর্থ ধনী। সম্পদের মালিক হবার কারণে তিনি তাঁর অর্থ সম্পদ দ্বীনের কাজে ব্যয় করেন। তিনি ইসলামের জন্য মুক্ত হস্তে দান করতেন। মানুষের আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন জীবনের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি প্রায় দুই হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। ঘৃণ্য দাস প্রথা উচ্ছেদে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। তিনি প্রতি জুমাবার একটি করে গোলাম অথবা বন্দি মুক্ত করে দিতেন। কারণবশত কোনো শুক্রবার না পারলে পরবর্তী শুক্রবারে দুটি দাস মুক্ত করে দিতেন। মানব কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) ছিলেন সদা নিবেদিত প্রাণ। মুসলিমদের কঠিন দুর্যোগ ও দুঃসময়ে তিনি থাকতেন অগ্রণী ভূমিকায়। কথিত আছে, মাত্র দুটি উট ব্যতীত তিনি তার সব ধন-সম্পদ ইসলামের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

সমাজের ভুখা-নাঙ্গা মানুষের প্রতি হযরত উসমান (রা.) ছিলেন সর্বদা দরাজ হস্ত। একবার মদিনায় বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এমন সময় খবর এলো উসমানের (রা.) ব্যবসার এক হাজার উট বোঝাই খাদ্যশস্য আমদানির পথে। মদিনার ব্যবসায়ীরা এসে উসমান (রা.) এর বাড়িতে ভিড় জমান। তিনি তাঁদের সংরক্ষণাগারে নিয়ে গেলেন, যেখানে সারি সারি খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা সাজানো ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি সেগুলো অধিক দামে বিক্রি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য ঘোষণা করলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি সব খাদ্যশস্য মদিনার অভাবী লোকদের সদকা করে দিলাম। ' এভাবে সমাজের ক্ষুধা-দারিদ্র দূর করতে তিনি তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

হযরত রাসূল (সা.)-এর পরিবারের জন্যও তাঁর সম্পদ ছিল উন্মুক্ত। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজ ও দ্বীনি পথে অর্থ ব্যয়ের প্রশংসা করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জান্নাত ক্রয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) উসমান (রা.) থেকে দুইবার জান্নাত ক্রয়ের সুসংবাদ পেয়েছেন রুমা কূপ ক্রয়ের দিন এবং সেনাদল প্রস্তুতির দিন। ধনী ও দানশীল এই মহান ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় মানুষের কল্যাণে বহু সম্পদ দান ও ওয়াকফ করেছেন। তাঁর সেসব দান ও ওয়াকফ করা সম্পদ দ্বারা মানুষ এখনো উপকৃত হচ্ছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন উসমান (রা.) এক হাজার দিনার হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোলে ঢেলে দেন। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আমি সেগুলো তাঁর কোলে ওলট-পালট করতে করতে বলতে শুনলাম,

[২৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৪০, পৃ. ১৬

আজকের পর থেকে উসমান যে কার্যকলাপই করুক, তা তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি কথাটি দুইবার বলেন।[২৮]

ইহুদির বাড়িতে খেটে সংসার চালানো শ্রমজীবী মানুষটির নাম হযরত আলী। হযরত আলী (রা.) নিজের শ্রম জীবনের কথা এভাবে বলেন, আমরা তখন মদিনায়। নবীজি, হযরত ফাতেমা সহ ঘরের সবাই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শহরতলীর দিকে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। এক স্থানে একজন মহিলাকে মাটি জমা করতে দেখি। মনে হলো সে হয়তো মাটি ভেজাবে। অনুমান সত্য হলো। তখন একেকটি খেজুরের বিনিময়ে একেক বালতি পানি কূপ থেকে তুলে দেয়ার কাজ নিলাম। ১৬ বালতি পানি তুললাম। আমার হাতে লালে লাল ফোসকা পড়ে গেল। কাজ শেষে হাত-মুখ ধুয়ে পারিশ্রমিক পেলাম ১৬টি খোরমা। খোরমা নিয়ে দৌঁড়ে হাজির হই নবী কারীম (সা.) এর কাছে। পুরো ঘটনা নবীজি শুনলেন। চোখের পানি ফেললেন। পেটের ক্ষুধা মিটাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খোরমা খেলেন।

হযরত রাসূল (সা.) এর যুগে মালিক-শ্রমিক কোন ভেদাভেদ ছিল না। সবাইকে একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হত। সকল সাহাবীই কারো উপর ভরসা করে জীবনযাপন করতেন না। বরং প্রত্যেকেই নিজ হাতে উপার্জন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। হাজারো কষ্ট দুঃখ তাদেরকে এ পথে চলতে বাঁধা দিতে পারেনি। প্রত্যেকেই কোন না কোন কাজ করে জীবনযাপন করে গেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগন নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরা করতেন। ফলে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ বের হতো। সেজন্য তাদের বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নাও (তবে ভালো হয়)।[২৯] তাই তারা আমাদের জন্য আত্মনির্ভরশীলতার জন্য মহান আদর্শ।

১.২.২.৩. সাহাবীদের জীবনাদর্শে

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও মদিনায় একজন মহিলার গৃহ শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি বুছরা বিনতে গাজওয়ানের ঘরে খাবার এবং এক জোড়া জুতার বিনিময়ে কাজ করতাম। তারা উটে আরোহণ করলে তা হাঁকিয়ে নিয়ে যেতাম এবং নেমে এলে তাদের সেবা করতাম। এছাড়াও হযরত বেলাল (রা.) মসজিদে নববীর মোয়াজ্জিনের কাজ করতেন।

হযরত ইকরামা (রা.) ছিলেন ইবনে আব্বাস (রা.) এর বাড়ির শ্রমিক। মহিলা সাহাবি উম্মে আয়মান বারাকাহ (রা.) ছিলেন নবীজি (সা.) এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের গৃহপরিচারিকা। হযরত জায়েদ (রা.) ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) এর খাদেম। ইসলামের প্রথম শহিদ হযরত সুমাইয়া (রা.) ছিলেন হযরত আবু হুজাইফার কেনা গোলাম। বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসির জীবনও কেটেছে মরু আরবের মাঠে-ঘাটে, পথে প্রান্তরে। এক সময় খলিফা ওমরের শাসন আমলে মাদাইনের গর্ভণর ছিলেন হযরত সালমান ফারসি (রা.)। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পাওয়া ৫ দিরহাম পুরোটা সদকা করে দিতেন। আর সংসার চালাতেন খেজুর পাতার ঠোঙা বিক্রি করে।[৩০]

---

[২৮] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *সুনান তিরমিযী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি., খ. ৬, হাদীস নং- ৩৭০১, পৃ. ২৮৮

[২৯] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৪১, পৃ. ১৬-১৭

[৩০] এ জেড এম শামসুল আলম, *ক্রীতদাস থেকে সাহাবি*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১০৫

এভাবে মহানবী (সা.) এর সাহাবীগন ও পরনির্ভর্শীল হয়ে জীবন চালাননি বরং জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। অধিক পরিমানে চাওয়া পাওয়ার কোন লোভ লালসা তাদের ছিলনা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরতাই ছিল তাদের জীবনের পাথেয়, তাই তাবুক যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) তার সমস্ত সম্পদ আল্লার পথে দান করে দিলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত রাসূল (সা.) আবু বকর (রা.) এর কাছে জানতে চাইলেন, তুমি তোমার পরিবারে কি অবশিষ্ট রেখেছ? জবাবে আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) কে।[৩১]

১.২.৩. ইসলাম আত্মনির্ভরতা অর্জনের কথা বলে

হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরজের পরে ফরজ । মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত যেমন ফরজ, ইসলামে জীবিকা উপার্জনকে তেমন ফরজ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, এরপর যখন নামাজ আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করবে এবং আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করবে, এতে তোমরা সফল হবে।[৩২]

আবার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এমন প্রবলভাবে যে, ইবাদত কবুল হবে কি না, ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কি না তা একান্তভাবে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। ফলে ইসলামে একজন ব্যক্তি কেবল জীবিকাই উপার্জন করে না বরং হালাল উপায় অবলম্বন করে বৈধভাবে জীবিকা উপার্জন করে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরজের পরে আরেকটি ফরজ"।[৩৩] অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

কুরআনুল কারীমে আরও এরশাদ হয়েছে, "তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের জীবিকারূপে দিয়েছি এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করো আল্লাহর, যদি তোমরা একান্তই তার ইবাদত করো"।[৩৪] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রেক্ষাপটেই বলেছেন, হারাম সম্পদে তৈরি গোশত ও রক্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো গোশত ও প্রতি ফোঁটা রক্তের জন্য নরকই যথোপযুক্ত আবাস। ইসলাম স্বনির্ভরতা অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাইতো ইসলামে কেউ কারও গলগ্রহ হয়ে থাকাকে সমর্থন করা হয়নি। ব্যক্তি নিজে উপার্জন করবে, নিজের আয়ের উপর নির্ভর করবে। অন্য কারও আয়ে ভাগ বসাবে না। স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কাজ করতে হলে কেউ যেন তাতে দ্বিধা না করে, লজ্জাবোধ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে শ্রম ও শ্রমিককে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নানাভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা শ্রম পছন্দ করেন।

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

"যারা তোমাদের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে, সে শ্রমিক তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যাদের কাছে এমন লোক আছে তাদেরকে যেন তা-ই খেতে দেয় যা

---

৩১ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬৭৫, পৃ. ২৭৪

৩২ সূরা আল-জুমুআ, আয়াত : ১০

৩৩ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী [অনু., মাওলনা এ, বি, এম, এ খালেক মজুমদার], *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., হাদীস নং- ২৬৬১, পৃ. ২৩০

৩৪ সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭২

তারা নিজেরা খায়, তাদেরকে যেন তা-ই পরতে দেয়, যা তারা নিজেরা পরে। তোমরা তাদেরকে তাদের সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ করতে বাধ্য করবে না। যদি তাদেরকে তোমরা কোনো কঠিন কাজ করতে দাও, তা হলে তোমরা তাদের সহযোগিতা করবে"।[৩৫] শ্রমিককে যেন তার প্রাপ্য মজুরির জন্য নিয়োগকর্তার পেছনে ঘুরতে না হয় এবং শ্রমের ন্যায্যমূল্য নিয়ে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও"।[৩৬]

আরেক হাদিসে বর্ণিত আছে,

عن رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

"হযরত রাফি ইবনে খাদিজ (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্রতম? তিনি বলেন, ব্যক্তির নিজের শ্রমের উপার্জন ও সৎ ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা"।[৩৭]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অসংখ্য হাদিসে নানাভাবে মানুষকে কাজ করায় উৎসাহ দিয়েছেন। ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি অনীহা তৈরির জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নিচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত উত্তম"।[৩৮] আল্লাহ তা'আলার হুকুম আর আল্লাহর রাসূলের এ নির্দেশনা মেনে কোনো ব্যক্তি যদি স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে অনিবার্যরূপে তার ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। উন্নয়ন ঘটবে মানবের। অদক্ষ-অক্ষম বোঝার পরিবর্তে ব্যক্তি উন্নত জনসম্পদে পরিণত হবে।

১.২.৪. নবী-রাসূলদের জীবন থেকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা

সম্মানিত নবী-রাসূলগণ প্রত্যেকেই ছিলেন কর্মঠ এবং নিজ হাতে উপার্জনকারী; যেসব পেশায় নিযুক্ত ছিলেন তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব জাতির হেদায়েত এবং পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে সর্বযুগে প্রত্যেক জাতির কাছে নবী-রাসূলদের (আ.) প্রেরণ করেছেন। সম্মানিত নবী-রাসূলগণ প্রত্যেকেই ছিলেন কর্মঠ, সৎকর্মশীল এবং নিজ হাতে উপার্জনকারী। গোটা মানবজাতির জন্য তারা ছিলেন পথপ্রদর্শক এবং আদর্শ। তারা ছিলেন জগতের একেকজন শ্রেষ্ঠ মানব। তাদের জীবনাচার কেমন ছিল, তাদের আদর্শ, অভ্যাস, পেশা ও কাজকর্ম সম্মন্ধে অবগতি লাভ করার ভেতরে মানবজাতির জন্য নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে কুরআনুল হাকিমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন,

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"প্রতিটি জাতির জন্য পথ-প্রদর্শনকারী রয়েছে"।[৩৯]

---

৩৫ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) *বুখারী শরীফ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, হাদীস নং- ৩০, পৃ. ২৮

৩৬ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., হাদীস নং- ২৪৪৩, পৃ. ৪০১

৩৭ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, কায়রো : দারুল হাদিস, তা.বি., খ. ১৩, হাদীস নং- ১৭১৯৮, পৃ. ৩২২

৩৮ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৩, খ. ৫, হাদীস নং- ২৯২২, পৃ. ৩১৯

৩৯ সুরা আর রাদ, আয়াত : ৭

অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"আমি রাসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দিই না"।[৪০]

সব নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানবজাতির প্রতি প্রেরিত শিক্ষকতুল্য এবং আদর্শ। তারা কারও কাছে হাত পাতবেন, কারও উপরে ভরসা করে চলবেন, এমনটা হতে পারে না। তাই তাদের প্রত্যেকেরই ছিল কোনো না কোনো পেশা। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উপার্জনকারী। অন্যের উপর নির্ভরশীল হতেন না তারা। বরং স্বীয় হস্তে অর্জিত খাদ্যপানীয় গ্রহন করাকে পছন্দ করতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ধরনের উপার্জন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, "ব্যক্তির নিজ হাতে কাজ করা এবং সৎ ব্যবসা"।[৪১]

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হালাল রুজি অর্জন করা ফরজের পর একটি ফরজ"।[৪২]

হযরত ঈসা (আ.) এক ব্যক্তিকে অসময়ে ইবাদতখানায় দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে বসে ইবাদত করছো, তোমার রিজিকের ব্যবস্থা কে করে? লোকটি বলল, আমার ভাই আমার রিজিকের ব্যবস্থা করে। হযরত ঈসা (আ.) তাকে বললেন, "সে তোমার চেয়ে অনেক উত্তম"।[৪৩]

কবির ভাষায়, "নবীর শিক্ষা কোরো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে"।[৪৪]

নবী-রাসূলগণ হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। তাই তাদের পক্ষে অন্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণ করা কোনোক্রমেই মানানসই নয়। সঙ্গত কারণে তাঁরা স্বহস্তে অর্জিত সম্পদে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখন তো আর বর্তমান সময়ের মত এত এত আধুনিক পেশা ছিল না। প্রাচীন পেশাসমূহেই ভরসা করতে হয়েছে তাদের। চলুন, প্রিয় পাঠক, দেখে নিই কোন নবী এবং রাসূল কোন পেশায় যুক্ত ছিলেন-

১.২.৪.১. হযরত আদম (আ.)

কৃষিকর্ম জীবিকা নির্বাহে অন্যতম উপার্জন মাধ্যম। ইসলাম এটিকে মহৎ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিকার্যের সুচনা হয়েছে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকেই তাঁকে কৃষি কাজ, আগুনের ব্যবহার ও কুটির শিল্প শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।[৪৫] হযরত আদম (আ.) চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর ছেলেদের পেশাও ছিল চাষাবাদ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عن أنس رضي الله عنه أنّه كان يعمل بالحياكة. ورُويَ أنّه أوّل من عمل بالحِياكة

---

৪০ সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১৫

৪১ ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি [অনু. মারুফ আর রুসাফি], *তাফসীর আদদুররে মানসুর*, ঢাকা : দারুস সাআ'দাত, ২০২১খ্রি., খ. ৬, পৃ. ২২০

৪২ আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী [সম্পাদনায়: আব্দুল কাদির আতা], *সুনান আল-বায়হাকী*, মক্কা আল-মুকাররমা: মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি/১৯৯৪ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ১২৮

৪৩ শায়খ আলী মাহ্ফুয, *হেদায়াতুল মুরশিদীন ওয়াল কিতাবিহি ইলা তরীকিল ওয়াযি ওয়াল খুত্তাবিহি*, দারুল ই'তিবার, ২০১৭, পৃ. ৩৬

৪৪ শেখ হাবিবুর রহমান, *"নবীর শিক্ষা"*, সংগ্রহ : http://kobitarakash.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

৪৫ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ. ২৪৩; ইবন খালদুন, *মুকাদ্দমা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, খ. ২, পৃ. ৭-৮

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, (আদম) "তিনি বুননের কাজ করতেন এবং বর্ণিত হয়েছে যে তিনিই প্রথম বুননের কাজ করেছিলেন"।[৪৬] তা ছাড়া তিনি তাঁতের কাজও করতেন। কারো কারো মতে, তাঁর পুত্র হাবিল পশুপালন করতেন। কৃষিকাজের যন্ত্রপাতির নাম আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহর বাণী,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"আর আল্লাহ আদমকে সব নামের জ্ঞান দান করেছেন"।[৪৭]

১.২.৪.২. হযরত শিস (আ.)

হযরত শিস (আ.)ও কৃষক ছিলেন। তাঁর পৌত্র মাহলাইল সর্বপ্রথম গাছ কেটে জ্বালানি কাজে ব্যবহার করেন। তিনি শহর, নগর ও বড় বড় কিল্লা তৈরি করেছেন। তিনি বাবেল শহর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১.২.৪.৩. হযরত ইদরিস (আ.)

হযরত ইদরিস (আ.) -এর পেশা ছিল কাপড় সেলাই করা। কাপড় সেলাই করে যে অর্থ উপার্জন করতেন, তা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। শায়বানি তার 'কাসবুল আম্বিয়া'তে উল্লেখ করেছেন, كان يعمل بالخياطة "ইদরিস (আ.) সেলাইয়ের কাজ করতেন"। ইদরিস শব্দটি দিরাসা শব্দ থেকে নির্গত। তিনি বেশি পরিমাণে সহিফা পাঠ করতেন বলে তাঁকে ইদরিস বলা হয়। পড়াশোনার প্রথা তাঁর সময় থেকে চালু হয়। একদল পন্ডিত মনে করেন, হিকমত ও জ্যোতির্বিদ্যার জন্ম ইদরিস (আ.) -এর সময়ই হয়েছিল।[৪৮]

১.২.৪.৪. হযরত নুহ (আ.)

হযরত নুহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৌকা তৈরির কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে তিনি নৌকা তৈরি করেছিলেন। আল্লাহর বাণী "আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহি অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো"।[৪৯] তিনি ৩০০ হাত দীর্ঘ, ৫০ হাত প্রস্থ, ৩০ হাত উচ্চতা সম্পন্ন একটি বিশাল নৌকা তৈরি করেন।

১.২.৪.৫. হযরত হুদ (আ.)

হযরত হুদ (আ.) -এর জীবনী পাঠান্তে জানা যায় যে তাঁর পেশা ছিল ব্যবসা ও পশু পালন। ব্যবসা ও পশু পালন করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

১.২.৪.৬. হযরত সালেহ (আ.)

হযরত সালেহ (আ.) -এর পেশা ছিল পাহাড় কেটে বাড়ি বানানো, ব্যবসা ও পশু পালন।[৫০]

---

৪৬ মুহাম্মদ আল-আমাসি, *রাবি' আল-আবরার*, আলেপ্পো : দার আল-কালাম আল-আরাবি থেকে রওদ আল-আখবার আল-আখবার আল-সাখতাব, ১৪২৩হি., পৃ. ১২০

৪৭ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ৩১

৪৮ মুহাম্মাদ আল-শায়বানী, *আল-কাসাবু*, দামেশক : আব্দুল হাদী হারসুনী, ১৪০০ হি., পৃ. ৩৫

৪৯ সুরা হুদ, আয়াত : ৩৭

৫০ alukah.net, الأنبياء والرسل أصحاب مهنة وحرفة, ২২-১১-২০২০

১.২.৪.৭. হযরত লুত (আ.)

হযরত লুত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের লোকেরা চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনিও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতেন চাষাবাদের মাধ্যমে।

১.২.৪.৮. হযরত ইবরাহিম (আ.)

হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনী পাঠান্তে জানা যায় যে তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য কখনো ব্যবসা, আবার কখনো পশু পালন, চাষাবাদ করতেন। عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّهم اشتغلا بالزّراعة ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "তারা (ইবরাহিম ও ইসমাঈল) কৃষি কাজ করতেন"।[৫১] তারা রাজমিস্ত্রির কাজও করেছেন হযরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর পুত্র ইসমাইলের সাথে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা"।[৫২]

১.২.৪.৯. হযরত ইসমাঈল (আ.)

হযরত ইসমাঈল (আ.) পশু শিকার করতেন। তিনি ও তাঁর পিতা উভয়ই ছিলেন রাজমিস্ত্রি। পিতা-পুত্র মিলে আল্লাহর ঘর তৈরি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা"।[৫৩]

১.২.৪.১০. হযরত ইয়াকুব (আ.)

হযরত ইয়াকুব (আ.) এর পেশা ছিল ব্যবসা, কৃষিকাজ করা ও পশু পালন।

১.২.৪.১১. হযরত ইউসুফ (আ.)

হযরত ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন।[৫৪] বেতন হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ গ্রহণ করতেন। এরশাদ হয়েছে, "হে আমার রব! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন"।[৫৫] অন্যত্র কুরআনে আরো এসেছে,

---

৫১ আহমাদ আত-তাওয়ীল, *ইত্তিক্বাউল হারামি ওয়াশ শুবহাতু ফী ত্বলাবির রিযকি*, রিয়াদ : দারুল কুনুয ইশবিলিয়া লিন্নাশার ওয়াত তাওযী', ২০০৯ খ্রি. , খ. ১, পৃ. ৬৪

৫২ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১২৭

৫৩ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১২৭

৫৪ খালেদ আল-জুরাইসী, *ইদারাতুল ওয়াকতি মিনাল মানযুরিল ইসলামী ওয়াল এদারী*, বৈরুত : এহ্ইয়াউত তুরাসিল আরাবি, ১৪২৪হি., খ. ১, পৃ. ৭৮

৫৫ সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"সে (ইউসুফ) বলল-আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের দায়িত্ব দিন, আমি উত্তম রক্ষক ও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী"।[৫৬] তিনি দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারায় এ সঙ্কট সামাল দেওয়ার জন্য তাকেই এ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আল্লাহর রহমতে তিনি এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১.২.৪.১২. হযরত শোয়াইব (আ.)

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর পেশা ছিল পশু পালন ও দুধ বিক্রি। পশু পালন ও দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর কন্যারা চারণভূমিতে পশু চরাতেন। তাঁর পেশা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

عن ابن عباس رضي الله عنه أنّ شُعيب عليه السلام كان راعياً

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, "শোয়াইব (আ.) পশুপালন করতেন।[৫৭]

১.২.৪.১৩. হযরত দাউদ (আ.)

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন রাজা ও নবী। সহিহ বুখারির ব্যবসা অধ্যায়ে রয়েছে যে, দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে আল্লাহ! এমন একটি উপায় আমার জন্য বের করে দিন, যেন আমি নিজ হাতে উপার্জন করতে পারি। অতঃপর তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লোহা দ্বারা বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার কৌশল শিক্ষা দেন। শক্ত ও কঠিন লোহা স্পর্শ করলে তা নরম হয়ে যেত। যুদ্ধাস্ত্র, লৌহ বর্ম ও দেহবস্ত্র প্রস্তুত করা ছিল তাঁর পেশা। এগুলো বিক্রি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। আল্লাহ তার পেশার বর্ণনা দিয়ে আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমি আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর আর পাখীদেরকেও (এ আদেশ করেছিলাম)। আমি লোহাকে তার জন্য নরম করেছিলাম। যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে পার, কড়াসমূহ সঠিকভাবে সংযুক্ত কর আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী"।[৫৮] আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরো ঘোষণা করেছেন,

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ "আমিই তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম তোমাদের উপকারে তোমাদের পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য"।[৫৯]

---

৫৬ সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৫

৫৭ আবু আব্বাস নাজমুদ্দিন আহমাদ আল-মুকাদ্দিসী, *মুখতাসারু মিনহাজিল ক্বাদিসীন*, দামেশক : মাকতাবাতু দারুল বায়ান, ১৯৭৮খ্রি., পৃ. ৮২

৫৮ সূরা আস সাবা, আয়াত : ১০-১১

৫৯ সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮০

ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ، خَيْرًا مِن أنْ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وإنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داوُدَ عليه السَّلامُ، كانَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ

"নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায়না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন"।[৬০]

১.২.৪.১৪. হযরত সুলাইমান (আ.)

হযরত সুলাইমান (আ.) ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর শাসক ও নবী। তিনি তাঁর পিতা থেকে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তিনি নিজেও অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ "এবং সোলায়মান উত্তরাধিকারসূত্রে দাউদকে পেয়েছিলেন"।[৬১] অর্থাৎ, তিনি তাকে নবুয়ত, রাজত্ব এবং শাসনের উত্তরাধিকারী করেছিলেন এবং তিনি শাম দেশের রাজা ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে তিনি সমস্ত পৃথিবীর মালিক বা শাসক ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত আছে,

ملك الأرض مؤمنان: سليمان وذو القرنين "দুইজন মু'মিন বান্দা সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তারা হলেন নবী সুলাইমান ও জুরকারনাইন"।[৬২] এবং তাঁর শাসনে তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক, ন্যায্য, অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে দূরে, এবং আল্লাহ তাকে একটি মহান এবং বিশাল রাজ্য দিয়েছিলেন।[৬৩]

ভিন্ন পেশা গ্রহণ করার চেয়ে নিজ সম্পদ রক্ষা ও তদারকি করাই ছিল তাঁর প্রদান দায়িত্ব। মানব-দানব, পশু-পাখি, বাতাস ইত্যাদির উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল।

১.২.৪.১৫. হযরত মুসা (আ.)

হযরত মুসা (আ.) ছিলেন একজন রাখাল। তিনি শ্বশুরালয়ে মাদায়েনে পশু চরাতেন। সিনাই পর্বতের পাদদেশে বিরাট চারণভূমি মাদায়েনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে লোকজন পশু চরাত। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মুসা (আ.)। আট বছর তিনি স্বীয় শ্বশুর শোয়াইব (আ.)-এর পশু চরিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

(আল্লাহ বলেন) "হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? সে বলল, এটা আমার লাঠি, আমি এতে ভর করে চলি, এর সাহায্যে আমি আমার ছাগলের পালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে দেই আর এতে আমার আরো অনেক কাজ হয়"।[৬৪]

১.২.৪.১৬. হযরত হারুন (আ.)

হযরত হারুন (আ.) -এর পেশাও ছিল পশু পালন। পশু পালন করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

---

৬০ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৪২, পৃ. ১৭

৬১ সূরা আন নমল, আয়াত : ১৬

৬২ সিরাজুদ্দিন ইবনুল মুলাক্কান, *আত-তাওযীহু লি-শারহিল জামে' আস-সহীহ*, দামেশক : দারুন নাওয়াদির, খ. ৫, পৃ. ৫৮৮

৬৩ মুহাম্মাদ মুনতাসির বিল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-যামযামী আল-কাতানী, *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম*, বৈরুত : দারুশ শারক, ১৪১৩খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৩৩

৬৪ সূরা ত্বহা, আয়াত : ১৭-১৮

১.২.৪.১৭. হযরত ইলিয়াস (আ.)

ইলিয়াস (আ.) -এর পেশাও ছিল তাঁতের ব্যবসা ও পশু পালন।[৬৫]

১.২.৪.১৮. হযরত আইউব (আ.)

হযরত আইউব (আ.) -এর পেশা ছিল গবাদি পশু পালন। তাঁর প্রথম পরীক্ষাটি ছিল গবাদি পশুর উপর। ডাকাতরা তাঁর পশুগুলো লুট করে নিয়ে গিয়েছিল।

১.২.৪.১৯. হযরত ইউনুস (আ.)

হযরত ইউনুস (আ.) -এর গোত্রের পেশা ছিল চাষাবাদ। সুতরাং কারো কারো মতে, তাঁর পেশাও ছিল চাষাবাদ।

১.২.৪.২০. হযরত জাকারিয়া (আ.)

হযরত জাকারিয়া (আ.) কাঠ দিয়ে আসবাব পত্র বানাতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, كَانَ زَكَرِيّا عليه السلام نَجَّارًا "হযরত জাকারিয়া (আ.) কাঠের কাজ করতেন"। তাঁর শত্রুরা তাঁর করাত দিয়েই তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে।[৬৬]

১.২.৪.২১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)

হযরত ইয়াহইয়া (আ.) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি জীবনের একটি সময় জঙ্গলে ও জনমানবহীন স্থানে কাটিয়েছিলেন। আহার হিসেবে তিনি বৃক্ষের লতাপাতা ভক্ষণ করতেন।[৬৭]

১.২.৪.২২. হযরত জুলকিফল (আ.)

হযরত জুলকিফল (আ.) -এর পেশা ছিল পশু পালন।

১.২.৪.২৩. হযরত ইয়াসা (আ.)

হযরত ইয়াসা (আ.) -এর পেশা ছিল ব্যবসা ও পশু পালন।

১.২.৪.২৪. হযরত ঈসা (আ.)

হযরত ঈসা (আ.) ও মরিয়ম (আ.) -এর আবাসস্থল প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

"আমি তাদের উভয়কে এক উচ্চ ভূমি প্রদান করেছিলাম, যা সুজলা ও বাসযোগ্য ছিল"।[৬৮] এই উচ্চ ভূমি হলো ফিলিস্তিন। তিনি ফিলিস্তিনে উৎপন্ন ফলমূল খেয়ে বড় হয়েছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে অলিতে-গলিতে

---

৬৫ alukah.net, الأنبياء والرسل أصحاب مهنة وحرفة, ২২-১১-২০২০

৬৬ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ [অনুবাদক মণ্ডলী], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩, খ. ৭, হাদীস নং- ৫৯৮৬, পৃ. ৪৫৫

৬৭ এ এন, এম সিরাজুল ইসলাম, *আনওয়ারে আম্বিয়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ২২৫-২২৮

৬৮ সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত : ৫০

দ্বীনের দাওয়াতি কাজ করতেন। যেখানে রাত হতো, সেখানে খেয়ে না খেয়ে নিদ্রা যেতেন। তিনি তার জাতির চিকিৎসায় কাজ করতেন, যেখানে তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন।[৬৯]

ঈসা (আ.) ও মরিয়ম (আ.)-এর আবাসস্থল প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমি তাদের উভয়কে এক উচ্চ ভূমি প্রদান করেছিলাম, যা সুজলা ও বাসযোগ্য ছিল।[৭০] এই উচ্চ ভূমি হলো ফিলিস্তিন। তিনি ফিলিস্তিনে উৎপন্ন ফলমূল খেয়ে বড় হয়েছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে অলিতে-গলিতে দ্বীনের দাওয়াতি কাজ করতেন। যেখানে রাত হতো, সেখানে খেয়ে না খেয়ে নিদ্রা যেতেন।

১.২.৪.২৫. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)

মহানবী (সা.) ছিলেন একজন সফল ও সৎ ব্যবসায়ী। তিনি এরশাদ করেছেন, التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সঙ্গে।[৭১] তিনি গৃহের কাজ নিজ হাতে করতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন। নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই ও ধোলাই করতেন, গৃহ ঝাড়ু দিতেন। মসজিদে নববী নির্মাণকালে শ্রমিকের মতো কাজ করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতেন। আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا

"তারা বলে এ কেমন রাসূল যে খাবার খায়, আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে?"[৭২] নবী-রাসূলদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এই যে বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা কখনো ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতেন না এবং সঞ্চয় করা পছন্দও করতেন না। তথাপি যেহেতু তাঁরা মানুষ ছিলেন, সেহেতু বৈষয়িক প্রয়োজনে যতটুকু জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন, ততটুকু সম্পদ অর্জনে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। সদা-সর্বদা নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ করা পছন্দ করতেন। মানুষদের থেকে কখনো তাঁরা নজর-নেওয়াজ, এমনকি বেতনও গ্রহণ করতেন না। বরং যথাসম্ভব নিজেদের উপার্জন থেকে গরিব ও দুস্থদের সাহায্য করতেন। সব নবী-রাসূল ছাগল চরাতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন কোনো নবী নেই, যিনি ছাগল চরাননি। জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? প্রত্যুত্তরে হযরত রাসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমিও মক্কায় অর্থের বিনিময়ে ছাগল চরিয়েছি। বলা বাহুল্য যে মহানবী (সা.)-এর সাহাবিরা অনেকেই ব্যবসা করতেন। বিশেষ করে মুহাজিররা ছিলেন ব্যবসায়ী আর আনসাররা ছিলেন কৃষক।

১.২.৫. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য মানব জীবনে উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা

১.২.৫.১. উপার্জনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়

জীবন ধারণ করার জন্য উপার্জনে সক্ষম প্রত্যেককে উপার্জন করতে হবে। উপার্জন ছাড়া পৃথিবীতে বসবাস করা সম্ভব নয়। উপার্জন না করে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর তাই দেখা যায় যে সালাত শেষ হওয়ার পর উপার্জনে বের হওয়ার কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৬৯ মুস্তাফা শালবাইয়াত, *সিলসিলাতুত তাফসীর লি-মুস্তাফা আল-আদুয়ি*, খ. ১০, পৃ. ৬৩

৭০ সুরা আল মুমিনুন, আয়াত : ৫০

৭১ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১২১২ পৃ.৪৯৮-৪৯৭

৭২ সুরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৭

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার"।[৭৩]

১.২.৫.২. পৃথিবী উপার্জন করার একমাত্র ক্ষেত্র

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, জীবন পরিচালনার জন্য এ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সে সাথে উপার্জন করার জন্য অসংখ্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

"তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান"।[৭৪]

১.২.৫.৩. পরিবারিক দায়িত্ব পালন করা

প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারিক দায়িত্ব পালনে তাকে উপার্জন করতে হয়। পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে, যা উপার্জন করে মেটাতে হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"আর সন্তানের পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা"।[৭৫]

১.২.৫.৪. উপার্জন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কল্যাণকর বিষয়

উপার্জন করার যোগ্যতা একটি কল্যাণকর বিষয়। এটা আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন, দু'টি হাত দিয়েছেন। যাতে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। অপরের নিকট হাত পাততে না হয়। উপার্জন করার মত কল্যাণকর বিষয়ে দু'আ করার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন"।[৭৬]

---

৭৩ সূরা আল জুমুআ, আয়াত : ১০

৭৪ সূরা আল-মুলক, আয়াত : ১৫

৭৫ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৩৩

৭৬ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২০১

১.২.৫.৫. স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যম

ইসলাম অপরের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছে। এ মর্মে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার মুখমন্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকবে না"।[৭৭]

১.২.৫.৬. উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল রেখে যাওয়ার উপায়

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) আমাকে এভাবে বলেছেন,

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

"তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও সাবলম্বী রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম"।[৭৮]

১.২.৫.৭. উত্তরাধিকার আইন আল্লাহ প্রদত্ত আত্মনির্ভরশীলতার মূল চাবিকাঠি

শুধু আরব ভূখন্ডেই নয়, হযরত রাসূলে কারীম (সা.) আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে ভূমির উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। তখন পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। পরিবারের বাইরে তা যাবে না। ফলে মেয়েরা বিয়ের পর পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতো। উপরন্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানের হাতেই ন্যস্ত থাকত। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি সব ধর্মের ছিল তীক্ষ্ম নজর। কারণ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠবে না বিশেষ একটি ধনিক শ্রেণি যারা অর্থ বলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভ করে। এরাই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এই অমানবিকতার দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন সূরা আন নিসা নাযিল করে তার মধ্যে এত সুন্দর ইনসাফপূর্ন উত্তরাধিকার নীতি বর্ণনা করলেন যাতে কোন মৃতব্যক্তির পরিবারের কোন সদস্য অসহায় হয়ে না পড়ে, পরনির্ভর হয়ে না পড়ে। যে নারী সমাজের কোন সম্পদ বলতে কোন কিছু ছিলো না। তাদেরকেও সম্পদের মালিকানার ব্যবস্থা করলেন। যাতে নারী সমাজ অসহায় হয়ে না পড়ে, কারো করুনার পাত্রে পরিণত না হয়। আল্লাহর ঘোষণা,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ
وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۭ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ

---

[৭৭] আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৩, খ. ৩, হাদীস নং- ১৩৮৯, পৃ. ৪৬

[৭৮] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ২৫৫৫, পৃ. ৭৭

يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।[৭৯]

আল্লাহর এই ঘোষণার দ্বারা ছোট-বড়, সবল, দুর্বল, নারী-পুরুষ সকলেই সম্পদে তাদের নির্ধারিত অংশের মালিকানা লাভ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।

[৭৯] সূরা আন নিসা, আয়াত : ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতি গঠন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

২. জাতি গঠন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমি ও আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মনির্ভরশীলতার পথ নির্দেশনা ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা পরবর্তী আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সূচক সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১. বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমি ও আত্মনির্ভরশীলতা

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই "ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্টে" ভারতবর্ষের দুটি প্রধান মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১২ আগস্ট প্রকাশিত রাডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পূর্ববাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ নাম দেয়া হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব থেকে জনগণ আশা করেছিলো, এবার তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা নতুন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করলেন, তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার নয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ বহুবাচনিক সমাজে পূর্ব পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উপর নির্ভরশীল করতে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছিল। এর প্রতিরোধ কল্পে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয়। ১৯৫২ সালে নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দান করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতার। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালীর স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে তার উত্তরণ ঘটে। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের গতি পাল্টাবেন। পাকিস্তানের শাসকবর্গ-কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা-ষড়যন্ত্রের গ্রন্থিগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যেন শাসন ক্ষমতা কোনক্রমে বাঙ্গালীর হস্তগত না হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেন। ২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানিদের অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং

জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বীচারে হত্যা করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশের বহু সংখ্যক শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারীদেরও হত্যা করা হয়। পুরান ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও চালানো হয় ব্যাপক গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে হত্যা করা হয় পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্যকে। পিলখানার ইপিআর-এর কেন্দ্রে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বীচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র সদস্যদের। কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত করা হয়। দেশময় ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বীচারে হত্যা করা হয় বিভিন্ন এলাকায় ঘুমন্ত নর-নারীকে। হত্যা করা হয় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশে পাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে।

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য বাংলার জনগণকে আহবান জানান। চট্টগ্রামে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নবগঠিত এই রাষ্ট্রের সরকার জোটবদ্ধ না হয়ে বিশ্বের অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী। এছাড়াও এ ঘোষণায় সারা বিশ্বের সরকারগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়।[১] ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে। ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পূর্বাঞ্চলের সম্মিলিত বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ কে নিয়াজী। এই আত্মসমর্পঅনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপ-সেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। এই অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২নং সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক বঙ্গবীর জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকী। ১৬ ডিসেম্বর ৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। এর ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারপর থেকে বাংলাদেশের জনগন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আত্মনির্ভরশীল জাতি ও দেশ গড়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছে। পরিপূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আমাদের সরকার ও দেশের জনগনকে আরো বেশি সচেতন, দায়িত্বশীল হয়ে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

২.২. আত্মনির্ভরশীলতার পথ নির্দেশনা ৭ই মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য সংক্ষিপ্তাকারে এক গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন। তার সেদিনের সে বক্তব্য বাঙ্গালী জাতিকে যাদুর মত মুক্তির মন্ত্রে উৎসাহিত করেছিল।

---

১ হাসান হাফিজুর রহমান [সম্পা.], *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ঢাকা : হক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮২খ্রি., খ.৩, পৃ. ৩১৪

ভাষণের এই মন্ত্রমুগ্ধতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কোনো কোনো ভাষণ আসলেই যাদুর মত। যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - أَوْ - إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ".

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একবার পূর্ব অঞ্চল (নজদ এলাকা) থেকে দু'জন লোক এলো এবং দু'জনই ভাষণ দিল। লোকজন তাদের ভাষণে তাজ্জব হয়ে গেল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কোন কোন ভাষণ অবশ্যই যাদুর ন্যায়"।[২]

বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তব্যের শুরুতে বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার, নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কি কি করতে হবে তার বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। ৭ই মার্চ এলেই ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে পড়ে। যে ভাষণ পুরো বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, এখনও অনুপ্রাণিত করে যায়। কেবল বাঙালি নয়, পুরো বিশ্বের মজলুম জনতাই অনুপ্রেরণা লাভ করে এ ভাষণ থেকে। এই ভাষণের প্রধান বিষয় ছিল সাহসের সাথে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। হযরত রাসূল সা. বলেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

"সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে জালিম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা"।[৩] রেসকোর্স ময়দানে সেই ১৯ মিনিটের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু উৎপীড়ক শোষকগোষ্ঠির জুলুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেভাবে গর্জে উঠেছিলেন তা সত্যি অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন,

> আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম, আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলব, এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

এর পরে তিনি আরো বলেন, মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের কথা বলেছেন।

এক পর্যায়ে তিনি সকল শোষণ থেকে মুক্তির একটি রূপরেখা প্রদান করে আরো বলেন,

---

২ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) [সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩খ্রি., খ. ৯, হাদীস নং- ৫৩৫৫, পৃ. ৩০১

৩ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী [অনু. অনুবাদকমণ্ডলী], *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০১১ খ্রি., খ.৬, হাদীস নং- ৪৩৪৪, পৃ. ৭৬

> ২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং এ সময়ে অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য দিক নির্দেশনা জারি করে বলেন,

> আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাঁদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

তিনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা একমাত্র আল্লাহ পাকের সাহায্য ছাড়া সফলতা সম্ভব নয় সে জন্য তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেন। আর ঠিক তার মনের আশা পূরণ করে আল্লাহ তা'আলা মাত্র সাড়ে নয় মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দান করে বিশ্বের বুকে একটি স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার তাওফিক দান করেন।[৪]

২.৩. মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্নে মৃত্যুকেও পরওয়া না করা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা রাতারাতি আসেনি সশস্ত্র যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চলেছে শাসন-শোষণ ও নির্বীচারে লুণ্ঠন এর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজপথে, কখনো গণপরিষদে, কখনো বা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। দেশের মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ী ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে পরোয়া না করে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মানসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ পাকিস্তানিরা ইসলামের দোহাই দিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল গ্রহন করলে বঙ্গবন্ধু তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, লেবেল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসুলে কারীম (সা.)-এর

---

৪ সিরাজুল ইসলাম [প্রধান সম্পাদক], *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, খ. ১৩, পৃ. ২৮৭

ইসলাম; যে ইসলাম জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র।[৫] ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো মুসলমান কখনও অন্যায়ের কাছে মাথানত করে না। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়ের কাছে মাথানত না করার কারণে কারবালার ময়দানে স্বপরিবারে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। এ রকম অসংখ্য নজীর ইসলামে রয়েছে। রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদার বর্ণনা। মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের এই উৎসাহ, উদ্দীপনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। শহীদের মর্যাদায় আল্লাহ বলেন -

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না"।[৬] শহীদের মর্যাদা এত বেশি যা হযরত রাসূল (সা.) এর হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায়- হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি বৈশিষ্ট্য-

ক. শহীদের শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

খ. জান্নাতে শহীদের সম্মান ও স্থান দেখানো হবে।

গ. শহীদের কবর আজাব মাফ করে দেওয়া হবে।

ঘ. শহীদ ব্যক্তি কেয়ামতের ভয়ানক-আতঙ্কজনক বিভীষিকা থেকে নিরাপদ থাকবে।

ঙ. শহীদের মাথায় মহাসম্মানিত জান্নাতি মুকুট পরানো হবে, যা মূল্যবান ইয়াকুত পাথর দুনিয়ার সব সম্পদ থেকে উত্তম এবং বাহাত্তরজন জান্নাতি হুরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে।

চ. একজন শহীদকে তার নিকটাত্মীয়দের থেকে ৭০ জন লোকের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে।[৭]

এ ছাড়াও রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করতে গায়েবানা জানাজা, কুরআন তিলাওয়াত, শহিদদের জন্য প্রার্থনা, অস্থায়ী মসজিদ স্থাপন ও ইমাম নিয়োগের প্রশাসনিক নির্দেশের প্রমাণও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিলপত্রে পাওয়া যায়। যেখানে এটাও বলা আছে, "This arrangement is required to boost up the moral of the service-man." অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে এসব (ইসলাম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের) আয়োজন যোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়েছিল।[৮] যুদ্ধের ময়দানে এভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, বক্তব্য, বিবৃতিতে ইসলামের আলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায়। মৃত্যুর ভয় তাদেরকে দুর্বল করতে পারে নি। এ পথে যে কোন সময় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই স্বাধীনতাকামি জনতা সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছিলেন। বাঁচতে হলে বাঁচারমত বাঁচতে হবে। পরনির্ভর হয়ে নয় বরং আত্মনির্ভর হয়েই বাঁচতে হবে। কারো গোলামি করে নয়, স্বাধীনভাবে বাঁচতে হবে। এটাই ছিল তাদের মূলমন্ত্র।

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বিশেষ করে জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। তারা দুজনেই সামরিক ট্রাইব্যুনালে তথা কথিত বিচারের নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের কাছে তা সম্ভব

---

৫ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮, পৃ. ২১

৬ সূরা বাক্বারাহ, আয়াত : ১৫৩

৭ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *সুনান তিরমিযী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ১৬৬৯, পৃ. ২৩১

৮ হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র*, খ. ৩, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৬১৯

হয়নি। কিন্তু এ দেশের অগনিত মুক্তিকামি জনতাকে, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, আইনজীবী সহ অসংখ্য মানুষকে তারা একের পর হত্যা করে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

বাঙালি জাতি বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ করেছে রক্ত দিয়েছে কিন্তু জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিমদের জন্য দু'টি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাঙালি নেতৃবৃন্দের দোদুল্যমানতার কারণে সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। তাই বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ এর ২১ ফেব্রুয়ারির বক্তৃতায় বললেন,

> ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়-সম্প্রীতির, সম্প্রীতির নামে বাংলাকে আর কলোনি বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। শুধু গুলি খেয়ে নয়, নাখেয়েও শহিদ হচ্ছে। যারা বাঙালিদের অধিকারের দাবি বানচালের ষড়যন্ত্র করছে, বাঙালিদের ভিখারি বানিয়ে, ক্রীতদাস করে রাখতে চাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেয়া হবে।[৯]

ভারত বর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও আবার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার পথে ঠেলে দেয়। পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে করতে হয়েছে লড়াই–সংগ্রাম। এই নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই-সংগ্রামের পূর্বভাগে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এজন্য প্রায় এক যুগ ধরে তাকে জেলে কাটাতে হয় এবং প্রায় সারাটা জীবন নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। এই সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম ছিল বহুবিধ ঘটনা, বিরূপ পরিস্থিতি, অসম আর্থিক বণ্টন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বঞ্চনাসহ গুরুতর বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যেসব ইস্যুতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তার মধ্যে ছিল ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রভাষা, অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর আজীবন নির্ভরশীল করে রাখার এক অপকৌশল, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলো যেন কখনো স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হতে না পারে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। কিন্তু বাঙ্গালী কি পরনির্ভরশীল জাতি ? তারা চেয়েছিল বিশ্বের বুকে আত্মনির্ভরশীল জাতিরূপে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ঝাপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন যার নেতৃত্বে। ৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দিয়ে এক পর্যায়ে মুক্তিকামি জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, "কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে লাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না"।[১০] তার এ কথার বাস্তবতা ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইটে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছিল। নিরস্ত্র বাঙালির উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণে অসংখ্য বাঙালি প্রাণ হারালেও তারা থেমে যায়নি। বরং মৃত্যুকে পরোয়া না করে জীবন বাজি রেখে এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল। না হলে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা পেতাম না।

"১৯৭০ সালের ৬ দফার ভিত্তিতে বাংলার জনগণের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট পাওয়ার পর ৬ দফা থেকে একদফা অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস না করায় সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করেন সামরিক শাসক তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন"।[১১]

---

৯ নজরুল ইসলাম [সংক.], *বজ্রনিনাদ*, ঢাকা : জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০২২ খ্রি., পৃ. ৮৭

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১১ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *কোর্ট মার্শাল আমি মৃত্যুকে পরোয়া করি না*, ঢাকা : সূচীপত্র, ২০১৭খ্রি., পৃ. ৯

বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন বাংলার স্বাধীনতা, মানুষের মুক্তি, বাঙ্গালীর আত্মনির্ভরশীলতা, চেয়েছেন বৈষম্যের অবসান। তিনি ঘোষণা করেন বাংলার স্বাধীনতা। ৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে তিনি তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন,

> প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রতেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিবিশনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১২]

সংগ্রাম শুরু হয় প্রতিরোধ ও জনযুদ্ধ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার জন্য সামরিক আইনে বিচার শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ কমান্ডের বাংলার জনগণ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি অপরিহার্য হয়ে যায়। বাঙালীর স্বপ্ন পূরণ হয়। দেশ হয় স্বাধীন। আজ আমাদের বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি সগৌরবে মাথা উচু করে দাড়ানো একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণ আজ আত্মনির্ভর জাতি।

২.৩.১. দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রবাসী অনেক বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে টাকা তুলেছেন, পাকিস্তানের গণহত্যার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন জাস্টিস আবু সায়ীদ চৌধুরী, স্থপতি এফ.আর. খান, প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। শুধু যে বাংলাদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, আগস্টের ১ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসন সহ অসংখ্য শিল্পীকে নিয়ে স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম একটি কনসার্ট সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিনসবার্গ শরণার্থীদের কষ্ট নিয়ে 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামে যে অসাধারণ কবিতাটি রচনা করেন, সেটি এখনো মানুষের বুকে শিহরণের সৃষ্টি করে। ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়। অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই বাঙালী জাতি আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

২.৩.২. আত্মসমর্পণ

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহবান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তান জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই!

---

[১২] *বজ্রনিনাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাত কোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।[১৩] ঐদিন থেকেই বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির আত্মনির্ভরতার পথ চলা শুরু হয়ে অব্যাহত আছে। এসেছে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। আজ স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

২.৪. স্বাধীনতা পরবর্তী আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭২ সালে দেশে ফেরার পর শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে বঙ্গবন্ধু যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার সাথে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেওয়া তার বিভিন্ন বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মাধ্যমে জাতি জানতে পারে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা কি ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠন করার জন্য বঙ্গবন্ধু বললেন-

> গত ৭ ই মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দুর্গ গড়ে তোল' আজ আবার বলছি আপনারা একতা বজায় রাখুন। আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশ রূপেই বেঁচে থাকবে। গত দশ মাসে পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসাবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি-যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায় তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। তোমরা, আমার গেরিলা ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্য। তোমরা রক্ত দিয়েছো। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরা সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান।

এ ভাষণের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত, অসহায়, ঘরবাড়ি হারা, আত্মীয় স্বজন হারা একটি জাতিকে তিনি স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে ঘুরে দাড়ানোর জন্য। আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার এক রূপরেখা প্রণয়ন করেন।[১৪]

২.৫. আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা

১৯৪৭ খ্রি. বৃটিশদের শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রতি আচরণ ছিল প্রভূ ও দাসের মত। শাসন ক্ষমতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক। তাই তারা প্রথমেই আঘাত হানলো

---

[১৩] মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা : প্রতীতি, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৪২

[১৪] মিঠুন সাহা, *বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-ভাবনা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০২০খ্রি., পৃ. ৫১

মাতৃভাষার উপর। সেখানে সফলতা অর্জনে তারা ব্যর্থ হলে পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে তাদের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আর জালিমের জুলুম বড় মনে হলেও তা স্থায়ী হয় না। কিন্তু মাজলুমের ফরিয়াদে আল্লাহর সাহায্য যখন নেমে আসে তখন জালিম পালানোর রাস্তাও খুজে পায় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না"।[১৫] আরও এরশাদ করেছেন, "তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, জালিমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট"।[১৬] হযরত রাসূল সা. বলেন, "সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে জালিম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা"।[১৭] পাকিস্তানি জালিমদের শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতাকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মা-বাবা তার সন্তানের মায়া ত্যাগ করে, স্ত্রী তার স্বামীকে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পিছপা হন নাই। খেয়ে না খেয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তাইতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে"।[১৮] মা বোনেরা তাদের গহনা বিক্রি করে, যার কাছে যা কিছু ছিল সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। নিজে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছেন। দেশের সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, বিমান বাহিনী, আনসার সকলে মিলে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে শত্রুর মোকাবেলা করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ "আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়"।[১৯] আমাদের সবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না থাকলে, পরিবর্তনের চেষ্টা না থাকলে হয়ত আমরা স্বাধীনতাই অর্জন করতে পারতাম না। দেশের মানুষকে স্বাধীন, স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতিরূপে গঠন করতে দেশের সব শ্রেণির মানুষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন বলে আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন,

> সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না- চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সবাইকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।[২০]

২.৬. স্বাধীন ও পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে জনগণের ব্যাপক আগ্রহ

বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের নানাবিধ বৈষম্য ও বঞ্চনার কারণে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তে ঐক্যমতে পৌছে। তারা দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর জীবনযাপনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য

---

১৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮

১৬ সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫১

১৭ *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৪৩৪৪, পৃ. ৭৬

১৮ নজরুল ইসলাম [সংক.], *বজ্রনিনাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৯ সূরা আর রাদ, আয়াত : ১১

২০ দৈনিক সময়ের আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২১

সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল-সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আলাদাভাবে একটু বেশি চেষ্টা করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা সেই চেষ্টা করল না। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসেবে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা সবকিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হলো ঠিক তার উল্টা, সবকিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। বাজেটের ৭৫% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল বেশি, শতকরা ৬২ ভাগ। সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল সেনাবাহিনীর সংখ্যা, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৫ গুণ বেশি।[২১] অর্থনৈতিক, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে জাতিকে পঙ্গু করার পর এর পরে আঘাত আসে ভাষার উপরে। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।[২২] সাথে সাথে পাকিস্তানের বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। দেশে সামরিক শাসন, তার উপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর এতরকম বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি খুব সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্যে স্বায়ত্বশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবকরম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের উপর যেরকম অত্যাচার নির্যাতন চলছিল, তার মাঝে ছয় দফা দিয়ে স্বায়ত্বশাসনের মতো একটি দাবি তোলায় খুব সাহসের প্রয়োজন। ছয় দফার দাবি করার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগের ছোট বড় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়া হলো। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে একটি কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্যে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহিতার একটি মামলার প্রধান আসামি করে দেয়া হলো।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কিছুতেই এটা মেনে নিল না এবং সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেল-জুলুম, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর গুলি, কিছুই বাকি থাকল না, কিন্তু সেই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেল না। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল ছাত্ররা, তাদের ছিল এগারো দফা দাবি। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন জেলের বাইরে, তিনিও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলন একটি গণবিস্ফোরণে রূপ নিল কার সাধ্যি তাকে থামায়? ৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ফুটফুটে কিশোর মতিউর, প্রাণ দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ যার নামে আইয়ুব গেটের নাম হয়েছিল আসাদ গেট।

তারিখটি ছিল ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ, কেউ তখন জানত না ঠিক দুই বছর পর একই দিনে এই দেশের মাটিতে পৃথিবীর জঘন্যতম একটি গণহত্যা শুরু হবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে, এ ঘোষণাটি যখন রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ একাদশের খেলা চলছে। মুহূর্তের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে

---

২১ আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা : আগামী প্রকাশন, ১৯৯৪ খ্রি. *পৃ.* ৩২-৩৮

২২ মহান একুশে সূবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভাষণ, পৃ. ১৫৬৭-১৫৬৯

আসে, পুরো ঢাকা শহর দেখতে দেখতে একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার স্লোগান: জয় বাংলা বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনাচে কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারির গতিবিধি থামানোর জন্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। দেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। মাওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলে দিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে। কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ। পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেল, জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বস্তরের মানুষ যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জালিমদের বিরুদ্ধে। ফলে আমরা খুব সহজে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই। তাই বিশ্বের বুকে আমরা আজ একটি স্বাধীন ও আত্মনির্ভর জাতি।

২.৭. জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সূচক সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বিশ্বে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের স্বাধীন মানচিত্র। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে নিরস্ত্র বাঙালির ৯ মাসের যুদ্ধেই রচিত হয়েছিল লাল সবুজের পতাকা। পৃথিবীতে এত অল্প সময়ে আর কোনো দেশ স্বাধীন হয়নি। সে কারণে দামটাও বেশি দিতে হয়েছিল। স্বাধীনতার অর্ধশত বছরের মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। তলাবিহীন ঝুড়ির খেতাব পাওয়া ছোট্ট বদ্বীপটি আজ বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশ। অর্থনীতির আকার ৩০০ বিলিয়ন ডলার। প্রতিযোগী এবং পার্শ্ববর্তী অনেক দেশকে পেছনে ফেলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি এখন ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ।

এক অমিত সম্ভাবনার হাতছানি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। মেইড ইন বাংলাদেশ নামে বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছে পোশাক খাত। ইতিমধ্যে মিলেছে মধ্যম আয় ও উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি। অর্থনৈতিক সামাজিক সূচকগুলোতে ঈর্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। লাল সবুজের পতাকা নিয়ে মহাকাশে ভাসছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো। বিশ্বশান্তিতে নোবেল এসেছে। পিছিয়ে নেই খেলাধুলাতেও। বিশ্ব দরবারে নতুন পরিচিতি এনে দিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ি উপাধি পাওয়া দেশটি ৪৯ বছরে বিশ্বে এখন উন্নয়নের রোল মডেল। যে দেশকে শোষণ, বঞ্চনা, নানাবিধ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছিল পাকিস্তান, আজ তারাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে। গড় আয়ু ৪৭ বছর থেকে ৭২ দশমিক ৮ বছরে উন্নীত হয়েছে।

১৯৭২ সালে দারিদ্রের হার যেখানে ছিল ৮৮ শতাংশ, সেখানে আজ এ হার কমে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে আগে শতভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হতো বৈদেশিক অনুদান থেকে। এখন প্রায় ৬৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হয় দেশীয় সম্পদের উৎস থেকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশের মানুষের

৫০১ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আজ দুই লাখ দুই হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

৪০০ মেগাওয়াট থেকে ২৩ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন। স্বাধীনতার পর সারা দেশে পাকা সড়ক ছিল তিন হাজার ৬১০ কিলোমিটার। বর্তমানে তা ২১ হাজার ৫৯৬ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। ২২ শতাংশ থেকে ৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে শিক্ষার হার। ১৯৭১ সালে ১০ হাজার ৪৯০ জন মানুষের জন্য একজন রেজিস্ট্রার চিকিৎসক ছিল। বর্তমানে দুই হাজার ৫৮১ জনে একজন চিকিৎসক। যদিও চিকিৎসার এই অর্জন যথেষ্ট নয়। কিন্তু রয়েছে বিশাল সম্ভাবনার হাতছানি। ১৯৭১ সালে শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। এখনও বাংলাদেশে প্রধান সমস্যা দুর্নীতি। এ দুর্নীতি রোধ করতে হবে। পাশাপাশি সর্বজনীন সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। এ দুটি বিষয় সফলভাবে করতে পারলে বিশ্বে সবক্ষেত্রে রোল মডেল হবে বাংলাদেশ।[২৩]

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দমমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ-যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ।[২৪]

স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি(১) কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি(২) উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তে(৩)। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবারলক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি(৪) মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপনকরা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সব উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

---

২৩ দৈনিক যুগান্তর, ০১ ফেব্রু ২০২০

২৪ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৬৪ শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ঔষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। সম্প্রতি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের আইটি শিল্প ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে গেছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। খাদ্যেও অনেকাংশে স্বনির্ভরতা এসেছে।

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদন্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে।[২৫] এ ধরনের অগণিত অর্জন বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে অনেক দুর নিয়ে গেছে। আগামীতে যদি আত্মনির্ভরতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় আশা করা যায় অতি দ্রুত বাংলাদেশের মানুষ আত্মনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হবে।

---

[২৫] সূত্র : ওয়ার্ল্ড ব্যাংক উদ্ধৃত- http://www.bangladesh.gov.bd বাংলাদেশের অর্জন

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা

৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা, মানব সম্পদ উন্নয়নে কুরআনের জ্ঞানের অপরিহার্যতা, আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইসলামী পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১. মানব সম্পদ উন্নয়ন

একটি দেশের উন্নয়নের মূল শক্তি হলো দক্ষ মানব সম্পদ। উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উন্নয়ন ঘটাবে মানুষই। অতএব দেশে যত রকমের সম্পদ এবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাই দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, শিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠীই সম্পদ। তাই জনশক্তি ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দেশের মানুষকে স্বাক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনমুখী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ইউএনডিপি (UNDP) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মানব সন্তান সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সকলেই তাদের যোগ্যতার প্রসার ঘটাতে পারে এবং বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই যে জীবনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্মগত অধিকার আছে তার সর্বজনীয় স্বীকৃতি হল মানব সম্পদ উন্নয়নের মূলভিত্তি।[১]

এম এ ভের্মা বলেছেন, একটি সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর প্রতিক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়ন। আবার ফ্রেডরিক এ ই হারবিশন আরো জোর দিয়ে বলেছেন, "মূলধন, এবং ভৌত সম্পদের কোনটিই একটি জাতির সম্পদ নয়। শুধু মানব সম্পদই একটা জাতির আসল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়"।[২]

মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা খুব সুবিধাজনক নয়। নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার জন্য এ খাতকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সরকার ও সচেতন নাগরিকদের কাছে ইতোমধ্যেই এ

---

১ *Resource UNDP Human development report 1994*. Delhi : Oxford University prass, 1994, p. 13

২ গোলাম মোস্তাকীম, *বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭খ্রি., পৃ. ১২১

বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়টি আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিকল্পহীন পূর্ব শর্ত।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সুশীল সমাজ গঠন, সম্পদের সুষম বন্টন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর এসব বিষয়ে সামাজিক উন্নতি সাধনে একজন ইমাম বর্ণনাতীত ভূমিকা রাখতে সক্ষম। একজন ইমাম বিভিন্নভাবেই সমাজের অনেক গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। তাই তিনি ইচ্ছা করলে মানব সম্পদ উন্নয়নে নৈতিকগুণ বৃদ্ধিতে, জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৩.১.১. মানব সম্পদ উন্নয়নে কুরআনের জ্ঞানের অপরিহার্যতা

মানবিক জীবন যাপনে অজ্ঞ, পথহারা, অসহায়, ক্ষুধার্ত, চরিত্রহীন একদল যাযাবর মানব গোষ্ঠীর কাছে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাদের হেদায়েতের জন্য তাদের মধ্য থেকে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মনোনীত করে আইয়ামে জাহেলিয়া থেকে মুক্তি দিতে তার উপর অবতীর্ণ করেছিলেন আল কুরআনুল কারীম। এই কুরআনের প্রথম বাণীটিই ছিল 'ইক্বরা' অর্থাৎ পড়ুন। অজানাকে জানা, জ্ঞানার্জন করা, নতুন কিছু করা, নিজেকে চেনা, দুনিয়াবি ও পরকালীন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে জ্ঞানার্জনের বিকল্প নাই। সুরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এ শিক্ষাটি মানব জাতিকে দিয়েছেন। এই কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে সেই মরুবাসী আরব যাযাবর বেদুঈন লোকগুলো সোনার মানুষে পরিণত হল। একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণের পরিবর্তে শুধু কুরআনিক শিক্ষায় আলোকিত হয়ে পরস্পর আপন ভাইয়ে পরিণত হল। জন্মের কারণে নয় শুধু ধর্মের সম্পর্ক বিবেচনায় হযরত আবু বকর (রা.). হযরত বিলাল (রা.) এর উপর নির্যাতন মেনে নিতে না পেরে নিজের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করলেন। মদিনার আনসারগন নিজের পৈতৃক সম্পত্তি সহোদর ভাইয়ের মতো ভাগ করে নিয়ে অসহায় ভিন দেশী মুসলিম ভাইকে মাথাগোজার জায়গা করে দিলেন। থাকা, খাওয়া, বসবাস সহ সর্বাত্মক সহযোগিতা করে তাদেরকে আত্মনির্ভর্লশীল হতে সহযোগিতা করলেন। এ কাজটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র ওহীর জ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে। নিজেকে, নিজের পরিবারকে, নিজের সমাজকে পরিবর্তন করতে জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই। জ্ঞানহীন মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ। সেজন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ঘোষণা করেছেন। এই পৃথিবীতে মানুষ বসবাসের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন অগণিত নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করে রেখেছেন। আর সে নেয়ামতরাজি ভোগ করার মাধ্যমেই মানুষ সুন্দর ভাবে এ পৃথিবীতে বসবাস করবে এটাই আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন-

وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا "তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান দান করা হয়েছে"।[৩] আল কুরআনের অন্যত্র এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তোমাদের আল কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়; তোমাদের

[৩] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৫

আরো শিক্ষা দেয় যা তোমরা কখনই জানতে না সেগুলো"।[৪] আর এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ উন্নত জীবনযাপন করবে, জীবিকা নির্বাহ করবে, সে আত্মনির্ভরশীল হবে। পৃথিবী পৃষ্ঠে, অভ্যন্তরে, সাগর-মহাসাগরে, বায়ুমন্ডলে, জীব-জন্তু, গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষের প্রয়োজনীয় যত নেয়ামত আছে তা জানার ও ব্যবহার করার জন্য কুরআন নির্ভর দুনিয়াবি জ্ঞান এবং পরকালে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আর এই দুটি জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে। এটাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।

৩.২. সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা

অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ ও এর মূলনীতি: মানুষের জীবনযাপনের সাথে যে সকল বিষয় খুবই জরুরি। আধুনিক সভ্যতার যুগে যা ছাড়া জীবনই চলে না তা হলো অর্থ-সম্পদ। এই অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর নির্ভর করে জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। একজন মানুষকে জীবনযাপনে আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে হলে অর্থ উপার্জন, জমা করা, ব্যয় করা, এক কথায় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। অন্যথায় নানাবিধ সমস্যায় পড়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে পরনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করা লাগতে পারে।

৩.৩. ইসলামি অর্থনৈতিক জ্ঞানের অপরিহার্যতা

অর্থ শব্দের একটি অর্থ উদ্দেশ্যে বা তাৎপর্য হলেও এখানে অর্থ এর মানে হলো ধন, টাকা, কড়ি, সম্পত্তি, শব্দের তাৎপর্য (শব্দার্থ), জাগতিক সৌভাগ্য, কল্যাণ।[৫] দৌলত, পয়সা কড়ি, বিত্ত সম্পত্তি, বিষয় ঐশ্বর্য, সংগতি, পুঁজি। জীবিকা, জীবনোপকরণ, সহায়, সম্বল, অবলম্বন। ইংরেজি ভাষায় অর্থকে বলা হয় money যার শাব্দিক অর্থ টাকা-পয়সা, মুদ্রা, wealth মূলধন।[৬] আরবি ভাষায় অর্থ সম্পদ, জীবিকা, জীবন-সামগ্রী ইত্যাদি বুঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়- مَالٌ (মাল) বহুবচনে اَمْوَالٌ অর্থ ধন, মাল, অর্থ, পণ্য, সম্পদ, তহবিল।[৭] এছাড়া অর্থের জন্য مَتَاعٌ (মাতা'), رِزْقٌ (রিয্ক) শব্দগুলোও ব্যবহার করা হয়। কুরআনে অর্থ সম্পদ ও জীবিকা বুঝানোর জন্যে উক্ত শব্দগুলো ছাড়াও রূপক অর্থে فَضْلُ الله (আল্লাহর অনুগ্রহ) এবং نِعْمَةُ اللهِ (আল্লাহর দান) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্যে মানুষের যেসব উপায় উপকরণ এবং সহায় সম্বল প্রয়োজন হয় সেগুলোকে বা সেগুলোর বিকল্পকেই অর্থ সম্পদ বা জীবিকা বলা হয়। নিম্নে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩.৩.১. অর্থনীতির ইসলামী সংজ্ঞা

ইসলাম অর্থনীতির আলাদা অস্বাভাবিক কোনো সংজ্ঞা প্রদান করে না। ইসলাম বলে: সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ, মানুষ সম্পদের আমানতদার এবং অর্থ মানব জীবনের অখন্ড ও অবিভাজ্য বিষয় সমূহের

---

৪ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ১৫১

৫ সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬খ্রি., পৃ. ৯৬

৬ Dr. Islam Mohammad Hashanat, Dr. A. H. Khan, and K. N. Akhi, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, , Dhaka : Sahitya Sambher, 2016, P. 517

৭ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯খ্রি., পৃ. ৮৬১

একটি মাত্র। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে, আল্লাহ নির্দেশিত জীবন দর্শনের ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা আহরণ, আহরিত সম্পদের ন্যায্য বন্টন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যয় ও ভোগ ব্যবহারের নির্দেশনাই অর্থনীতি। এটাই অর্থনীতির সঠিক সংজ্ঞা হওয়া উচিত। ইসলামি অর্থনীতি একই সাথে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। ইসলামি অর্থনীতিতে উন্নয়ন ও সমস্যার সমাধান নির্দেশনা প্রদান করা হয় আদর্শ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকির মতে : "Islamic economics is the Muslim thinkers' response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience."[৮]

S. M. Hasanuz Zaman এর মতে ইসলামী অর্থনীতি হলো,

> One way of defining Islamic economics is to qualify the term modern economics with Islam, viz. Islamic economics is 'the study of economics in the light of Islamic principles', or 'bringing economics in consonance with the Shari'ah'. But this would imply that the definition of the science of economics has a universal acceptability which it does not.[৯]

ড. আহমদ মুখতার বলেন, অর্থনীতি ওই শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যয় নিয়ে আলোচনা হয়।[১০]

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ড. মুসফির কাহতানি লেখেন, ইসলামী অর্থনীতি হলো ওই সব বিধান ও নিয়মনীতি, যা দ্বারা সম্পদ উপার্জন, ব্যয় ও বৃদ্ধি ব্যবস্থাপনা করা হয়।[১১]

৩.৩.২. ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আত্মনির্ভরশীলতা অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী। ইসলামে অর্থনীতির লক্ষ্য কী, তা আমাদের জানতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ:

৩.৩.২.১. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

ইসলামে অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে : আল্লাহ তোমাদের আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন।[১২] লোকদের মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে করবে।[১৩]

---

[৮] Lectures on Islamic Economic Thoughts, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Jeddah : Islamic Development Bank, 1992, P. 69

[৯] Zaman, S. M. Hasanuz, "*Definition of Islamic Economics", Journal of King Abdulaziz University : Islamic Economics,* Vol. 1, No. 2, 1984, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3127466

[১০] ড. আহমাদ মুখতার উমর, *মুজামু লুগাতিল আরবিয়্যা আল মুআসিরা*, খ. ৩, পৃ. ১৮-১৯

[১১] তাকিউদ্দিন আন নাবহানি, *আন নিজামুল ইকতিসাদি ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারুল উম্মাহ, ১৪১০হি. পৃ. ১

[১২] সূরা আন-নাহ্‌ল, আয়াত : ৯০

[১৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৫৮

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ করেছেন, তা যেমন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য রাষ্ট্রের উপর। কাজেই সরকারকে শ্রমিক, কৃষক সহ সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতি সুবিচার করতে হবে। ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও দায়িত্ব একই।

৩.৩.২.২. নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ

নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতি আল্লাহ বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের ঘোষণা হচ্ছে, "পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত তাদের অনুগ্রহ করতে চাই। তাদের পৃথিবীতে ইমাম (নেতা) ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই। তাদের পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করতে চাই"।[১৪] এ হচ্ছে বঞ্চিতদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সাধারণ নীতি। উত্তরাধিকারী করার অর্থ হচ্ছে এমন সুযোগ-সুবিধা দেয়া, যাতে বঞ্চিতরা পৃথিবীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপভোগ করতে পারে। এ নীতির অর্থ, এমন বেতন, সুবিধা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বসবাসের সুবিধা, যা তাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। কাজেই ইসলামী অর্থনীতিতে এমন সব আইন, বিধি, নীতি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে সাধারণ লোকজনের স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষিত হয় এবং তা কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়। তারা আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে পারে।

৩.৩.২.৩. অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি উৎখাত করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে সাধারণ নীতি দিয়েছেন (যা অর্থনীতিতেও সমভাবে প্রযোজ্য) তা হচ্ছে, "যাদের পৃথিবীতে ক্ষমতা দেয়া হয় তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সালাত ও যাকাতের প্রতিষ্ঠা, মারুফ-এর (সুকৃতি বা ভালো কাজ) আদেশ দেয়া এবং মুনকার (দুর্নীতি) প্রতিরোধ করা"।[১৫]

আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নীতি, পলিসি ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করা, যাতে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং দুর্নীতি দূর হয়। একইভাবে এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, অর্থনীতি থেকে এমন সব ব্যবস্থা, নীতি, পলিসি, প্রতিষ্ঠান, আইন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ, অপসারণ ও দূর করা- যার ফলে জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। এসব কাজ করা ইসলামী সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য। আর যদি এ নীতি বাস্তবায়িত হয় তাহলে সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। দুর্নীতি হ্রাস পাবে আত্মনির্ভরশীলতার পথ তরান্বিত হবে।

৩.৩.২.৪. জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করা

আল্লাহর নবী (সা.)-এর অন্যতম দায়িত্ব এভাবে নির্ধারণ করেছেন, "তিনি তাদেরকে বোঝা থেকে মুক্ত করেন এবং যেসব শিকলে তারা আবদ্ধ, তা থেকে তাদের মুক্ত করেন"।[১৬] নবী (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিটি মুসলিম সরকার ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সেসব অন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, বিধি-বিধান ও নিয়মনীতি থেকে উদ্ধার করা, যা জনগণের জীবনের উপর বোঝা ও শিকল হয়ে আছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا "তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না"।[১৭] তাই ইসলাম চর্চা ও জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের জন্য যা সহজ তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

১৪ সূরা কাসাস, আয়াত : ৫-৯

১৫ সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৪১

১৬ সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

১৭ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) [অনু. সম্পাদনা পরিষদ], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩খ্রি., খ. ১, হাদীস নং- ৬৯, পৃ. ৫৭

৩.৩.২.৫. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা

ইসলাম জনকল্যাণের জন্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার চায়। এ জনই ইসলাম পতিত জমি ফেলে রাখাকে সমর্থন করে না। যে কেউ তিন বছর পর্যন্ত জমি ফেলে রাখলে মহানবী (সা.) তা নিয়ে নিতে বলেছেন। পতিত সরকারি জমি আবাদ করার জন্য, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এক-দশমাংশ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে হলেও চাষিদের কাছে বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩.৩.২.৬. সম্পদের সুষম বণ্টন

ইসলাম সম্পদের যথাযথ বণ্টনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নীতি নির্ধারণী ঘোষণা হচ্ছে, "সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে না থাকে"।[১৮]

৩.৩.২.৭. কল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা

নবী (সা.)-এর দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি তাদের জন্য পবিত্র দ্রব্য হালাল এবং অপবিত্র দ্রব্য হারাম করেন"।[১৯]

এ আয়াতের আলোকে ইসলামের উৎপাদন ব্যবস্থায় অপবিত্র দ্রব্যের কোনো স্থান নেই। অর্থাৎ, সেখানে কেবল স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র দ্রব্যই থাকবে। তাই ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য, জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য বা দ্রব্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং সব অকল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রফতানি ও ব্যবসা নিষিদ্ধ করা।

ইসলামি অর্থনীতি মানব কল্যাণের অন্যতম উপাদান। সমাজ থেকে অকল্যাণের পথ বন্ধ করে কল্যাণের স্রোতধারা বইয়ে দেয়াই ইসলামি অর্থনীতির কাজ।

৩.৩.৩. অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মূলনীতি

নিম্নে অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মূলনীতিগুলো তুলে ধরা হলো-

০১. অর্থ সম্পদের মূল মালিক ও যোগানদাতা এই পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

যা কিছু আকাশ সমূহে ও ভূমন্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।[২০]

০২. মানুষ সম্পদের মূল মালিক নয়, আমানতদার এবং ব্যবহারকারী বা ভোক্তা মাত্র। সুতরাং সে সম্পদের উৎপাদন, উপার্জন এবং ভোগ ব্যবহার করবে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক। এটাই ইসলামি অর্থনীতির একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (আইনও চলবে) তাঁর।[২১]

---

[১৮] সূরা হাশর, আয়াত : ৭

[১৯] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

[২০] সূরা বাক্বারাহ, আয়াত : ২৮৪

[২১] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৫৪

০৩. মানুষের আর্থ সামাজিক বিষয়াদি তার বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে একীভূত ও অবিভাজ্য। সুতরাং তার আর্থ সামাজিক বিষয়াদির উন্নয়ন ও ইতিবাচক নির্দেশনার ভিত্তি হবে নীতিবাচক তথা তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং শরিয়া তথা কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা।

০৪. ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম মূল নীতি হলো, জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, কুল এবং গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন বা মানব কল্যাণ।

০৫. ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আদল তথা ইনসাফ, সুবিচার ও ভারসম্যপূর্ণতা (Justice and balance)|

০৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংঘাত নয় বরং পারস্পারিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতা (ইহসান)।

০৭. ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় যুলম ও নির্যাতনমূলক সকল পন্থা ও প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ।

০৮. ইসলামি অর্থব্যবস্থা উৎপাদন, উপার্জন ও উন্নয়নমুখী।

০৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থ সম্পদের কৃপণতা, অলস পূঞ্জীভূত করণ এবং অনুৎপাদনশীল সঞ্চয় নিষিদ্ধ।

১০. ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের অপব্যবহার, অপব্যয় এবং অপচয় নিষিদ্ধ।

১১. ইসলামি অর্থনীতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

১২. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকারের স্বীকৃতি।

১৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নির্দেশনা সম্বলিত সার্বজনীন জনহিতৈষী ব্যবস্থা।

১৪. অর্থ হবে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে মানুষ ও মানবতার মুক্তির হাতিয়ার।

১৫. ব্যক্তি মালিকানার অধিকার। পুরুষ নারী প্রত্যেকেই বৈধ পন্থায় অর্জিত নিজ সম্পদের স্বত্বাধিকারী সে নিজে। বৈধ পন্থায় স্বাধীনভাবে এর বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যবহারের অধিকার তার জন্যে সংরক্ষিত।

১৬. যাকাত : অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের অধিকার হিসেবে ধনীদের নগদ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ, ফল ফসল এবং গবাদি পশুসহ সর্বপ্রকার বর্ধনশীল সম্পদের যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

১৭. সুদ ও সুদী কারবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৮. উত্তরাধিকার বিধান : শরিয়া নির্ধারিত নিকট অত্মীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার বন্টন বাধ্যতা মূলক।

১৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, মাকাসিদে শরিয়া বা ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়ন।

২০. ইসলামি অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, বিশ্বাসী হিসেবে দুনিয়ায় সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে আখিরাতের সাফল্য অর্জন।

৩.৩.৪. কুরআনের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আয়াত

বৈশিষ্ট্য নীতিমালা সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো :

- لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর ভান্ডারের চাবিকাঠির মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার জীবিকায় (অর্থ সম্পদে) প্রশস্ততা দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা সীমিত দিয়ে থাকেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী"।[২২] এ আয়াতের মাধ্যমে সম্পদের মালিকানার বিষয়টি আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন। আর ধনী-গরিব হওয়ার বিষয়টিও আল্লাহর হাতে ইচ্ছা করলেই কেউ সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে না।

- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا "আল্লাহ সেই মহানুভব সত্ত্বা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন"।[২৩] এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা স্পষ্ট করেছেন।

- وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ "(হে মানুষ!) আমি পৃথিবীতে তোমাদের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সেখানেই রেখে দিয়েছি তোমাদের জীবনের উপকরণ (অর্থাৎ পৃথিবীর বুকেই তোমরা জীবিকা সন্ধান সংগ্রহ করো)"।[২৪] এ আয়াতের মাধ্যমে সমুদয় সৃষ্টির উপর মানুষকে কর্তৃত্বের ক্ষমতা দান করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তার জীবিকার ব্যবস্থা হবে সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

- وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

  "আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেটার জন্যে তোমরা লালসা করোনা। পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ (অর্থ সম্পদ, সহায় সম্বল) প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী"।[২৫] এ আয়াতে লোভ লালসায় পড়ে অন্যায়ভাবে উপার্জনের চিন্তা পরিহার করে সৎভাবে উপার্জনের তাকিদ দিয়েছেন।

- وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "এবং তাদের (বিত্তবানদের) অর্থ সম্পদে অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিতদের"।[২৬] এ আয়াতে আল্লাহ অর্থনীতি সচল রাখার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যাকাত ফরজের কথা ঘোষণা করেছেন।

- مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

---

২২ সূরা আশ শূরা, আয়াত : ১২

২৩ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৯

২৪ সূরা আল আরাফ, আয়াত : ১০

২৫ সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩২

২৬ সূরা আয যারিয়াত, আয়াত : ২৯

"আল্লাহ জনপদবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে যা (যে সম্পদ) দিয়েছেন- তা আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতিমদের, অভাবীদের এবং পথচারীদের জন্যে। এর উদ্দেশ্য হলো, অর্থ সম্পদ যেনো কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়"।[২৭] এ আয়াতটির মাধ্যমে সমাজের অভাবী, দরিদ্র, অসহায়, ফকির, মিসকিনদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ধনীদের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্পদকে যেন কেউ শুধু নিজের ভোগের জন্য মনে না করে। সবাই আত্মনির্ভরশীল হতে পারলে সম্পদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা পাবে এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

- إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ "তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে লেনদেনের (ঋণ দেয়া নেয়ার) ফায়সালা করবে, তখন তা লিখিতভাবে করবে"।[২৮] অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তাহলো লেনদেন বা চুক্তি করার সময় বিষয়টি লিখিত আকারে সম্পাদন করে নিবে। যাতে পরবর্তীতে কোন পক্ষ অস্বীকার, পরিমানে বৃদ্ধি, কম করতে না পারে।

- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ "তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন"।[২৯] এ আয়াতে আল্লাহ ধনী-গরীব সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করেছেন। গরিব যেমন ধনীদের জন্য পরীক্ষার গরীবের অবস্থাটাও ধনীদের জন্য তেমন পরীক্ষার। কারণ সমাজের একজন আরেকজনের উপর নির্ভরশীল। তাই তাদের প্রত্যেকের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে সে বিষয়টি এখানে ফুটে উঠেছে।

- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ "তাদের জিজ্ঞেস করো, কে হারাম করলো আল্লাহর সেই সব সৌন্দর্যকে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে উৎপন্ন করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ সমূহকে?"[৩০] এ আয়াতে হালাল জিনিসকে হারাম হিসেবে আবার হারামকে হালাল গন্য না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

- إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও ভালো। আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তবে তা অধিকতর ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া হবে। তোমরা যাই করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত"।[৩১] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দান করলে যে শুধু মানুষের অর্থনৈতিক উপকার হয় বিষয়টি সে রকম নয়, বরং এতে দানকারীর জন্যও পরকালে রয়েছে মহাপুরস্কার।

---

২৭ সূরা আল হাশর, আয়াত : ৭

২৮ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৮২

২৯ সূরা আল আল-আনআ'ম, আয়াত : ১৬৫

৩০ সূরা আরাফ, আয়াত : ৩২

৩১ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৭১

- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ "এই সাদাকা (যাকাত) নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো ফকিরদের জন্যে, মিসকিনদের জন্যে, সাদাকা আদায়-বন্টন বিভাগের কর্মচারীদের জন্যে, তাদের জন্যে (ইসলামের পক্ষে) যাদের মন আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হবে, দাস মুক্তির জন্যে, ঋণে নিমজ্জিতদের সাহায্যের জন্যে, আল্লাহর পথে এবং পথিকদের সাহায্যের জন্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফরয"।[৩২] এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সমাজের একমাত্র অসহায়, অভাবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কে কে যোগ্য তার তালিকা প্রকাশ করেছেন। এর বাহিরে গিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে না। এ কাজটা ধনীদের জন্য ফরজ যা আদায় না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি হবে। আত্মনির্ভরতা সৃষ্টির জন্য সামাজিক দায়িত্ব আল্লাহ ধনীদের উপর দিয়েছেন। এ বিষয়গুলো এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

- وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ "আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং অভাবী ও পথিকদের দাও তাদের প্রাপ্য। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করোনা। কারণ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই"।[৩৩] এ আয়াতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অপচয় ও অপব্যয় করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এগুলো মানুষের জীবনে দারিদ্র ও ধ্বংস ডেকে আনে।

- يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "হে আদম সন্তান! সালাত আদায়কালে তোমাদের উত্তম পবিত্র পোশাক পরে সৌন্দর্য গ্রহণ করো। আর আহার করো, পান করো, কিন্তু অপচয় করোনা। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"।[৩৪] এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পোশাক পরিচ্ছদে সৌন্দর্যের পাশপাশি অপচয়, অপব্যয় থেকে নিষেধ করেছেন। ইসলাম সৌন্দর্য বিরোধী নয়, বরং অপচয় ও অপব্যয় বিরোধী।

- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا "তুমি (কার্পণ্য করে) নিজের হাতকে গলায় বেঁধে রেখোনা, আবার (উজাড় করে খরচ করে ফেলার জন্যে) তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করেও দিওনা। এমনটি করলে তিরস্কৃত হবে এবং খালি হাতে বসে পড়বে"।[৩৫] এ আয়াতে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করা বা কৃপণতা না করার জন্য বলা হয়েছে।

- وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا "(আল্লাহর প্রিয় লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপচয়-অপব্যয় করেনা, আবার কার্পণ্যও করেনা; বরং উভয় চরম পন্থার মাঝখানে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে"।[৩৬] এ আয়াতে জীবনযাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল এবং উত্তম পবিত্র। তোমরা তাই খাও, ভোগ করো। তবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ

---

৩২ সূরা তাওবা, আয়াত : ৬০

৩৩ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৬-২৭

৩৪ সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৩১

৩৫ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৯

৩৬ সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ৬৭

করোনা"।[৩৭] এ আয়াতে হালাল বস্তু গ্রহন করতে এবং শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে হারাম পথে পা বাড়ায়। যা কখনো মুমিনের জন্য শোভনীয় হতে পারে না।

উল্লেখিত আয়াত সমূহকে বিশ্লেষণ করলে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সুন্দরভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপনের পদ্ধতি ফুটে উঠেছে।

৩.৪. আল কুরআনে বর্ণিত কর্মসংস্থান

আল কুরআন মানব জাতির জীবন বিধান। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। কর্মের মাধ্যমে মানুষ বাঁচে। আর কমের্র মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য অসংখ্য উৎসের বর্ণনা বিশ্ববাসীর জন্য আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃত করেছেন। বলা হয়েছে- وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ "যদি আল্লাহর নেয়ামত (কর্মক্ষেত্র) গণনা কর, গণনা করে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু"।[৩৮] তাই চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা নিত্য-নতুন কর্মক্ষেত্র উদঘাটন করা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খুবই জরুরী। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি: এর দ্বারা দারিদ্র ও বেকারত্ব দুর করে ইসলামি পন্থায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

৩.৪.১. কায়িক শ্রম

প্রচলিত ধারণায় যার বিনিময় শুধু এই দুনিয়ায় আদায়যোগ্য, তাকেই সাধারণত: শ্রম বলা হয়। ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাতে যার বিনিময় আছে তাকেই প্রকৃত শ্রম বলা হয়। তাই একজন মুসলিমের যাবতীয় শ্রমই ইবাদত সমতুল্য। মুমিন এবং একজন শ্রমিক জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রম উভয় শ্রমেরই সমান বিনিময় রয়েছে। আল কুরআনে আকাশ এবং পৃথিবীর উপর জীবনোপকরণের যে সব উপাদানের বর্ণনা রয়েছে, তাতে চিন্তাশীলদের জন্য মহা কল্যাণের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। প্রত্যক্ষভাবেই বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন"।[৩৯] মুমিনগন এই হিসেবে দুনিয়া এবং আখেরাতে প্রাপ্য মর্যাদা পাবেন। এই দিকের বিবেচনায় একজন মুমিন দুনিয়াতে গবেষণা, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আবিষ্কার ইত্যাদিতে যে শ্রমই ব্যয় করুক না কেন, তার জন্য এতে কোন অকল্যাণ, অমঙ্গল, কিংবা তা দুনিয়াবি কর্ম বলে নিরুৎসাহিত করার সুযোগ নেই। অথচ কতিপয় লোকের ভুল ব্যাখ্যা, প্রচার প্রচারণায় সে শ্রমের বাজারগুলো থেকে মুসলিম জাতি আজ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। কর্মহীন হচ্ছে, উপার্জনের উন্মুক্ত ও গুরুতপূর্ণ পথ আরো সংকুচিত হয়ে আসছে। ফলে জাতি আত্মনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য এখান থেকে উত্তরণ ঘটানো খুব জরুরী হয়ে পড়ছে।

৩.৪.২. কৃষি প্রযুক্তি

মানব জাতির প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) তার জীবন সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ.) কে নিয়ে আল্লাহর নির্দেশে এ পৃথিবীতে আগমন করেন। জীবন ধারণের তাকিদে তিনি চাষাবাদ শুরু করেন। তাই কৃষি

---

[৩৭] সূরা আল আল বাক্বারাহ, আয়াত : ১৬৮

[৩৮] সূরা আন আন-নাহ্‌ল, আয়াত : ১৮

[৩৯] সূরা হুদ, আয়াত : ৩

প্রযুক্তির প্রথম উদ্ভাবক ছিলেন হযরত আদম (আ.)। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চাষ করে ফসল উৎপাদন করেন। আধুনিক জীবনযাপনের তথ্য সূত্র নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তার বান্দাহদের দ্বারা নতুন করে আবাদ করেছেন। আল কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

"তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিয্ক আহার কর"।[৪০] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারপর উৎপন্ন করেছি নানারূপ শস্য, আঙ্গুর, শাকসবজি, যয়তুন, খেজুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য এগুলো তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তুর জীবিকা সামগ্রীরূপে"।[৪১] এভাবে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কারীমায় ইঙ্গিত রয়েছে আয় বর্ধক অনেক শস্য ও ফল-মুল-শাক-সবজি, ফুলের চাষ, কৃষি খামার, পোল্ট্রি খামার ইত্যাদি পেশা গ্রহনের মধ্যে অসংখ্য লোকের দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে তাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকলের দায়িত্ব। প্রকৃত পক্ষে এ দায়িত্ব ঈমানের সাথে পালনের মাধ্যমেই তাকে পূর্ণতা দেওয়া হয়।

৩.৪.৩. ভূমিকে যথাযথ উৎপাদনের কাজে লাগানো

ভূমিতেই মহান আল্লাহ মানুষের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

"সে মহান সত্ত্বা আল্লাহ জমিনকে তোমাদের জন্য নরম, সমতল, অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা সে জমিনের সর্বদিক ও পরতে পরতে পৌঁছাতে চেষ্টা কর, আর সেখান থেকে পাওয়া আল্লাহর রিয্ক তোমরা ভক্ষণ কর। আর শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদের উত্থান ঘটবে"।[৪২] এ জন্যই মহানবী (স.) পতিত ভূমি আবাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন--

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

"যার জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে"।[৪৩]

মহানবী (সা.) পতিত জমি কেবলমাত্র চাষ করতেই বলেননি বরং উৎসাহ দেয়ার জন্য পতিত জমিতে চাষকারীর মালিকানারও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন-

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"যে লোক পোড়া ও অনাবদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে"।[৪৪]

---

৪০ সূরা আল-মুলক, আয়াত : ১৫

৪১ সূরা আবাসা, আয়াত : ২৭-৩২

৪২ সূরা আল মুলক, আয়াত : ১৫

৪৩ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি., হাদীস নং- ৩৭৭৩, পৃ. ৪৭,

পতিত জমি আবাদে মহানবী (সা.) এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বলেন, "জমি আবাদ না করলে তিন বছর পর তার কোন অধিকার থাকবে না"।[৪৫] তিনি আরও বলেন, "আর যে শুধু তার সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে অথচ তার চাষ করেনি, তিন বছর পর তাতে তার কোন অধিকার নেই"।[৪৬]

৩.৪.৪. নদী, সমুদ্র ও মৎস প্রকল্প

নদ-নদী ও সমুদ্রে আল্লাহর অফুরন্ত রিয্কের ব্যবস্থা রয়েছে। আল কুরআনে মৎস প্রকল্পের কথাও ঘোষিত হয়েছে। চিন্তা-গবেষণা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই প্রকল্পকে আরো আধুনিকীকরণ করে বেকারত্বের চাপ কমিয়ে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব। এ সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্য স্থলে পৌছতে পার"।[৪৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "আমি তাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক স্পষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"।[৪৮] উল্লেখিত আয়াত সমূহে নৌ-সমুদ্র যোগাযোগ, নৌ-জাহাজ শিল্প, কাঠ শিল্প, জুয়েলারী শিল্প, বনন শিল্প, মৎস প্রকল্প, পানি সম্পদ, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি। এ সব কর্মক্ষেত্রে বহু লোক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করছে। এ পেশা সম্পর্কে ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের কাছ থেকে ও সমাজপতিদের নেতিবাচক বক্তব্য আসার কারণে হাতে গোনা দু চার জন মুসলিম ছাড়া এ পেশায় মুসলমানদের প্রধান্য দেখা যায় না। কুরআনে বর্ণিত এ সকল পেশায় চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে প্রভুত উন্নতি সাধন করতে পারলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব।

৩.৪.৫. পশু-পাখি পালন ও চামড়া শিল্প

গরু, ছাগল, দুম্বা, উট, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, পশু-পাখি ইত্যাদি পালন অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এর মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত নিহিত রয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারণ উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাক। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য, যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। আর এ গুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌছাতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু। আর তিনি সৃষ্টি

---

৪৪ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং- ১৩৮৩, পৃ. ৪০

৪৫ ড. মায়েজুর রহমান, *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩২

৪৬ আবু ইউছুফ, *কিতাবুল খারাজ*, করাচী : দারুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৬৫

৪৭ সূরা আন আন-নাহ্ল, আয়াত : ১৪-১৫

৪৮ সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত : ৭০

করেছেন তোমাদের শোভা ও আরোহণের জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও"।[৪৯] এই শিল্প ও কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "তাদের (চতুষ্পদ প্রাণীর) দুধে রয়েছে অনেক উপকারিতা এবং তা থেকে তোমরা আহার কর"।[৫০] এ সকল আয়াতে কারীমাতে ঈঙ্গিত পাওয়া যায়- চামড়া শিল্পের, ব্যাগ, জুতা, মোজা, বেল্ট ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কথা, আধুনিক পোশাক শিল্পের কথা, পোল্ট্রি ও ডেইরী প্রযুক্তির কথা, দুগ্ধ ও বেকারী শিল্পের কথা। যেখানে অসংখ্য বেকার ও দারিদ্র শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের শিক্ষা কারিকুলামে এ সকল খাতকে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী সিলেবাস প্রণয়ন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, শিক্ষার্থীদের এখাতে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে এ খাতটি দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যক্তি উদ্যোক্তা, বিভিন্ন কোম্পানী ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আরো আধুনিক, মসৃন ও ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হলে দেশে বেকারত্বের চাপ কমানো যাবে। যা জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৪.৬. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

বর্তমান যুগের আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "এবং আমি তাদের জন্য নৌযানের মত আরো যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাদের উপর তারা আরোহন করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেয়ার কারণে তা করি না"।[৫১] এই আয়াতের মধ্যে দুনিয়াকে যেমন সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে বলা হয়নি। তেমনি তাকে চরমভাবে গ্রহণ করতেও বলা হয়নি। সীমিত সময়ের এই দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা আরো ইঙ্গিত পাওয়া যায় আকাশ পথ জয়ের, ড্রাইভিং, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে বেকারত্বের চাপ কমিয়ে স্বাবলম্বী হতে। একজন ঈমানদার নামাজি সৎভাবে যে কোন উপায়ে যে কোন পেশাকে অবলম্বন করে অভাব, দারিদ্র বিমোচনে সমাজে সক্রিয় অবদান রাখবে এটাই প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়। ইসলামে আশরাফ-আতরাফের কোন মূল্য নেই। প্রকৃত মূল্য নিহিত রয়েছে তার তাকওয়া পূর্ণ জীবন গঠনে।

৩.৪.৭. মৌমাছি পালন

মহান আল্লাহ সবকিছুকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মৌমাছিকে বলা যায় আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ঔষধ তৈরী করার কারিগর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কেননা তার পরিশ্রমে উৎপাদিত মধু মানুষের জন্য সর্ব রোগের ঔষধ, তাই মৌমাছি চাষাবাদ করে মধু উৎপাদন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া আমাদের এই সবুজ শ্যামল বাংলাদেশে খুব সহজ একটি পথ। মহান রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে মৌমাছি মানুষে কল্যাণে আত্মনিবেদিত। বাংলাদেশে মধুর প্রাকৃতিক উৎসের পাশাপাশি বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করে মধু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ, যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঔষধ হিসেবে এর ব্যবহার গুণ বৃদ্ধির সাথে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর গুনাগুন ও পরিচয় দান করে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে 'আন নাহল' নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সুরা নাযিল করেছেন। এ সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। তারপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর অত:পর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ

---

৪৯ সূরা আন নাহল, আয়াত : ৫-৮

৫০ সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত : ২১

৫১ সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৪২-৪৪

কর। তার উপর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই তাতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য"।[৫২] মধু উৎপাদনের জন্য রয়েছে সুবিশাল সুন্দরবন, গাছপালা পরিবেষ্টিত অসংখ্য পাহাড়-পর্বত। এ সকল প্রাকৃতিক খাত ও চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎপাদিত মধু প্রক্রিয়াজাত করে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব। ফলে তৈরি হবে অগনিত বেকার ও দারিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল কর্মসংস্থান। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধুর উপকারিতা নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করলে আরো বেশি মানুষকে এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া সম্ভব হবে। এর চাষ বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ও বাস্তব প্রশিক্ষন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে ডাক্তারীকে পেশা হিসেবে গ্রহণের জন্যও উদ্বুদ্ধ করার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।

৩.৪.৮. বনজ সম্পদ

প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে গাছ-গাছালীর অবদান সবচেয়ে বেশী। গাছপালা, লতাপাতা পরিবেশের এক অপরিহার্য উপাদান। ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়রোধ, বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে, মানুষের আহার ও প্রাণীকুলের জীবনধারনের জন্য বনজ সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিভিন্ন দিক ও বিভাগ বনজ সম্পদ কেন্দ্রিক পরিচালিত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনি পবিত্র যিনি উদ্ভিদ ও অনেক অজানা বস্তুকে জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনেক রহস্যই মানুষ জানে না"।[৫৩] বনের ফল-ফলাদি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে ঝর্ণা সমূহ যাতে তারা (মানুষ) তার ফল খায় অথচ তা তারা তৈরি করেনি"।[৫৪] আল্লাহর দেওয়া এই ফল ফলাদি প্রাণী কুলের খাদ্য ও পুষ্টির একমাত্র অবলম্বন। বর্তমান এই ফল ফলাদির চাষ দেশে এক নীরব বিপ্লব এনেছে। তাকে আরো গতিশীল করা জরুরী। এ ছাড়া কাঠের আসবাব পত্র তৈরী ও গৃহ নিমাণ সামগ্রী হিসেবে সব সময় কাঠের প্রয়োজন পড়ে। এর ভিত্তি করে বর্তমানে বিশ্বময় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেখানে অগনিত মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। তাই জাতীয়ভাবে এই খাতকে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে আরও যে কত রহস্য রয়েছে তা এখনো অনাবিস্কৃত।

৩.৪.৯. বস্ত্র এবং লৌহ শিল্প

বস্ত্র এবং লৌহ মানব সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে জান্নাতি পোশাকে নিজেদের আবৃত করেন। দুনিয়ায় আগমনের পরেও পোশাক পরিহার করেননি। পশুর লোম, গাছের ছাল-বাকল, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। আর আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ.) লৌহ শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন সব ঘর তৈরি করে দিয়েছেন যে গুলোকে তোমরা সফর ও স্বগৃহে অবস্থান উভয় অবস্থায়ই সহজে বহন করতে পারো। তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রী সমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে। আল্লাহর সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় তৈরি করেছেন এবং তোমাদের এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে বাঁচায়। আবার এমন কিছু অন্যান্য পোশাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তার নিয়ামত সমূহ সম্পূর্ণ করেন, হয়তো তোমরা

---

[৫২] সূরা আন নাহল, আয়াত : ৬৮-৬৯

[৫৩] সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৩৬

[৫৪] সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৩৪-৩৫

অনুগত হবে"।[৫৫] এ শিল্পেও অনেক কর্মের সংস্থান রয়েছে। সুতরাং এতে স্পষ্ট হয় যে, সমস্ত কর্মের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন। তাই কোন কর্মকেই ছোট, অমর্যাদাকর না ভেবে বরং তার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের মাধ্যমে আরো রহস্যপূর্ণ কর্মের ব্যপকতা সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে সম্মানজনক রিযকের ব্যবস্থা। সমস্ত কুরআনকে এভাবে বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞান, উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মধ্যে দারিদ্র্য বেকারত্ব দূরীকরণের উজ্জল দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই প্রচার-প্রচারণায় শুধু মৌখিকভাবে কুরআন তেলাওয়াতে পূণ্য অর্জনের বিষয়টি গুরুত্ব পেলেও কর্ম ছাড়া দারিদ্র্য বেকারত্ব দূরীকরণ যে সম্ভব নয় তা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়নি। ইসলাম প্রচারেও বিষয়টির অনুপস্থিতিই দেশের হত দরিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিধর্মীরা সুদী কারবার ও ধর্মান্তরিতের সুযোগ নিচ্ছে। অথচ আল কুরআনে বলা হয়েছে- "জনপদের লোকেরা ঈমানদার এবং সৎ হলে আসমান জমিনের দরজা সমূহকে খুলে দেয়া হয় অবারিতভাবে। এটা আল্লাহরই নির্দেশ"।[৫৬] এর মধ্যেই বেকারত্ব দূরীকরণের তত্ত্ব অনুসন্ধান জরুরি।

পৃথিবীতে এভাবে অসংখ্য শ্রমের ক্ষেত্র সৃষ্টি করার পর বলা হল ليس للانسان الا ما سعى "মানুষ অবশ্যই তার কর্মের দ্বারা প্রচেষ্টা সফল করতে পারে"।[৫৭] অন্য সূরায় বলেছেন, "তোমাদের যে বিপদ আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল"।[৫৮] কাজ করে আত্মনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে"।[৫৯] এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় কোন কর্মকে ছোট, অসম্মানজনক মনে না করে আন্তরিকতার সাথে বৈধ পথে শ্রম দিলে তাতে একটি জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন সুনিশ্চিত। এটা আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি।

৩.৪.১০. চিকিৎসা বিজ্ঞান

আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসা পেশায় এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা অভূতপূর্ব সাফল্য রেখে গেছেন। প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সিনার অভূতপুর্ব অবদান বিশ্ববাসী ভোগ করে চলেছে। অথচ বর্তমানে মুসলমানদের কাছে এটি খ্রিস্টানদের পেশা ছিল বলে প্রচারণা পেয়ে আসছে। অথচ হাদিসের কিতাবে মহানবী (সা.) এর চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করে "كتاب الطب" নামে আলাদা একটি অধ্যায়ই রয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে যখন মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো নিরাপত্তা ছিলনা এবং আরবদের মাঝে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন জটিল বিষয় নিয়ে ঘোর মতবিরোধ ছিল না-ঠিক তখন কুরআনে বর্ণিত প্রথম ৫ আয়াতের মধ্যে একটি আয়াতে বলা হলো "আল্লাহ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঝুলন্ত লেগে থাকা বীর্য থেকে"।[৬০] এই বীর্য ১২০ দিনের মাথায় একটি মাংসপিন্ডে পরিণত হয় একটি মানব আকৃতি ধারণ করে। তারপর প্রায় নয় দশ মাস মাতৃগর্ভে থেকে একটি নবজাতক শিশু হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়। এই ভ্রুণ তত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি জমাট রক্তরূপে পরিণত করেছি। তারপর জমাট রক্তকে গোশত পিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর গোশত পিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। তারপর অস্থিকে গোশত দিয়ে আবৃত করেছি। অতঃপর তাকে অন্য

---

৫৫ সূরা আন নাহল, আয়াত : ৮০-৮১

৫৬ সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৯৬

৫৭ সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৮

৫৮ সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৯

৫৯ সূরা আর রাদ, আয়াত : ১১

৬০ সূরা আলাক, আয়াত : ২

এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়"।[৬১] আল্লাহর সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায় একটি ভ্রূণ যখন মায়ের গর্ভে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়। তারপর সে মায়ের গর্ভ থেকে আল্লাহর হুকুমে এই পৃথিবীর আলোর মুখ দেখে। এই সময় থেকেই মূলত রোগব্যাধি শুরু হয়। সুতরাং তাকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কুরআনে মধুকে মহৌষধ বলা হয়েছে সুতরাং মদ বা হারাম জাতীয় দ্রব্যাদি দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হলে তা সেবন বৈধ কি-না তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কারণ মদের কিছু উপকারিতা আছে। এ বিষয়টিকে নতুনভাবে চিন্তা-গবেষণায় নিয়ে আসা জরুরি। কারণ এই পেশার মধ্যে লক্ষ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। কুরআনের বহু আয়াতে এই পেশার সাথে মানুষের কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে. তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড থেকে"।[৬২] এভাবে অসংখ্য আয়াতে চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে কর্মসংস্থানেরও ইঙ্গিত রয়েছে। নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কার হচ্ছে। পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে সহজ ও নতুন পদ্ধতি আবিস্কৃত হচ্ছে। রোগ নির্ণয় করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিস্কার ও তার ব্যবহারের জন্য অসংখ্য মানুষ নানাভাবে কাজ করছে। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই এ খাতে আরো যোগ্য জনশক্তির প্রয়োজন বিশ্বময় রয়েছে। যার মাধ্যমে সেবা ও কর্ম করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা খুবই সহজ। কুরআন মানুষের নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের সাথে সাথে উপযোগী কর্মসংস্থানের বহু পথ ও পরিক্রমা সন্ধান দিয়েছে এগুলো আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

৩.৪.১১. গবেষণা ও উন্নতি

বর্তমান দুনিয়ায় আল্লাহর খাস রহমতে ওহীর জ্ঞানের আলোকেই মানব জাতি উন্নত জীবনযাপন করার সুযোগ পেয়েছে। নানাবিধ বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। আধুনিক বিশ্বের যত উন্নতি, অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে সব মানুষের চিন্তা গবেষণার ফসল। অধিক পরিমানে ফসল উৎপাদন, মহাকাশ বিজয়, আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তির আবিস্কার ও ব্যবহার সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে উন্নত গবেষণা দ্বারা অর্জিত হয়েছে। কৃষি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, পরিবেশ, জনসংখ্যা ইত্যাদি অন্যতম এবং এই বিষয়ে গবেষণা কাজে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মনে করা হয় ইসলামে কোন গবেষণার কথা বলা হয়নি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم "প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যা আমার কাছে উচু মর্যাদা সম্পন্ন (কুরআন নিজেই একটি মহান) জ্ঞানগর্ভ কিতাব"।[৬৩] তার প্রমাণ স্বরূপ কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হলো, "আল্লাহর নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় নিকৃষ্টতম সেই বধির ও মুক, যারা কিছুই বোঝে না"।[৬৪] অন্যত্র

---

৬১ সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত : ১২-১৪

৬২ সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ৫

৬৩ সূরা আয্-যুখরুফ, আয়াত : ৪

উম্মুল কিতাব বা মূল কিতাব, প্রত্যাদেশের মূল ভিত্তি। সংরক্ষিত ফলক (লাওহ্ মাহ্ফুজ) হচ্ছে প্রত্যাদেশের আসল অংশ বা সারাংশ, মূল নীতিমালা অথবা বিশ্বজনীন, চিরস্থায়ী আল্লাহ্র আইনের মূল উৎস। এই মূল উৎস থেকে সকল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনন্ত ধারা প্রবাহিত হয় যা সর্ব যুগে সকল মনের সৃজনশীল ক্ষমতা ও চিন্তাকে জাগ্রত করে। উম্মুল কিতাব আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত। এই কিতাবের সম্মান ও জ্ঞান আমাদের ধারণার বাইরে।

৬৪ সূরা আল আনফাল, আয়াত : ২২

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "তিনি (আল্লাহ) গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন"।[৬৫] অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদের উপর গোমরাহী চাপিয়ে দেন। বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর"।[৬৬] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। তোমাদের সৃজনে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি (পানি) বর্ষণ দ্বারা পৃথিবী কে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে"।[৬৭] গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গবেষণা কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন, "তবে কি তারা (মানুষ) কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ"।[৬৮] অথচ নামাজে মুসলমানরা শুধু কতিপয় ইবাদাতকে মুক্তির সোপান হিসেবে বিবেচনা করছে আর নিদর্শনাবলীকে নিয়ে গবেষণা করাকে দুনিয়ার কাজ বলে তা থেকে দূরে থাকছে। আর নামাজি মুসলমানরা আজ তাদের নিয়মিত প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করছে, তারা মনে করছে কুরআন শুধু আখিরাতের ভয়াবহ আজাব থেকে মুক্তির জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে অথচ বিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত প্রায় ৭৫০ আয়াত রয়েছে কুরআনে তা প্রকাশ পায় না শুধু প্রকাশ পায় মাত্র ৮০ বার নামাজের নির্দেশের কথা। এই গবেষণা পেশায় যে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে তাকে কখনোই বেকারত্ব দূরীকরণের দৃষ্টিতে চিন্তা করা হয় না। কিন্তু কুরআন নিয়ে গবেষণা করে পৃথিবীর অনেক অমুসলিম জাতি উন্নতির শিখরে আরোহন করে সারা বিশ্বময় দুর্দান্ত প্রতাপে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর মুসলমানগন তাদের তৈরী করা জিনিসপত্র কিনে তাদেরকে উন্নতির শিখরে আরোহন করতে মনের অজান্তে নিরবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। অথচ কুরআন ছাড়া এমন আর কোন গবেষণার গ্রন্থ একটিও খুজে পাওয়া দুরুহ ব্যাপার এক কথায় বলা যায় নাই বললেই চলে। অথচ কুরআনের ধারক ও বাহকেরা এর ফায়দা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। যদি মুসলিম দেশগুলো এ ব্যাপারে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করতো তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় মুসলমানদের সাথে পাল্লা দিয়ে সবাই হেরে যেতে বাধ্য হত। তাই নিজেদের উন্নতি ও আত্মনির্ভরশীলতার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র সমূহের এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবী। গবেষণার সুফল শুধুমাত্র গবেষককে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে না; বরং তা একটি দেশের ও দেশের বাহিরের জনগোষ্ঠীকে কর্মের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। তাই এ সম্ভাবনাময় খাতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা অত্যন্ত জরুরী।

৩.৪.১২. পর্যটন শিল্প

পৃথিবীতে মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক তথা কর্মজীবনের দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই মানসিক শান্তির পাশাপাশি আল্লাহর সৃষ্টি অবলোকন করার মানসে মানুষ চায় কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়াতে। দেখতে চায় আল্লাহর সৃষ্টি নির্দশন। আল্লাহর নির্দশন দেখায় কুরআনের কথাগুলো তুলে ধরা হলো-আল্লাহ বলেন-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"(হে রাসূল) আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম"।[৬৯]

---

৬৫ সূরা হুদ, আয়াত : ০৩

৬৬ সূরা ইউনুস, আয়াত : ১০০-১০১

৬৭ সূরা আল জাসিয়াহ, আয়াত : ৩-৫

৬৮ সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪

৬৯ সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২০

এ সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

"তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী"।[৭০] ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলে থাকেন, পর্যটন হলো জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান। সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন তথা শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ভ্রমণ করা খুবই উপকারী।

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হজ অর্থও ভ্রমণ এবং ওমরাহ অর্থও ভ্রমণ। ইসলাম সফরকে কখনো নিরুৎসাহিত করেনি। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার ভ্রমনের নির্দেশনা এসেছে। এ কারণেই ভ্রমন এমনই একটি কাজ যা একইসাথে একটি ইবাদত, উপার্জন, আত্মনির্ভরশীলতা এবং আনন্দেরও মাধ্যম। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

"কুরাইশদের অনুরাগ, তাদের আসক্তি শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ। সুতরাং তাদের উচিত এই (কাবা) ঘরের প্রভুর ইবাদত করা। যিনি ক্ষুধায় তাদের অন্ন দিয়েছেন; ভয়ে দিয়েছেন নিরাপত্তা"।[৭১] ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ হজ পালন করতে হয় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে। হজের আনুষ্ঠানিকতাও অনেকটা সফর নির্ভর। সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, মিনা, মুযদালিফা এবং আরাফাত ময়দানে অবস্থান এবং পরিভ্রমনসহ ইত্যাদি হজের আবশ্যিক কার্যাদি সম্পাদনের প্রয়োজনে প্রত্যেক হাজির জন্য সফর আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এতদ্ব্যতিত ইসলামের অন্যতম আরেকটি রুকন যাকাত আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো বিত্তহীন মুসাফিরকে দান করা। অর্থাৎ, বিত্তহীন ও সম্বলহীন মুসাফির বা সফরকারী ব্যক্তির কষ্ট লাঘব পূর্বক তার যাত্রাপথকে মসৃণ করা। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মুসাফির বা সফরকারী ব্যক্তিকে যাকাত দানের খাত হিসেবে নির্দিষ্ট করে ইসলাম মূলতঃ ভ্রমনের গুরুত্ব তুলে ধরার সাথে সাথে সামগ্রিক ভ্রমন কার্যক্রমকেই উৎসাহিত করেছে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে সফরের কারণে শ্রেষ্ঠতম আবশ্যিক ইবাদত ফরজ নামাজকে কসর বা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও রয়েছে ভ্রমনের বিশেষ অনুমোদন এবং সমর্থন।

বস্তুত পক্ষে পর্যটনের ধারা হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যা নবী ও রাসূলদের বাস্তব জীবনে ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। হযরত রাসূল (সা.)-এর ইস্‌রা বা মিরাজও এ পর্যটনের অন্তর্ভূক্ত। তাইতো পৃথিবীর আদি থেকে অদ্যাবধি ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, পন্ডিত, নবী-রাসূলের নাম পাওয়া যায়, যারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত ভ্রমণ করে ভ্রমণেতিহাসে অমর হয়ে আছেন। যার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কারীমায়।

---

৭০ সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৭-১৩৮

৭১ সুরা কুরাইশ, আয়াত : ১-৪

৩.৪.১২.১. নবী ও ওলীগণের জীবন থেকে পর্যটনের শিক্ষা

এমন বহু নবী ও ওলী ছিলেন, যারা আল্লাহর সত্য দীন ও আক্বিদার প্রতি মানুষকে পথ দেখানোর জন্য সফর করে তাদের জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) সারাদিন বিভিন্ন স্থানে সফর করতেন এবং যেখানে রাত হতো সেখানেই জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত সুলায়মান (আ.) তার হাওয়াই বাহনযোগে একদিনে এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"আর আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত"।[৭২] এমনিভাবে আল কুরআনে হযরত মুসা (আ.) এবং খিজির (আ.) এর একত্রে ভ্রমণের কথাও বর্ণিত হয়েছে, যারা একত্রে বহু আশ্চর্যজনক স্থান ভ্রমণ করেছেন এবং অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছে আমি থামবোনা, আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব"।[৭৩] এই সফর সংগঠিত হয়েছিল আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) কে জ্ঞান অর্জন, অভিজ্ঞতা অর্জন সহ নানাবিধ বিষয় জানানোর উদ্দেশ্যে। আর এ জন্য হযরত খিজির (আ.) কে তার পথ প্রদর্শক হিসেবে দিয়েছিলেন। এই ভ্রমনে হযরত মুসা (আ.) এমন কতিপয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি তার জ্ঞানের পরিধি আরো বৃদ্ধি করে ছিলেন।

একই সূরায় আল্লাহ তা'আলা যুলক্বারনাইন এর ভ্রমণের কথাও বর্ণনা করেছেন। যুলক্বারনাইন পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

"তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন"।[৭৪]

নুবুওয়াতের দশম বছরে (৬১০ খ্রি.) হযরত রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু তালিব এবং তার স্ত্রী খাদিজা ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কাছে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে উপহার প্রদান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে ৭ম আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করান। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ভ্রমণ আজো এক রহস্যে ঘিরে আছে। আল্লাহ বলেন:

---

৭২ সূরা সাবা, আয়াত : ১২

৭৩ সূরা আল কাহফ, আয়াত : ৬০

৭৪ সূরা আর কাহফ, আয়াত : ৮৩-৮৬

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ھُوَالسَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

"পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল"।[৭৫] আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবীকে এই সফরের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান দান করেন। এই জ্ঞান মহানবী (সা.) এর রিসালাতের কাজ পরিচালনায় স্বনির্ভরতায় পথ চলতে সাহায্য করেছিলো। তাই বলা যায় আত্মনির্ভরতার জন্য ভ্রমন করে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩.৪.১২.২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য ইসলামী শরীয়াতে পর্যটনের অবস্থান

س, ي, ح মূলধাতু হতে উদ্গত السياحة শব্দটিকে শরয়ীভাবে সিয়ামের অর্থে গ্রহণ করা হলেও আভিধানিকভাবে তা বিনোদন বা আবিষ্কার কিংবা জ্ঞানার্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জমিনে ভ্রমণ করার অর্থ প্রকাশ করে।[৭৬] স্বাভাবিক জীবনযাপন ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে বিরত থাকার পর্যটনের এরূপ রীতিও ইসলামপূর্ব সময়ে প্রচলিত ছিলো, যাকে রাহবানিয়াহ (বৈরাগ্যবাদ, সন্ন্যাসবাদ) বলে আখ্যায়িত করা যায়। ইসলাম এ ধরনের সংসার ত্যাগী কার্যকলাপকে সমর্থন করে না। এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর কাছে ইসলাম পূর্ব (سياحة) সংসারত্যাগ এর অনুমতি চাইলে তিনি বলেন,

إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

"আমার উম্মতের জন্য সিয়াহা হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা"।[৭৭]

আধুনিক বিশ্বে পর্যটন শব্দটি চিত্তবিনোদনের অর্থেই নেয়া হয়ে থাকে। এ ধরনের পর্যটন ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল না। ফলে সরাসরিভাবে তা বৈধ বা অবৈধের প্রশ্ন ওঠেনি। বর্তমান সময়ে পর্যটন বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গবেষণা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ইসলাম ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, সেখান থেকেই বিনোদনমূলক পর্যটন সম্পর্কে এর অবস্থান বের করা যায়। ইসলাম ব্যক্তির প্রশান্তির ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান। আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ই রশাদ করেন:

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার চোখেরও অধিকার আছে এবং তোমার স্ত্রীরও অধিকার আছে"।[৭৮]

---

৭৫ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত :১

৭৬ আল মু'জামুল ওয়াসীত, ২০০৪ খ্রি., ৪৬৭

৭৭ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী [অনু. ড. আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক], *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., খ. ৩, হাদীস নং- ২৪৭৮, পৃ. ২৯২-২৯৩

৭৮ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং ১৮৫১, পৃ. ২৭৫-২৭৬

৩.৪.১২.৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব

ইসলাম মানুষের পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের পাশাপাশি তার ইহকালীন প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করে। মানুষের জীবনের যে সব বিষয় ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলো সাধারণভাবে অনুমোদিত। ইসলাম মানুষের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট জীবনাচরণকে বর্জন না করে এর ক্ষতিকারক দিকগুলোকে বর্জন করার উপকারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় প্রাত্যহিক জীবনের সকল কার্যক্রম, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিধি-বিধান, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম মাত্রই এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শরীয়া মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধন, অকল্যাণ দূরীভূতকরণ এবং পরকালীন মুক্তির পথ। মানুষের জন্য আল্লাহর বিধান প্রকৃত পক্ষে তার অপার দয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি আপনাকে মানুষের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি"।[৭৯]

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার গঠন, ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ, কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি শান্তিময় পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে ইসলাম এক অনন্য জীবন ব্যবস্থা। শিল্প উন্নয়নের অসম প্রতিযোগিতার ব্যস্ত আধুনিক বিশ্বে মানুষের কর্ম ক্লান্ত জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পর্যটন শিল্প। মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে শরীয়ার ভারসাম্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম হওয়ায় মাকাসিদ আশ শরীয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচলিত পর্যটন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে এর অবস্থান নির্ণয় করা সময়ের দাবি। জাতিকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আধুনিক বিশ্বে পর্যটনের প্রকৃতি ও ধরনগুলো ইসলামী শরীয়ার আলোকে যাচাই ও বিশ্লেষণ করে এর অবস্থান নির্ণয় করা সময়ের দাবি। পাশাপাশি ইসলামী শরীয়ার মূল উৎস থেকে পর্যটন সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে ইসলামের আলোকে পর্যটন ব্যবস্থা কেমন হবে তা বিশ্লেষণ করে পর্যটন শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দেশ ও জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পথ সহজ হয়ে উঠবে।

প্রচলিত ও আধুনিক পর্যটনের বিকাশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রচুর গবেষণা কর্ম, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও ইসলামের আলোকে পর্যটন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ উপাদান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া এবং তুরস্ক অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ইরান, সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলোও ইসলামী পর্যটনের উন্নয়নের চেষ্টা করছে। ইসলামে পর্যটন সম্পর্কিত বই-পুস্তক ও গবেষণাকর্মের সবই ইংরেজী, আরবী, তুর্কি এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য প্রাপ্ত সূত্র হতে পর্যটন এবং ইসলামে পর্যটন সম্পর্কিত গবেষণা কর্ম অধ্যয়ন করে এ ব্যাপারে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার কিয়দাংশ এখানে প্রদান করা হলো। Din, K. H. (1989) রচিত "Islam and tourism: Pattern, issues, and options."[৮০] শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে মুসলিম দেশগুলোতে পর্যটক আগমনের ধরন নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে পর্যটন উন্নয়ন কৌশল ও পলিসির উপর ধর্মের প্রভাব কেমন তা যাচাই করা হয়েছে। এজন্য তিনি মালয়েশিয়ার মত একটি মুসলিম দেশের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করে তার গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, ইসলামে ভ্রমণ ও আতিথেয়তাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলোর পর্যটন নীতিতে ইসলামের প্রভাব খুব সামান্যই। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মদ ও মাদক জাতীয় পানীয় ইত্যাদি পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে ওঠা পর্যটন শিল্পের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কিন্তু ইসলামে এসব নিষিদ্ধ হবার কারণে মুসলিম দেশগুলোতে এসব উপাদান সহজলভ্য করার সুযোগ নেই। ফলত আরব মুসলিম দেশগুলো থেকে যুবক শ্রেণি মালয়েশিয়ার মত মুসলিম দেশ অপেক্ষা থাইল্যান্ডের মত অমুসলিম দেশকে পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিচ্ছে।

---

[৭৯] সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

[৮০] https://www.sciencedirect.com › article › pii › pdf

CMC Omar, MS Islam, NMA Adaha - Islamic Economics and …, 2013 তাদের "Perspective on Islamic Tourism and Shariah Compliance in the Hotel Management in Malaysia."[৮১] শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, মালয়েশিয়ায় পর্যটন শিল্পে শরীয়া সম্মত হোটেল ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে পর্যটকের আগমন বেড়েছে, এমনকি তা শতকরা ৫৫ ভাগে পৌঁছেছে।

পর্যটন শিল্পে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বহু উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকার কারণে মুসলিম দেশগুলো যাতে শিল্পটিতে পিছিয়ে না পড়ে তার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় M. Battour, MN Ismail, (2016) রচিত "Halal Tourism: Concepts, practises, challenges and future."[৮২] প্রবন্ধে।

Tajzadeh, N. A. A. (2013) রচিত Value Creation in Tourism: An Islamic Approach[৮৩] শীর্ষক প্রবন্ধে কিভাবে ইসলামের আলোকে পর্যটন শিল্পকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করানো যায়, সে বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন, গণমাধ্যম বা মিডিয়াকে ব্যবহার করা।

৩.৪.১২.৪. বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক কালে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল উপাদানের ক্রমবিকাশের কারণে পর্যটন শিল্পে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পর্যটন শিল্প বর্তমান বিশ্বের প্রথম দু'তিনটি শিল্পের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পর্যটনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। পর্যটনকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার এক বিশাল দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্বের সকল বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে "Tourism and Hospitality Management" নামে বিভাগ চালু হয়েছে।

২০১৭ সালের প্রথম ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন) আন্তর্জাতিক পর্যটনে প্রায় ৫৯৮ মিলিয়ন পর্যটক বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন, যা এর আগের বছরের একই সময়ে শতকরা ৬ ভাগ (৩৬ মিলিয়ন) বেশি। ২০১৭ সালে পর্যটক বৃদ্ধির এ হার ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাম্প্রতিক বছরগুলোর চেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ২০১৬ সালে পর্যটন বিশ্ব অর্থনীতিতে সরাসরিভাবে ২.৩ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ১০৯ মিলিয়ন চাকুরির সংস্থান করেছে। একটু বৃহত্তর পরিসরে দেখলে এটি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রায় ৭.৬ ট্রিলিয়ন ডলার এবং ২৯২ মিলিয়ন চাকুরি যোগ করেছে, যা বিশ্বের জিডিপির শতকরা ১০.২ ভাগ। বিশ্বের ১০ ভাগের ১ ভাগ চাকুরি প্রদান করছে পর্যটন সেক্টর। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সূত্র অনুযায়ী ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকের আগমন সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১২৩৫ মিলিয়নে গিয়ে ঠেকেছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৯৪০ মিলিয়ন আর ২০০০ সালে যে সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭৪ মিলিয়ন। এই আগমনের হারের উপর ভিত্তি করে সংস্থা হতে শীর্ষ ১০টি দেশের একটি তালিকা করে থাকে।[৮৪]

---

৮১ https://www.academia.edu › Perspectives_on_Islamic_...

৮২ https://www.sciencedirect.com › article › pii › pdf

৮৩ NAA Tajzadeh - International Research Journal of Applied and …, 2013 -

৮৪ The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), Report 2017, p. 6

৩.৫. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কর্মসংস্থান

৩.৫.১. কর্মসংস্থান হিসেবে মাশরুম চাষ

আমাদের দেশের বড় শহরগুলোর বিভিন্ন হোটেল ও চাইনিজ হোটেলগুলোতে মাশরুমের ব্যাপক চাহিদা আছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে মাশরুমের বাজার মূলত শহরে গড়ে উঠেছে। এছাড়া বিদেশে এর চাহিদা রয়েছে। মাশরুম শুকিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। এজন্য যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিদেশে সবজি ও কাঁচামাল পাঠায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাশরুম বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

মাশরুম চাষ করার জন্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকার প্রয়োজন হবে। যেকোনো সমান জায়গায় কম আলোয় মাশরুম চাষ করা যায়। বীজ বোনার পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ফলন। আট থেকে দশ হাজার বীজ থেকে দৈনিক ১৫-১৮ কেজি মাশরুম পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন আছে। সুস্বাদু এই খাবারের স্বাদ অনেকটা মাংসের মতো। মাশরুম দাঁত ও হাড়ের গঠনে বিশেষ উপযোগী। রক্তহীনতা, বেরিবেরি ও হৃদরোগ প্রতিরোধে এবং বহুমূত্র রোগে বিশেষ কার্যকরী। প্রায় তিন লাখ ছত্রাকের মধ্য থেকে মাত্র ১০ প্রজাতির ছত্রাক খাওয়ার উপযোগী। মাশরুমের রয়েছে বেশ কিছু ঔষধি গুণ। আর এ কারণে এটি খাদ্য হিসেবে খুবই সুলভ, জনপ্রিয় ও চাহিদা সম্পন্ন। খাবার হিসেবে আমাদের দেশে মাশরুমের প্রচলন বেশিদিন আগের নয়, যে কারণে এটা অনেকে খেতে অভ্যস্ত নন।

কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত মাশরুম পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চাষ করা হয়; তাই এটা স্বাস্থ্যকর। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মাশরুমকে অত্যন্ত মর্যাদাকর খাবারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটাকে বেহেশতি খাবার মান্না-সালওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বিভিন্ন কিতাবে। মাশরুম একটি হালাল খাদ্য। কেননা হারাম হওয়ার জন্য সাধারণ মূলনীতি হলো, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নস (দলিল) নেই, তাই হালাল। সুতরাং মাশরুমকে হারাম বলার সুযোগ নেই। বরং মাশরুম ছিল নবীজির প্রিয় একটি খাবার। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ "মাশরুম জান্নাতি একপ্রকার খাদ্য। এর রস চোখের জন্য নিরাময়"।[৮৫] অল্প পুঁজিতে এ লাভজনক ব্যবসা করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা যায়।

মাশরুমে প্রচুর প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন আছে। তাই খাদ্য হিসেবে এটা খুবই পুষ্টিকর। এর উপকারিতা সমূহ হল-রক্তে চিনির সমতা রক্ষা করে ফলে ডায়াবেটিক রোগী এবং যারা স্থুল বা স্বাস্থ্যবান তাদের জন্য উপযুক্ত খাবার। মাশরুম দেহের ক্ষয়পূরণ, হাড় গঠন ও দাঁত মজবুত করে। রক্তহীনতা, হৃদরোগ, ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই দিন দিন মাশরুমের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

৩.৫.২. মধু সংগ্রহ ও চাষাবাদ

মানব জাতির জন্য মধু আল্লাহ পাকের এক মহা নেয়ামত। যুগ যুগ ধরে মানুষ মধু সংগ্রহ করে ও চাষাবাদ করে উপকৃত হচ্ছে। তাই দিন দিন মধুর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মধু সংগ্রহ, চাষাবাদ ও প্রক্রিয়া করণ নিয়ে একটি বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা প্রায় সাড়ে ১৪ শ বছর আগে পবিত্র কুরআনে মৌমাছি ও মধু সম্পর্কে যা বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলো আজ আবিষ্কার করছে। মৌমাছি ও মধু উৎপাদন বিষয়ে আল কুরআন ব্যাখ্যা দিয়েছে।

---

[৮৫] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৩ খ্রি., খ. ৭, হাদীস নং ৪১২৬, পৃ. ২৫৮

পবিত্র কুরআন প্রায় সাড়ে ১৪ শ বছর আগেই বলে দিয়েছে মৌমাছির শরীর থেকে এক প্রকার পদার্থ মিশ্রিত হয়ে মধু তৈরি হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

"আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন, পর্বতগাহে, বৃক্ষ এবং উচু চালে গৃহ তৈরি কর"।[৮৬] এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেছেন,

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"এরপর সব প্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে"।[৮৭] মৌমাছি আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট মধু আহরণ করে। আম্মাজান হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন"।[৮৮] মধু হচ্ছে ওষুধ এবং খাদ্য উভয়ই। মধুকে বলা হয়- বিররে এলাহি ও তিব্বে নব্বী। অর্থাৎ খোদায়ী চিকিৎসা ও নবী কারীম (সা.) এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়। মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র।

মধুর আরো একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে অ্যালকোহল এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন, "তোমাদের ঔষধ গুলোর মধ্যে কোন গুলোতে যদি শিফা থেকে থাকে তবে সেগুলো হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো, মধু পান এবং আগুনের দাগ নেয়া, যেটা যে রোগের জন্যে উপযুক্ত। তবে আমি দাগিয়ে নেয়াকে পছন্দ করি না"।[৮৯]

মধু শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক কথায় শরীরকে সুস্থ রাখতে, রোগ প্রতিরোধ করতে ও রোগ নিরাময়ে মধু খুবই কার্যকর। বিজ্ঞানময় কুরআন ও হাদিসে মধুর উপকারের কথা বহু আগেই বর্ণিত হয়েছে। সব পানীয়ের উপাদানের মধ্যে মধু সর্বোৎকৃষ্ট।

মধু আন্ত্রিক রোগে উপকারী, বিশেষ করে দুর্বল শিশুদের মুখের ভেতর পচনশীল ঘায়ের জন্য খুবই উপকারী। এটা সর্দি, কাশি, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া ও আমাশয়ে উপকারী। ত্রিফলার (আমলকী, হরিতকী ও বহেরা) সাথে একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করলে চুলপড়া বন্ধ হয়। টনসিলের প্রদাহ, গলা ফুলা রোগ আরোগ্যের জন্য মধুর বিকল্প নেই। তাই শারীরিক সুস্থতার জন্য মধুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

---

[৮৬] সূরা নাহল, আয়াত : ৬৮

[৮৭] সূরা নাহল, আয়াত : ৬৯

[৮৮] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস নং- ৫০৩৭, পৃ. ১৩২

[৮৯] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৫২৭৮, পৃ. ২৬১-২৬২

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে দেখা যায় অগনিত খাদ্যগুন ও ঔষধি গুন সম্পন্ন একটি পানীয় খাদ্য হচ্ছে মধু। তাই বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সর্বত্র এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক উপাদান হতে ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে মধু উৎপাদন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন মধু আহরণের একটি বিশাল ক্ষেত্র। এখান থেকে মৌয়ালরা প্রতি বছর প্রচুর পরিমানে মধু সংগ্রহ করে থাকেন।[৯০] বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল, সুন্দরবন ও বিভিন্ন মওসুমী ফলের ফুল থেকে মৌয়ালরা শত শত টন মধু সংগ্রহ করে থাকেন যা দেশের বাজারে বিক্রি করে ও বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর পরিমানে অর্থ উপার্জন করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করছেন।

৩.৫.৩. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য ব্যবসায় যা কিছু প্রয়োজনীয়

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য অগনিত নেয়ামত দান করেছেন। আর সেগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন পেশা ও কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এ সব কাজকে কেন্দ্র করে মানুষ আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। এ ধরনের বিভিন্ন কাজ করতে গেলে রাষ্ট্রীয় নিয়ম নীতি মেনে কাজ করতে হয়। নিম্নে এ ধরনের পেশা এবং সে জন্য যা যা প্রয়োজন সে বিষয়গুলো উল্লেখ করছি। কাপড় সেলাই / দর্জি, পাটের কার্পেট বা পাপোশ তৈরী, বাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি, নার্সারি ব্যবসা, নকশীকাঁথা, ফুলের দোকান, মাটির গহনা তৈরি সহ আরও অনেক আইডিয়া রয়েছে। নতুন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা হলো- নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা, নামকরণ ও কোম্পানী গঠন, ট্রেড লাইসেন্স, কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, টিন নাম্বার, ভ্যাট নিবন্ধন, অফিসিয়াল কাগজপত্র, দলিল ও চুক্তিপত্র, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট, ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কি করে প্রমোট করতে হয় তার বিস্তারিত, আয়ের প্রবাহ শুরু, স্থাপনা ও হিসাব, ব্যাংক লোন সুবিধা, আইনি জটিলতা এ সব কিছু হিসেব করে কাজ শুরু করতে হবে।

৩.৫.৩.১. ব্যবসায়ের জন্য সঞ্চয়

আয়ের পথে পা বাড়ানোর সাথে সাথেই একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। প্রতি মাসের আয় হতে অন্তত ১০ শতাংশ এই সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখতে হবে। বর্তমানে স্থায়ী হতে সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক দিচ্ছে অনেক সুবিধা। কথায় আছে, আজকের সঞ্চয় আগামি দিনের পুঁজি।

৩.৫.৩.২. খরচের ক্ষেত্রে অটো পে ব্যবহার না করা

প্রথমে জেনে নিন কি এই অটো পে। অটো পে হচ্ছে যেকোনো বিল যা সরাসরি একাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়। এ গুলো বিভিন্ন মোবাইল এ্যাপ্সের মাধ্যমে পরিচারিত হয়। যার ফলে আমাদের নিজ হাতে পেমেন্ট করতে হয় না। এতে খরচের হিসাব থাকে না সঠিকভাবে। তাই টাকা নিজ হাতে খরচ করা উচিত। এতে খরচের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা থাকবে স্পষ্ট। আয়-ব্যয়ের হিসাব স্পষ্ট থাকলে উপার্জনে ঝুকি কম থাকে। অনেক সময় হ্যাকাররা একাউন্ট হ্যাক করে সব জমানো টাকা নিয়ে যেতে পারে। যা নিত্যদিনের ঘটনা। তাই যথাসম্ভব এ পদ্ধতির কম করা বা না করাই ভালো।

৩.৫.৩.৩. খরচ ক্যাশ বা চেকের মাধ্যমে করা

বর্তমানে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের ব্যবহার বেড়েছে, সেই সাথে বেড়েছে অযাচিত খরচ। কিন্তু লক্ষ্য যখন সঞ্চয়, তখন কার্ড ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হবে। খরচ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে নিজের হাতে খরচ করা উচিত। নিজের হাতে টাকা পেমেন্ট করলে খরচ চোখের আড়াল হয় না। আয় বুঝে ব্যয় করা সহজ হয় যা আত্মনির্ভরশীলতার জন্য খুবই জরুরী।

---

[৯০] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৪ জানুয়ারি ২০২১

৩.৫.৩.৪. বাজেট তৈরি করা

সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয় এবং ব্যয়ের উপর। তাই প্রতি মাসের আয় এবং ব্যয়ের একটি সুষ্ঠ ধারণা দেয় বাজেট। প্রতিবার খরচের পর খসড়া হিসেবে তুলে ফেলুন কোনো ডায়েরিতে বা হিসেবের খাতায়। এতে আয়-ব্যয়ের একটি সুন্দর লিস্ট তৈরি হবে। এই বাজেট আমাদের সাহায্য করবে অবাঞ্চিত খরচ কমাতে এবং সঞ্চয় বাড়াতে।

৩.৫.৩.৫. সঞ্চয়কে অগ্রাধিকার

কথায় বলে "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়"। সঞ্চয়ী হতে গেলে সর্বপ্রথম সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। সঞ্চয় করাকে প্রাধান্য দিতে হবে। একজন সঞ্চয়ী যেকোনো খরচের পূর্বে, সঞ্চয়ী হিসাবের অংশ তুলে রাখেন। যা অর্থ জমানো আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করবে। আর খরচকে প্রাধান্য দিলেই সঞ্চয়ে বাধা পড়বে।

৩.৫.৩.৬. সব খরচের হিসাব রাখা

যত ছোট খরচই হোক না কেন হিসাবের খাতার যোগ করতে হবে ২০ টাকা, ১০ টাকা, ৫ টাকা, এ আর কি এমন খরচ! ধরে নেই, প্রতিদিন ১০ টাকা খরচ হলো, মাস শেষে কিন্তু তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ টাকা। একজন সঞ্চয়ীর কাছে হিসেব থাকে যেকোনো ক্ষুদ্র খরচের। কেননা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরচ যোগ করেই একটি বিশাল অঙ্কের হিসাব মিলে। তাই যেকোনো খরচ করেই তা টুকে রাখা, একজন সঞ্চয়ীর প্রথম কাজ। আয় বুঝে ব্যয় করা একজন আত্মনির্ভর ব্যক্তির সর্বোত্তম গুন।

৩.৫.৩.৭. যাচাই করে খরচ

একজন সঞ্চয়ী কখনো হুট করেই কেনাকাটায় বিশ্বাসী নন। যেকোনো দ্রব্য কেনার আগে তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিয়েই যাওয়া উচিত। এতে করে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মার্কেটে গেলে আমরা সাধারণত একই পণ্য বিভিন্ন পরিমাণে বিক্রয় করতে দেখতে পাই। একজন সঞ্চয়ী কখনো বাড়তি খরিদ করায় আগ্রহী থাকেন না এবং সে সাথে একই পণ্য যাতে দ্বিতীয়বার কেনার প্রয়োজন না হয় তাও একজন সঞ্চয়ীর কাছে প্রাধান্য পায়। তাই যেকোনো ক্রয়ের পূর্বে পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা উচিত।

৩.৫.৩.৮. পরিবর্তন মেনে নেওয়া

জীবন কখনো এক নিয়মে চলে না। আসতে পারে বহু উত্থান পতন। একজন প্রকৃত আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির সঞ্চয়ে, জীবনের পরিবর্তনের প্রভাব তেমন একটা পড়ে না। সঞ্চয়ী কখনো সঞ্চয় বন্ধ করে বহুবিধ খরচে আগ্রহী হন না।

৩.৫.৩.৯. অন্তত ৩ থেকে ৬ মাসের খরচ জমা রাখা

চাকরিজীবীরা সাধারণত প্রতি মাসের বেতন, মাসের খরচের সাথে সাথেই শেষ করে ফেলেন। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় তো থাকেই না, থাকে না কোনো দুর্ঘটনার জন্য সঞ্চয়। আমাদের অনেকের পরিবারে অর্থ উপার্জন করেন একজনই। তাই পরিবারের কর্তা অসুস্থ বা কোনো দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী হলে পুরো পরিবার ভেঙ্গে পড়ে। কর্তার সুস্থতার জন্য সর্বস্ব দিয়ে পথে বসে যায় বহু পরিবার। এটির মূল কারণ সঞ্চয়ের অভাব। একজন প্রকৃত সঞ্চয়ী অন্তত তিন থেকে ছয় মাসের খরচ সঞ্চয় হিসেবে জমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন অথবা সঞ্চয় করেন যেকোনো দুর্ঘটনার জন্য।

৩.৫.৩.১০. সুদূর প্রসারী চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া

নিজের কাছে সৎ থাকা যেকোনো পরিবর্তন বা নেগিটিভিটি আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। এমনকি জেনে শুনে অনেক ভুল পথে পা বাড়াই। ভবিষ্যত বিবেচনায় না রেখেই নিয়ে ফেলি অনেক সিদ্ধান্ত। পরিবর্তন করতে হবে এ সকল অভ্যাস। যেকোনো ঝুঁকি নেওয়ার আগে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। বাস্তবতা মাথায় রাখতে হবে। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে, নিজের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুন কিছু শুরু করার আগে সময় নিয়ে ভাবতে হবে। নিজেকে সান্ত্বনা না দিয়ে বা নিজেকে ভুল না বুঝিয়ে সত্যটা মেনে নিতে শিখতে হবে। চটকদার বিজ্ঞাপনে অধিক পাওয়ার লোভ সংবরণ করতে হবে। কারণ এতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

৩.৫.৩.১১. পুরষ্কারটা তোলা থাক পরবর্তী জীবনের জন্য

আমাদের সকলের মধ্যে নিজেকে পুরষ্কৃত করার অভ্যাস রয়েছে অনেক বেশী। "ইশ! এ মাসে বড্ড ধকল গেছে, একটা ছুটি কাটিয়ে আসা যাক"। কিন্তু সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে নিজেকে পুরষ্কৃত করতে গিয়েই বিপদের দিকে পা বাড়াই প্রায় সকলেই। হারিয়ে ফেলি ট্র্যাক। ফলে আত্মনির্ভরতার পরিবর্তে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ার ঝুকি বাড়ে। যা মোটেও কাম্য নয়।

৩.৫.৩.১২. শুরুটা হোক ছোট থেকেই

একজন সঞ্চয়ীর প্রথম সঞ্চয়ের পরিমাণ যে বিশাল অঙ্কের হতে হবে তা কিন্তু হয়। সঞ্চয় নির্ভর করে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণের উপর। সঞ্চয় মানে আবার এমনটাও নয় যে, সব স্বাদ আহলাদ বাদ দিয়ে দেওয়া। শুধু বাড়তি খরচটা বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য ছোট একটা অংশ তুলে রাখা। সঞ্চয়ের পথে পা বাড়ানোটাই কঠিন, এরপর সঞ্চয়টা অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তাই যতই কষ্ট হোক, ছোট থেকেই শুরু করা উচিৎ।

৩.৫.৪. ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করে

স্বাবলম্বীতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যবসা বাণিজ্য। পবিত্র কুরআনে ব্যবসার বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ "আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন"।[৯১] পবিত্র কুরআন শুধু বৈধতাই ঘোষণা করেনি বরং ব্যবসার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা শুধু ইবাদাতের জন্য নির্দেশ দেননি বরং বান্দার গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামাজ শেষ হলেই রিজিকের অনুসন্ধানে বের হতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্বরণ করবে, যাতে তোমরা সফল কাম হও"।[৯২] আল্লাহ তা'আলা রিজিকের জন্য ব্যবসা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

[৯১] সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৭৫

[৯২] সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত : ১০

"হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ"।[৯৩]

মহানবী (সা.) নিজে ব্যবসা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার কথাও জানা যায়। তিনি একবার খাদিজা (রা.) এর পণ্য সামগ্রী সমেত সিরিয়া যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন। ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকার্জনে তিনি প্রচুর উৎসাহব্যঞ্জক বাণী প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

"সত্যবাদী ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শুহাদা প্রমুখ মহান ব্যক্তির সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন"।[৯৪] মহানবী (সা.) আরও বলেন, "রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে"।[৯৫] সুতরাং বলা যায় স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যবসা বাণিজ্যের সুদূর প্রসারী ভূমিকা রয়েছে । ধন-সম্পদের সুষম আবর্তন ব্যবস্থা অর্থনেতিক ভারসাম্যহীনতার কারণ সমাজের গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকা। এর ফলে ধন-সম্পদের আবর্তন বদ্ধ হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদ বন্টনও বিস্তারণে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।[৯৬] যদ্দরুন পুঁজিপতি শ্রেণি আরও ধনবান এবং দরিদ্র শ্রেণি নিঃস্ব ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) এ অবস্থার অবসান কল্পে সমাজের সর্বস্তরের লোকের মাঝে সম্পদের সুষম আবর্তনের ব্যবস্থা করেন।[৯৭]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও"।[৯৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তন না করে"।[৯৯] মহানবী (সা.) সম্পদের সুষম আবর্তনের জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এ জন্য যাকাত, ফিতরা, উশর, মিরাসী আঈন, দান, করজে হাসান, হিবা ও ওসিয়ত ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে ভারসাম্য অর্থব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। খাস ও পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা হযরত রাসূল (সা.) এর খাস ও পতিত জমি আবাদের পদক্ষেপ স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)

---

৯৩ সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৯

৯৪ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), *সুনান তিরমিযী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., খ.৩, হাদীস নং- ১২১২, পৃ. ৪৯৬

৯৫ আলা উদ্দিন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ১২৬

৯৬ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী [অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম], *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ৮৩-৮৪

৯৭ আবুল খালেক, "বিশ্বনবী (সঃ) এর কর্মসূচীতে অর্থনীতির রূপ", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল-জুন ১৯৯৫ খ্রি. সংখ্যা।

৯৮ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৩৪

৯৯ সূরা আল হাশর, আয়াত : ৭

বলেন, "যখন হযরত রাসূল (সা.) মদীনায় পৌঁছেন তখন তিনি সেখানকার যে সকল জমিতে পানি পৌঁছাত না এবং পতিত পড়ে থাকত সেগুলো নিজ ইচ্ছামত মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন"।[১০০]

আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা.) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, "আমরা যখন মদিনায় আসি, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার এবং সা'দ ইবনু রাবী' (রা.) এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। পরে সা'দ ইবনু রাবী' বললেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক ধন-সম্পত্তির অধিকারী। আমার অর্ধেক সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি এবং আমার উভয় স্ত্রীকে দেখে যাকে তোমার পছন্দ হয়, বল আমি তাকে তোমার জন্য পরিত্যাগ করব। যখন সে ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তুমি তাকে বিবাহ করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, এ সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। বরং (আপনি বলুন) ব্যবসা বানিজ্য করার মতো কোন বাজার আছে কি? তিনি বললেন, বনু কায়নুকার বাজার আছে। পরের দিন আবদুর রাহমান (রা.) সে বাজারে গিয়ে পনির ও ঘি (খরিদ করে) নিয়ে আসলেন। এরপর ক্রমাগত (ব্যবসার উদ্যেশ্যে) যাওয়া আসা করতে থাকেন"।[১০১] এর মাধ্যমে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেন। তিনি কারো গলগ্রহ হয়ে থাকেননি।

৩.৫.৪.১. জীবিকা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ

সম্মানজনক ও আত্মতৃপ্তিমূলক জীবিকার জন্য স্বহস্তে উপার্জিত সম্পদের বিকল্প নেই। তাই ইসলাম জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে কর্মে উৎসাহিত করেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে সব সময় কর্ম ব্যস্ত থাকতেন। সাহাবায়ে কেরামকে কর্মে উৎসাহ প্রদান করতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি কাজ করার কারণে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। সে হাত দেখিয়ে তিনি বলতেন, "আল্লাহ ও তাঁর হযরত রাসূল (সা.) এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন"।[১০২] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেছেন-

طلب الرزق الحلال من أفضل الفرائض

"হালাল জীবিকা উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য"।[১০৩]

তিনি আরও এরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

"স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই"।[১০৪] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও এরশাদ করেন, "ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল জীবিকা সন্ধান"।[১০৫] হযরত রাসূল (সা.) আরও এরশাদ করেন,

---

১০০ গাজী শামছুর রহমান, "রাসূল (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় কৃষক", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৮ খ্রি. সংখ্যা, পৃ. ৪৩

১০১ *বুখারী শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, ২০০৪ খ্রি., খ. ১, হাদীস নং- ১৯২০, পৃ. ৪-৫

১০২ আহমাদ শালাবী, *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো : দারুল আরব, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ৫৩০

১০৩ আবু বকর আহমাদ ইবনু হুসাইন আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ১২

১০৪ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানু নাসাঈ*, *ঢাকা :* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ৪৪৫২, পৃ. ২৮১

১০৫ আহমাদ শালাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৫

قال سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور و عمل الرجل بيده

"সাহাবীগণ একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতে কাজের বিনিময় বা সৃষ্ট ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা"।[১০৬]

শ্রমে উৎসাহ দিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন,

أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور لان يأ خذ أحد كم حبلة فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسئله أعطاه أومنه

"তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসল আল্লাহ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা করবেন যাতে কিছু পাওয়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই"।[১০৭]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবাদাতের সাথে সাথে রিয্ক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে আরও এরশাদ করেন,

إذا صليتم الفجر فلا تنو موا عن طلب أرزقكم

"ফজরের নামাজ আদায় করার পর জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না"।[১০৮]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ব্যবসা করতেন ও বকরি চরাতেন। বস্তুত শুধু মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নন হযরত আদম (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত নূহ (আ.) সহ সকল নবী রাসূলই এ কাজ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অলস বসে না থেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের দীক্ষা প্রদান করেছেন।

৩.৬. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইসলামী পদ্ধতি

৩.৬.১. জীবন হবে কর্মমূখর

ইসলাম কর্মবিমূখতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও পরনির্ভরশীলতায় বিশ্বাস করে না বরং কর্মে বিশ্বাস করে। তাই নবী-রাসূলগণ নিজ হাতে উপার্জন করে জিবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমান যুগে চাকরি বাজারে সোনার হরিণ নামক চাকরির বড্ড অভাব। বড় বড় ডিগ্রি অর্জনের পরও যখন চাকরি না পেয়ে হতাশা ভর করে, সেখানে অনেকেই নিজে কিছু করার স্বপ্ন দেখে। প্রতিটি মানুষই অসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার জন্য এগিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে ই হবে একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এই পথে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নের এই পথে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের হতে হবে পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও একাগ্রচিত্ত। এর সাথে আরো কিছু করণীয় আছে, তবেই সফলতা আসবে। চলুন জেনে নেই কিভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়।

---

[১০৬] *মুসনাদে আহমদ*, বৈরুত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ, তা.বি., খ. ২৮, হাদীস নং- ১৭২৬৫, পৃ. ৫০২

[১০৭] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৭৭

[১০৮] মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী, *ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান*, ঢাকা : আরাফাত প্রকাশনী ১৯৮৮খ্রি., পৃ. ২৬

৩.৬.২. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিকানা

বিশ্বচরাচরে বিদ্যমান সকল প্রকার সম্পদই আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দান। মানুষের প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের সম্পদের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু কামনা করেছ তা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সমূহকে গণনা করতে চাও তাহলে তার পরিসংখ্যান করে শেষ করতে পারবে না"।[১০৯]

বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত মহাজগতের যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং তৎমধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুর মালিকানা স্বত্ব এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনিই সর্ব বিষয়ে শক্তিমান"।[১১০] তিনি আরো বলেছেন, আর মানুষ হল সম্পদ ব্যবহারে তার প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় করো"।[১১১]

কিন্তু সম্পদের উপর যখন মানুষের সাময়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তখন সে এর নিগূঢ় মালিকানা স্বত্বকে বেমালুম ভুলে যায়। নিজেকে সম্পদের প্রকৃত স্রষ্টা ভেবে আমিত্ব ও অহংবোধের মরণঘাতি এক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে সূচিত হয় সম্পদ কেন্দ্রিক যাবতীয় সামাজিক অনাচার ও অবিচার। অর্থনৈতিক এ অনাচারের প্রতিই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন। হযরত শুআইব (আ.) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বেচ্চাচারিতার বিরুদ্ধে কথা বললেন, তখন তারা বলে উঠল, "হে শোআইব! তোমার সালাত কি আমাদের পিতৃপুরুষের উপাসনা এবং আমাদের ধন-সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার বর্জন করতে তোমাকে নির্দেশ করে?"[১১২]

বস্তুত মানুষ সম্পদের প্রকৃত মালিকানা দাবি করার অধিকার রাখে না। কারণ মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। মানুষের পক্ষে শুধু উৎপাদন জনিত কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব। মূল সম্পদ সৃজনে মানুষের কোন হাত নেই। এ বিষয়টিই পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াত-প্রবচনে নানা আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১. "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?"[১১৩]

২. "(তিনিই আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর"।[১১৪]

৩. "আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর সেই পানি দ্বারা আমি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। অতএব তোমরা তা থেকে আহার কর এবং তোমাদের প্রাণীগুলোকে তাতে চারণ কর"।[১১৫]

---

১০৯ সূরা ইব্রাহীম, আয়াত : ৩৪

১১০ সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত : ১২৭

১১১ সূরা আল হাদীদ, আয়াত : ৭

১১২ সূরা হূদ, আয়াত : ৮৭

১১৩ সূরা আল-ওয়াক্বিআহ, আয়াত : ৬৩-৬৪

১১৪ সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৮০

১১৫ সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ৫৩

৪. "তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তু সমূহের মাঝে তাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছি। পরে তারা তার মালিক বনে যায়"।[১১৬]

৫. "তাদেরকে (অভাবীদেরকে) আল্লাহর ঐ সম্পদ থেকে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন"।[১১৭]

এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পদের সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ জনিত মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। মানুষকে ভোগ-ব্যয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং ইসলামী শরীয়ত পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মত মানুষকে সম্পদের একচেটিয়া এবং অবাধ মালিকানা স্বত্ব প্রদান করেনি। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মত মানুষের মালিকানা স্বত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ঘোষণা করেনি। বরং মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে বৈধ নিয়ন্ত্রণাধীকার শর্তে ভোগ-ব্যয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা লাভ করবে। সুতরাং প্রকৃত মালিকের অভিপ্রায়ের বিপরীতে সম্পদে অর্জন, ভোগ, ব্যয় সহ কোন রূপ হস্তক্ষেপ করার আইনগত অধিকার মানুষের নেই। কেবলমাত্র তাঁর দেয়া বিধি-নিষেধ অনুসারে সম্পদের আয়, ভোগ ও ব্যবহারের অধিকার মানুষের রয়েছে। সুতরাং সম্পদ ব্যবহার কালে মানুষকে ভাবতে হবে, এ সম্পদের একচ্ছত্র অধিপতি আমি নই। যাচ্ছে তাই করে এ সম্পদ ব্যবহারের অবারিত সুযোগ আমাকে দেয়া হয়নি। এ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল অধিপতির পক্ষ থেকে যে ব্যবহার বিধি প্রদান করা হয়েছে। সে বিধি মেনেই সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত সেই নীতিমালার আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে কেউ অভুক্ত ও অনাহারী থাকবে না বরং সবাই খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। আত্মনির্ভর হয়ে জীবনযাপনের সুযোগ পাবে। এটাই ইসলামী শরীয়ার নীতিগত মালিকানা দর্শন।

৩.৬.৩. বাড়ি কেনা-বেচার মধ্যস্থতা করা

বাড়ি বা জমির কেনাবেচা এই মুহূর্তে যথেষ্ট লাভ জনক ব্যবসা। প্রথমে চেনাশোনার মধ্যে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। আস্তে আস্তে যোগাযোগের পরিধি বিস্তৃত হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় বিক্রেতা যোগ্য ক্রেতা খুজে পায়না। আবার অনেক সময় ক্রেতা তার কাঙ্খিত মানের বাড়ি খুজে পায় না। এমতবস্থায় কেউ মধ্যস্থতা করে এবং চুক্তি করে পারিশ্রমিক ঠিক করে নেয়। তবে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে মিথ্যা বলে দাম বাড়ানো বা কমানো আবার কোন সমস্যা থাকলে তা গোপন করা, ধোঁকা দেওয়া কিংবা প্রতারণা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আদর্শ বিবর্জিত ইসলামে নিষিদ্ধ এ কাজটি দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش এরূপ করাও প্রতারণা যে- তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।[১১৮]

৩. মানুষকে কেনা-বেচায় ধোঁকা দিতে নিষেধ করেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। হাদিসে পাকে এসেছে, "বাজারে পৌঁছার আগেই (অল্প দামে) কেনার জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ (শলা-পরামর্শ) করবে না"।[১১৯] "পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না"।[১২০] শুধু তা-ই নয়, বেচার সময় ওজনে কম দেওয়া এবং নেওয়ার সময়

---

১১৬ সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৭১

১১৭ সূরা আন-নূর আয়াত : ৩৩

১১৮ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং ২০০৯, পৃ. ৫১-৫২

১১৯ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২০২৪, পৃ. ৫৮

১২০ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ২০০৬ খ্রি., খ.৩, হাদীস নং- ১২৭১, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮

ওজনে বেশি নেওয়া দুনিয়া ও পরকালের জন্য মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

"যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহা দিনে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জিনে আছে"।[১২১]

অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করা কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার কারণে এটি হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার হরণের শামিল। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অনেক ভয়ংকর অপরাধ। যে অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

যার হক নষ্ট করা হবে তার সঙ্গেই সমঝোতা করতে হবে। ধোঁকা-প্রতারণায় বান্দার হক নষ্ট করার যথাযথ সমাধানে ব্যর্থ হলে পরকালে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ফলে পরকালে বিচারের দিন মহান আল্লাহ ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ধোঁকা বা প্রতারণাকারীর নেকিগুলো যার সঙ্গে ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারণা করা হয়েছে তাকে দিয়ে দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়- প্রতারিত ব্যক্তির গোনাহগুলো ধোঁকাবাজ-প্রতারকের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং ধোঁকাবাজ-প্রতারক হয়ে পড়বে আমলহীন-নিঃস্ব। অবশেষে প্রতারক ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবে। তাই সৎ ও স্বচ্ছভাবে বাড়ি কেনা-বেচার মাধ্যমে উপার্জন করে যে কেউ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।

৩.৬.৪. বেচা-কেনায় দালালি করে উপার্জন করা

যাদের অর্থ সম্পদের অভাব রয়েছে অর্থাভাবের কারণে উপার্জন করে আত্মনির্ভর হতে পারছে না। কিন্তু তাদের মেধা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আছে। এ ধরনের ব্যক্তিরা ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতার নিয়তে দালালির মাধ্যমে ইসলামি শরীয়া মোতাবেক উপার্জন করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারেন। যে ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপরের মাল বিক্রি করে দেয় অথবা অপরকে মাল ক্রয় করে দেয়- তাকে আমাদের সমাজে দালাল বলে অভিহিত করা হয়। যদিও আমাদের সমাজে দালালকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় তবুও দালালরা আধুনিক কালের বিস্তৃত বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিহার্য অংশ।

শুধু এ কালেই নয়, প্রাচীনকাল থেকেই হাটে-বাজারে ছিল তাদের সরব উপস্থিতি। সময়ের স্বল্পতা, অনুপস্থিতি, মাল বা মূল্য সম্পর্কে ধারণার অপরিপক্কতা, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি কারণে মালের মালিক বা কিনতে আগ্রহী ব্যক্তি অপরকে বেচা-কেনার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হন।

ওই দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বা দালাল তার মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করে অপরের উপকার করে থাকে। আবহমানকালের মানুষের স্বাভাবিক এ প্রয়োজনকে স্বভাব ধর্ম ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিন্তু কালের আবর্তে সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগে অনান্য পেশাজীবিদের মতো দালালদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ ঘটে প্রতারণা, মিথ্যা ইত্যাদি অনৈতিক চরিত্রের। ইসলাম সব ধরনের অনৈতিকতা ও অসততাকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট এমন কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে, যেগুলো মেনে চললে-দালালদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ইতিবাচক থাকত।

---

[১২১] সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১-৭

ইসলামের দৃষ্টিতে দালাল হলো– আজিরে মুশতারিক বা সময়মুক্ত শ্রমিক। অতএব অন্যান্য শ্রমিকের মতোই দালালি করে মজুরি নেয়া জায়েজ। তবে শর্ত হলো, কত টাকা মজুরি দিতে হবে তা আগেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।[১২২] অতএব, অন্যান্য শ্রমিকের মতোই দালালি হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পারিশ্রমিক পূর্বেই নির্দিষ্ট করে নেওয়া। পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়ার দুটি পদ্ধতি। যথা-

ক. পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।
খ. দামের অংশ নির্দিষ্ট করা।

দালালের উপরোক্ত উভয় ধরনের পারিশ্রমিক হালাল। পরিষ্কার ভাষায় বিনিময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলে একটি মাল বেচা-কেনা করে দিয়ে উভয় পক্ষ থেকে দালালি গ্রহণ করাও হালাল হবে।

যদি বিনিময় অনির্দিষ্ট রেখে বেচা-কেনায় সহযোগিতার চুক্তি করা হয় তাহলে চুক্তি ও বিনিময় সবই নাজায়েজ হবে। অনুরূপভাবে গোপন দালালিও নাজায়েজ।

সাধারণত বাজারে আরেক ধরনের কৃত্রিম দালালের সন্ধান মেলে। যারা শুধুমাত্র দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আসল খরিদ্দারের সামনে খরিদ্দার সেজে দাম করে আসল খরিদ্দারকে ধোঁকা দেয়। অতঃপর বিক্রেতার থেকে উক্ত বর্ধিত অংশের কিছু অংশ গ্রহণ করে।

ইসলামে কোনো ধোঁকাবাজির সুযোগ নেই। কাউকে ধোঁকা দিয়ে উপার্জিত সম্পদ কখনো হালাল নয়। কেননা হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.) এরশাদ করেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়"।[১২৩] সর্বোপরি শঠতা পরিহার করে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সেবার মানসিকতা নিয়ে কেউ যদি দালালিতে লিপ্ত হয় ইসলাম তাকে স্বাগত জানায়।

৩.৬.৫. সৃজনশীল দক্ষতা

সবার মধ্যেই কিছু না কিছু সৃজনশীল দিক থাকেই। কেউ ভালবাসেন কবিতা লিখতে, কেউ ভালবাসেন ঘর সাজাতে, আবার কেউ ভালবাসেন ছবি তুলতে। নিজের ভিতরের সৃজনশীলতাকে অবহেলা না করে তাকে কাজে লাগাতে পারলে তার মাধ্যমেও নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করা যায়। কে বলতে পারে, হয়তো একজন ভালো ফোটোগ্রাফার বা কবি বা ইন্টেরিওর ডিজাইনার হয়ে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে নিজেকে স্বাবলম্বী করা যায়। সব কাজে সৌন্দর্যকে ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন"।[১২৪]

আল্লাহ নিজেই একজন অতি সুক্ষ্ম, নিখুত কারিগর। এই বিশ্বজগৎ, মানুষ, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত, আকাশের তারকারাজি ইত্যাদি তার সৃষ্ট সৌন্দর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি"।[১২৫]

---

[১২২] মুহাম্মাদ আমিনুসসাহীর ইবনে আবেদীন, *ফাতাওয়া শামি*, রিয়াদ : দারু আলিমীল কুতুব, ১৪১১ হি., খ. ৫, পৃ. ৩৩

[১২৩] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমীজি, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ১৯৯৫ খ্রি., খ. ৩, হাদীস নং- ১৩১৮, পৃ. ৫৮৪

[১২৪] *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০১০ খ্রি., খ. ১, হাদীস নং- ১৬৭, পৃ. ১৩৬

বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সৃজনশীল দক্ষতা রয়েছে এগুলোর সঠিক প্রয়োগ করতে পারলে জীবনে সাফল্য অর্জন করা খুবই সহজ হয়। তাই আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কোন কাজকেই ছোট করে দেখা উচিৎ নয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে কাজটি যেন ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল হয়।

৩.৬.৬. অনলাইনে চাকরি

বহু মানুষ আছেন যারা জীবনে ব্যস্ততার কারণে নিজেদের গবেষণার প্রজেক্ট লেখার সময় পান না। অনেক সময় তারা একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট খোঁজেন। এ ধরনের কাজ করে ঘরে বসে টাকা উপার্জন করা যায়। এই ধরনের বিভিন্ন সংস্থার সাইটে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলে কাজ কারে আত্মনির্ভরশীল হওয়া খুবই সহজ।

৩.৬.৭. ওয়েব ডিজাইন

এখনকার অনলাইনের কাজের ক্ষেত্রে ওয়েব ডিজাইনের চাহিদা ব্যাপক। কোনো প্রজেক্টে ২০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত সহজে আয় করা যায়। সব ব্যবসায়ী প্রযুক্তি প্রেমী নন। নিজেদের ওয়েবসাইট তৈরিতে তাঁদের ওয়েব ডিজাইনারের দরকার পড়ে। যাঁরা ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে পারে নিজেদের ওয়েবসাইট খুলে সেখান থেকেই ছোট ব্যবসা দাঁড় করাতে পারেন। ওয়েবসাইট তৈরিতে এখন কোডিং আর ওয়েব ডিজাইন দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদের জন্যও ওয়েব ডিজাইনারকে দরকার পড়ে। ফলে ডিজাইনারকে বসে থাকতে হয় না। ক্লায়েন্ট ও কাজের উপর ভিত্তি করে ওয়েব ডিজাইনারের আয় বাড়তে থাকে। তবে কাজটি যেন মার্জিত ও ইসলাম সমর্থিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে অনলাইনে বিভিন্ন বই, পোশাক ও নানা পণ্য বিক্রি হচ্ছে। যেগুলোর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। তাই আত্মনির্ভরশীলতার জন্য এটি একটি সম্ভাবনাময় খাত।

৩.৬.৮. অনলাইন সার্ভে

নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নানান সার্ভে পেপার অনলাইনে দেওয়া থাকে। সেখানে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হয়। অনলাইনে যাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তারা খুব সহজে এধরনের কাজে অংশ গ্রহন করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারেন। অনলাইন সার্চ ও পণ্যের পর্যালোচনা লিখে আয় করা যায়। তবে, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংকিং তথ্য দেওয়া লাগতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে কাজ করার সময় সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে কাজের সময় কোনটি প্রকৃত কাজ আর কোনটি প্রতারণা (Scam) তা যাচাই-বাছাই করে নিয়ে কাজ করতে হবে। আল্লাহ ভালো কাজে সহযোগিতা আর খারাপ ও পাপের কাজে বাঁধা দিতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না"।[১২৬]

৩.৬.৮.১. মেকানিক্যাল

বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে প্রতিটি ঘরে টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল, মাইক্রোওয়েভ থেকে শুরু করে নানা ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোনও মেশিন মেরামত করা শিখে এই ধরনের মেরামতির কাজও কিন্তু আজকের দিনে যথেষ্ট লাভজনক ও উপার্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

---

[১২৫] সূরা আল মূলক, আয়াত : ৫

[১২৬] সূরা আ মায়েদা, আয়াত : ২

এ কাজের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা যায়। অভিজ্ঞতা থাকলে তেমন পুঁজিও দরকার হয় না।

৩.৬.৮.২. ফ্রিলান্সার পেশার মাধ্যমে উপার্জন

ফ্রিল্যান্সিং বর্তমানে বেশ আলোচিত উপার্জনের মাধ্যম। কেননা আমাদের দেশে দিনে দিনে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং শব্দ দুটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করছে ।

বাংলাদেশের ছয় লক্ষ তরুণ তরুণী ফ্রিল্যান্স-মার্কেট প্লেসে জব করছেন। ফ্রিল্যান্সিংকে বলা হয় মুক্ত পেশা। কেননা এখানে একজন ফ্রিল্যান্সার কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিনস্ত থাকে না। সে যে কোনো ফ্রিল্যান্স-মার্কেটপ্লেসে, যে কোনো সময়, তার সার্ভিসকে সেল করার সুযোগ পেয়ে থাকে। চাই তার বায়ার দেশের হোক বা বিদেশের। একজন হোক বা একাধিক। এভাবে প্রতিদিন তার জন্য কাজ করাও আবশ্যিক নয়। সপ্তাহে যে দিন ইচ্ছা সে দিন কাজ করতে পারে। আবার যে দিন মন চায় সে দিন কাজ বন্ধও রাখতে পারে। তাই এই কাজটিকে বলা হয় ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্ত পেশা। মূলত ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে ইনকাম করার মাধ্যম। যার উপর মূলত ফ্রিল্যান্সিং হালাল বা হারাম হওয়া নির্ভর করে।

এই কাজগুলো মৌলিকভাবে হারাম নয়, তাই তা করে দিয়ে ইনকাম করতে ইসলাম নিষেধ করে না। বরং নিজের শ্রম দিয়ে ইনকাম করাকে ইসলাম প্রশংসার চোখে দেখে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার নাম হচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং। এ জগতে হাজার হাজার কাজ আছে। সেগুলো থেকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে হালাল কর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হলে নিঃসন্দেহে তা হালাল। হযরত রাসূল (সা.) বলেন:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন"।[১২৭] তবে সর্বদা হালাল-হারামের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে এবং হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। হযরত রাসূল (সা.) বলেন:

إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ

"অবশ্যই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুটির মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহপূর্ণ বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দেহপূর্ণ বিষয় সমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করবে এবং যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হবে সে হারামে পতিত হবে"।[১২৮] মোটকথা, কাজের উপর নির্ভর করে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা কখনো বৈধ আবার কখনো অবৈধ।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি আপনি এমন কাজ করেন যেটা মূলত শরিয়তে হালাল-যাতে হারামের সংস্পর্শ নাই তাহলে তা হালাল এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থও হালাল আর যদি কাজটা হারাম হয় তাহলে তা করা হারাম এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থও হারাম।

---

[১২৭] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৪২, পৃ. ১৭

[১২৮] প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ৫০, পৃ. ৪০

৩.৬.৮.৩. ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের শর্তাবলী

কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ফ্রিল্যান্সিং করা এবং তার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা বৈধ। যথা-

১. ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি হালাল হওয়া (হারাম না হওয়া)।
২. দেশের প্রচলিত আইন পরিপন্থী না হওয়া।
৩. মানুষ, সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতিকারক না হওয়া।
১. কারো অধিকার খর্ব না করা। (যেমন: কপিরাইট লঙ্ঘন করা)।
৪. আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ, ঘুস বা দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়া।
৫. মিথ্যা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া ইত্যাদি।

যদিও এগুলো অনলাইন-অফলাইন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অনলাইনে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতারণা ও অন্যায়-অপকর্মের সুযোগ বেশি থাকে।

৩.৬.৯. হোম ডেলিভারি

বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক অনলাইন মার্কেট তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালিত করছে। তাদের পণ্য ভোক্তার কাছে পৌছে দেয়ার জন্য ডেলিভারিম্যান নিয়োগ দিচ্ছে। এই খাতে অগণিত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। অসহায়, বেকার ও স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য এটি একটি সম্ভাবনাময় খাত। ক্রেতারা অর্ডার দিচ্ছেন অনলাইনে, ই-মেইলে কিংবা ফোনে, পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। একজন ক্রেতার কাছে ব্যাপারটা খুবই উপভোগ্য। এতে তাঁর কষ্ট কমছে, ঘরে বসেই বুঝে নিচ্ছেন অর্ডার করা পণ্য। পণ্য হাতে পেলেই টাকা (পেমেন্ট) দিচ্ছেন। কেনাবেচার আধুনিক সুবিধা এখন এমনই। এটাই হোম ডেলিভারি নামে পরিচিত। এভাবে এখন সবই কেনা যায়। জামা-কাপড়, খাবার, বই, তরকারি, গৃহস্থালির পণ্য ইত্যাদি। এসব কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন অনেকে। যাদের সবাই-ই প্রায় বয়সে তরুণ। খণ্ডকালীন, পূর্ণকালীন-দুভাবেই এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায়, এমনকি পড়ালেখা শেষ করেও এ কাজে জড়াচ্ছেন অনেকে। ভালো বেতনকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা আর স্বাধীন কর্মপরিবেশ পাওয়ায় তরুণদের আগ্রহের শীর্ষে আছে হোম ডেলিভারির কাজ।

এ ধরনের কাজে নম্র, কর্মঠ ও বিনয়ীদেরই সুযোগ বেশি। অভিজ্ঞতা না থাকলেও এ কাজ করা যায়। কাজে নামার আগে সব নতুন কর্মীর জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এতেই তাঁরা দক্ষ হয়ে ওঠেন। কাজের আঙ্গিক, ধরন ও বিষয় সম্পর্কে বুঝতে পারেন। তাঁদের প্রত্যেককেই প্রতিষ্ঠান থেকে মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল দেওয়া হয়। এ জন্য অবশ্যই তাঁদের মোটরসাইকেল চালনায় দক্ষ এবং ব্যক্তিগত ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। নারী পুরুষ যে-ই হোন, সবাই-ই সমান সুযোগ নিয়ে শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন। নির্দিষ্ট বেতনের পাশাপাশি বিশেষ ছুটি ও ভাতার ব্যবস্থাও আছে তাদের জন্য।

হোম ডেলিভারির কাজে সর্বনিম্ন যোগ্যতা হিসেবে সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পাসের স্বীকৃতি লাগে। তবে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্নাতক পাস চাওয়া হয়। ছাত্রাবস্থায়ও এ কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে অফিস ব্যবস্থাপনা, হেল্পলাইন, অনলাইন মিডিয়া এবং পণ্য ব্যবস্থাপনায় রয়েছে নানা পদে কাজের সুযোগ।

অনেকে হোম ডেলিভারির কাজটাকে ছোট করে দেখেন। মনে রাখতে হবে সব কাজই সমান। আগ্রহটাই বড় কথা, পাশাপাশি প্রয়োজন সাবলীল বাচনভঙ্গি। তবেই এ কাজে ভালো করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা থাকতে হবে। হোম ডেলিভারির কাজে পারিশ্রমিকও সন্তোষজনক।

হোম ডেলিভারি করে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম স্বপ্ন, কেএফসি, চালডাল ডটকম, রকমারি ডটকম, পিৎজা হাট, ই-কুরিয়ার লিমিটেড ইত্যাদি। এর সবই প্রায় অনলাইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। হোম ডেলিভারি ব্যবস্থায় পণ্য হস্তান্তরের আগে সেটি সংরক্ষণের সব দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের। ফলে এ কাজে আস্থার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যাদের এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে তারা হোম ডেলিভারির ব্যবসাও পরিচালনা করতে পারেন। এতে লাভ তো হবেই, পাশাপাশি এর মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারেন।

৩.৬.১০. পেশা হিসেবে শিক্ষকতা

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন মানব জাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ যে আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন তা হলো কুরআনুল কারীম। এই কিতাব মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক। মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা পেতে হলে কুরআন পাঠ করতে হবে। তাই আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন এই কিতাবের প্রথম বাণী 'ইক্বরা' অর্থাৎ আপনি পড়ুন[১২৯] অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে এই কিতাব অনুযায়ি জীবনযাপন করতে হলে এই কিতাব পাঠ করার কোন বিকল্প নাই। আর আল কুরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেছেন, إنما بُعثت معلّمًا "নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"।[১৩০] হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানব জাতির মহান শিক্ষক তিনি মানব জাতিকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামে শিক্ষকতা পেশাকে সর্বাধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়"।[১৩১] সভ্যতার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। কোনো জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার আলোয় মানুষ অন্ধকারকে জয় করে। অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পায়। মুক্তির পথের দিশা খুঁজে পায়। আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, হেদায়েত-গোমরাহি, নীতি নৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পরখ করার অন্যতম মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানব প্রাণের লুক্কায়িত পশুত্বকে অবদমিত করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষকে মানবীক ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী করে তোলে। শিক্ষা মানব জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়। মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষা ও শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে শিক্ষাকে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামই সর্বপ্রথম মূর্খতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত"।[১৩২] মানব জাতির মানবতাবোধ জাগ্রত করা, মানবতা শিক্ষা দেওয়া,

---

১২৯ সূরা আ'লাক, আয়াত : ১

১৩০ আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ, ঢাকা :* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., হাদীস নং- ২২৯, পৃ. ১২২

১৩১ *বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৪৬৫৭, পৃ. ৩৬০

১৩২ সূরা আল জুমু'আ, আয়াত : ২

সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী করে গড়ে তোলা, আয় উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনই কুরআন নাযিল করে মানব জাতিকে পথ প্রদর্শণের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

"আমি যেমন পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না" ।[১৩৩]

ইসলাম সব অধিকার ও কর্তব্য চাপিয়ে শিক্ষাকে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য ও অধিকার বলে ঘোষণা করেছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ইসলাম ধর্মের প্রথম আহ্বান এমন পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।[১৩৪] এ সকল কুরআনের আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকে ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। মানুষের উপর আল্লাহর যত নিয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে, শিক্ষার নিয়ামতকে পবিত্র কুরআনে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে" ।[১৩৫]

এখানে মানব সৃষ্টির বিষয়টির ওপরে শিক্ষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরো সৃষ্টিজগত, এমনকি ফেরেশতাদেরও পেছনে ফেলে মানুষ যে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হয়েছে, তার মূলেও রয়েছে শিক্ষা। ফেরেশতাদের উপর আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব এরই মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "আর তিনি আদমকে বস্তু জগতের যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দিলেন" ।[১৩৬] পড়া আর লেখার সমন্বয়ই শিক্ষা। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের। তাই আল্লাহ মানুষকে শেখানোর জন্য আসমানি কিতাব ও তার শিক্ষক হিসেবে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আর মহান শিক্ষক মহানবী (সা.) এসে ঘোষণা করলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ" ।[১৩৭]

ইসলামের সূচনা থেকেই মহানবী (সা.) মানব জাতির মহান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ইসলামী শিক্ষার নিয়মনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি নবুয়ত লাভের পর কাবাকে প্রথম শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহার করেন। পরে তিনি মক্কা নগরীর ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়িতে দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মহানবী (সা.) নিজেই এখানে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) সহ নব দীক্ষিত সাহাবীদের ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। মদিনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। নবী কারীম (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই মদিনা এবং

---

১৩৩ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ১৫১

১৩৪ সুরা আলাক, আয়াত : ১-৫

১৩৫ সুরা আর-রাহমান, আয়াত : ১-৪

১৩৬ সুরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ৩১

১৩৭ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২৪, পৃ. ১২০

তৎসংলগ্ন এলাকায় ৯টি মসজিদ তৈরি হয়। এসব মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতিসত্তা। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা কেবল উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণও শিক্ষা।

মহানবী (সা.) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন তাঁর মহান শিক্ষার মাধ্যমে। হযরত ওমর (রা.) ও হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.) তাদের শাসনামলে এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন, হযরত ইবনুল জাউজি (রহ.) তাঁর গ্রন্থ সিরাতুল উমরাইনের মধ্যে উল্লেখ করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.), হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর যুগে মুয়াজ্জিন, ইমাম ও শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়া হতো।[১৩৮] এ জন্য শিক্ষকদের সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। একই সঙ্গে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ করাও সরকারের দায়িত্ব। শিক্ষকতা সম্মানজনক পেশা। এর উদ্দেশ্য কিছুতেই বিত্তবৈভবের মালিক হওয়া নয়। শিক্ষা কোনো বাণিজ্যিক পণ্য নয়, নয় ব্যবসায়ের সমান। তবে জীবন-জীবিকার অপরিহার্য বাস্তবতায় তাঁদেরও প্রয়োজন হয় অর্থকড়ির। সেই বাস্তবতা মেনে নিয়ে তাঁদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষকদের সঠিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করা ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব। তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে। তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারবে। ফলে দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি হবে তরান্বিত। তাই বলা হয় শিক্ষকতা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশা।

৩.৬.১০.১. গৃহ শিক্ষকতা

আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী আছে যারা শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মক্ষেত্রের অপেক্ষায় থাকে তারা টাকা রোজগারের জন্য গৃহশিক্ষকতার পেশা বেছে নিয়ে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে পুঁজি বিহিন এ পেশা গ্রহণ করে কর্মক্ষেত্র খোজার পাশাপাশি উপার্জনের মাধ্যমে নিজেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারে। নিজের যোগ্যতা বুঝে এবং পছন্দের বিষয় বেছে নিয়ে সহজেই গৃহ শিক্ষকতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন। কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা থাকলে, তবে অনলাইনে সে বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। অনলাইন টিউটরদের এখন চাহিদা বাড়ছে। এখানে অন্য দেশের শিক্ষার্থীদেরও পড়ানোর সুযোগ রয়েছে। অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনলাইন টিউশনির সুযোগ রয়েছে। সেখানে সুবিধামতো সময়ে ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো যায়। এসব সাইটে নিজের দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়। একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে ওয়েবিনার পরিচালক হিসেবে অনলাইন সেশন পরিচালনা করে দক্ষতা বাড়লে এ ক্ষেত্র থেকে অনেক আয় করার সুযোগ আছে।

৩.৬.১১. গবেষণায় সাহায্য

শিক্ষা ও গবেষণা একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান চালিকা শক্তি। গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য, নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে ফলে দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে দূর্বার গতিতে। মানুষের কর্মসংস্থান

---

[১৩৮] আবূ উবাইদ আল-কসেম ইবনে সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, ইসলামাবাদ : ইদারাহ তাহকিকাতে ইসলামী, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১৬৫

বাড়ছে, মানুষ আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। উন্নয়নের স্বার্থে এই ধারা অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন মানব জাতিকে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে বার বার তাকিদ করেছেন। এভাবেই আল কুরআনে গবেষণা ও চিন্তার চর্চার কথা বলা হয়েছে। ভাবনা, উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন,

পবিত্র কুরআনে ১০০ এরও বেশি আয়াতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে, শোনে, মনোযোগ দেয়, তুলনা করে বা পরিমাপ করে, ভাবে, বুদ্ধি ও বিবেকের চর্চা করে এবং বিচার-বিবেচনা করে। সর্বোপরি মেধাকে যেন কাজে লাগায়। বহু আয়াতের শেষাংশে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছেঃ তোমরা কি চিন্তা করে দেখছো না? তোমরা কি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?

এভাবে জিজ্ঞাসা করার পাশাপাশি বহু জায়গায় বিশ্বের বিচিত্র অজানা রহস্য নিয়ে ভাবতে, গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি যারা চিন্তাশক্তি, মেধা ও মননকে কাজে লাগায় না তাদের অন্ধ, বধির এমনকি চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে তিরস্কার করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, "তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না, যাতে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে! বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে তাদের হৃদয়"।[১৩৯]

আল্লাহ তা'আলা গবেষণা করার বিষয়বস্তুও স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন, "তবে কি তারা লক্ষ্য করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে এবং পাহাড় সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে প্রথিত করা হয়েছে এবং ভূমির প্রতি, কিভাবে তা বিছানো হয়েছে"।[১৪০]

এতকিছুর পরও যারা বিবেক-বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের অকর্মণ্য, উপলব্ধিহীন, অসচেতন প্রাণী বলে তিরস্কার করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না"।[১৪১]

কুরআনের নির্দেশনা অমান্য করে যারা চিন্তা, গবেষণা না করে বসে থাকে, যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার হাকিকত উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না, কুরআন তাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত করেছে। কারণ, মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের পার্থক্য রেখা যে চিন্তা শক্তি তা না থাকলে মানবীয় মর্যাদাই তো বিলীন হয়ে যায়।

এ জন্য কুরআন মানুষের চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধক বিষয়গুলোও নিষিদ্ধ করেছে। পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ, গোঁড়ামি, কূপমন্ডুকতা পরিহার করে ইসলামের উদার চিন্তা দর্শনের চর্চা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষ জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা, নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ছাড়া একঘেয়ে হয়ে যায়। জীবনে তাদের কোনরকম উন্নতি কিংবা পরিবর্তন আসে না। আর এই পরিস্থিতিতে অপরাপর সৃষ্টির সঙ্গে মানুষকে আলাদা ভাববার সুযোগ থাকে না।

---

১৩৯ সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ৪৬

১৪০ সূরা আল গাশিয়া, আয়াত ১৭-২০

১৪১ সূরা আনফাল, আয়াত : ২১-২২

অতএব, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য সৃষ্টির পার্থক্য হল, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে। মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পারঙ্গম। যারা সত্যের জন্য বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায় না, কোনোরূপ চিন্তা করে না, গবেষণা করে না তাদের কুরআনে মূক, বধির, অন্ধ ইত্যাদি অভিধায় তিরস্কৃত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[১৪২]

যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধের প্রতি ইসলাম দিয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। দিয়েছে যথাযথ মর্যাদা। কুরআনের বহু আয়াতে আছে এর বর্ণনা। পবিত্র কালামে পাকের অমোঘ ঘোষণা,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ সবকিছু তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সব পবিত্রতা একমাত্র তোমারই। আমাদের তুমি দোজখের শাস্তি হতে বাঁচাও"।[১৪৩] আয়াতে কারীমা স্পষ্ট করছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ ও সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার কারণেই অন্যান্য সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব মহাগ্রন্থ আল কুরআন চিন্তা ও গবেষণায় বিবেকবোধকে কার্যকর করার পয়গাম দিয়েছে। অনুভব ও উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে বলেছে। এই গবেষণা যারা করবে তাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। যেমন, লেখার কাজে, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজে, বই-পুস্তক সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা সহ বিভিন্ন কাজে এক বা একাধিক লোকজনের প্রয়োজন হয়। যিনি এই কাজে সহযোগিতা করবেন তাকে এ জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হয়। এর মাধ্যমেও গড়ে ওঠে কর্মসংস্থান। যার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়।

তাই গবেষণা ও চিন্তাচর্চা ছাড়া ইহ বা পরকাল কোথাও সফলতার আশা করা যায় না। চিন্তার মুক্তি মানুষের সফলতার প্রধান অবলম্বন। গবেষণা ও চিন্তাশীলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো জাতি সমৃদ্ধ হতে পারেনি। চিন্তাগবেষণার কল্যাণে পৃথিবী আজ এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। ইহলৌকিক পারলৌকিক সব দৃষ্টিতেই চিন্তাচর্চার বিকল্প নেই। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের জন্য এই ধরনের কাজ আদর্শ। এতে এক দিকে যেমন জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে, তেমনই উপার্জনও হবে। গবেষণার ফল হিসেবে ফল, ফসল সহ নানাবিধ উন্নতি হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে। ফলে বিশ্বময় এ খাতটি আত্মনির্ভরশীলতার জন্য একটি অন্যতম উদাহরণ হয়ে আছে।

৩.৬.১২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন

প্রকৃতি আল্লাহর দান, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব। পরিবেশ ও প্রতিবেশের অন্যতম নিয়ামক হলো উদ্ভিদ ও গাছপালা। গাছগাছালি, বৃক্ষতরু ও লতাগুল্ম থেকেই আসে আমাদের জীবনধারণ ও জীবন রক্ষার সব উপকরণ। প্রিয় নবীজি (সা.) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরামকে গাছ লাগাতে ও বাগান করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক বনায়নও করেছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বৃক্ষরোপণকে সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

[১৪২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪

[১৪৩] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৯০-১৯১

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে"।[১৪৪]

বন ও বন্য পশুপাখি আল্লাহ পাকের দান ও প্রাকৃতিক নেয়ামত। হযরত নবী কারীম (সা.) এগুলোর সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারার বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন। ওই এলাকায় গাছপালা কাটা এবং সেখানে পশুপাখি শিকার করা আজও নিষিদ্ধ।

বৃক্ষলতা না থাকলে এ জগতে মানুষের বসবাস অসম্ভব হতো। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কুরআন মাজীদে বলেন, "তিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি তার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অঙ্কুর বের করি, অনন্তর তা থেকে সবুজ পত্র উদ্‌গত করি, তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খর্জুরবৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি আর আঙুর, জলপাই-জইতুন ও ডালিমের বাগান সৃষ্টি করি। এগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। লক্ষ করো এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্বতা প্রাপ্তির প্রতিও লক্ষ করো। অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে"।[১৪৫] অন্যত্র আরো বলেছেন, "তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাকো। তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে জন্মান শস্য, জয়তুন, খেজুরগাছ, আঙুর ও বিভিন্ন ধরনের ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।[১৪৬]

আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিকে মানুষের জন্য জীবনধারণের অনুকূল, বাসযোগ্য, সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা ও উদ্ভিদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষার অন্যতম প্রভাবক হলো উদ্ভিদ। বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য, গাছপালা মাটিতে পানি সংরক্ষণে সাহায্য করে এবং বন-বনানী থাকলে সেখানে বৃষ্টিপাত হয়। পানি ও উদ্ভিদ জীবন চক্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনিই আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তা স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তা পৌঁছান, তখন তারা আনন্দিত হয়"।[১৪৭]

মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ আগুন। আগুনের অন্যতম উৎস বৃক্ষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করে দিয়েছেন, সে মতে তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিতে পারো"।[১৪৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, তা লক্ষ্য করে দেখছ কি? তোমরাই কি অগ্নি উৎপাদন বৃক্ষ সৃষ্টি করো, না আমি? আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র"।[১৪৯]

---

১৪৪ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২১৬৯, পৃ. ১৬৫

১৪৫ সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত : ৯৯

১৪৬ সুরা আন নাহল, আয়াত : ১০-১১

১৪৭ সুরা আর-রূম, আয়াত : ৪৮

১৪৮ সুরা ইয়াসীন, আয়াত : ৮০

১৪৯ আল-ওয়াক্বিআহ, আয়াত : ৭১-৭৩

উদ্ভিদ ও বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য পাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিচূর্ণ করি এবং আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাকসবজি, যায়তূন, খেজুর এবং বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল ও গবাদিপশুর খাদ্য, এটা তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জীবনধারণের জন্য"।[১৫০] আল্লাহ আরো বলেছেন, "তারা কি লক্ষ করে না, আমি ঊষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরা আহার করে। তারা কি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবে না?"[১৫১]

গাছের প্রতিটি পাতা আল্লাহর জিকির করে। সেই জিকিরের সওয়াব রোপণকারীর আমলনামায় লেখা হয়। তাই আমাদের বেশি করে বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন করা উচিত। গাছ লাগাতে হবে, গাছের পরিচর্যা করতে হবে এবং অকারণে বৃক্ষনিধন বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে একটি পরিপক্ব গাছ কাটার আগে তিনটি চারা গাছ লাগাতে হবে। ফল জাতীয় গাছ-পালা রোপন করলে উৎপাদিত ফল বিক্রি করে প্রচুর পরিমানে অর্থ উপার্জন করা যায়। এ ছাড়াও ফার্নিচার, কাঠের আসবাব পত্র তৈরির গাছ রোপন করে প্রয়োজনে সে গাছ বিক্রি করে আর্থিক সমস্যা লাঘব করা যায়। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে অর্থের যোগান দেওয়া যায়। তাই বৃক্ষরোপন ও সবুজ বনায়ন আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আত্মনির্ভরশীলতার জন্য বিভিন্ন ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছ রোপন করে বিপুল পরিমানে অর্থ উপার্জন করার অসংখ্য নজীর আমাদের দেশেই রয়েছে। গাছ রোপন, পরিচর্যা এবং ফল সংগ্রহ ও বিক্রির কাজে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। হযরত সালমান ফারেসী (রা.) একটি বাগানে কাজ করতেন, তাকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) তার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি স্বাধীন জীবন লাভ ও আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল।

৩.৬.১৩. কর্মসংস্থান হিসেবে পশুপালন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের ঘরে ঘরে যেসব গৃহপালিত প্রাণি সম্পদ ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে গরু, ছাগল, মেষ, ভেড়া অন্যতম। একসময় এ দেশের গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে এ সব পশু প্রতিপালিত হতো। গৃহ পালিত পশু পালন অত্যন্ত লাভ জনক একটি পেশা। এগুলো প্রতিপালনের মাধ্যমে খুব সহজে দেশের বেকার জনগোষ্ঠী আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সক্ষম হতে পারে। অল্প মূলধন ও অল্প জায়গায় ছাগল, ভেড়া পালন করা যায়। ছাগলকে বলা হয় গরিবের গাভী। প্রথমে দু-চারটি পশু নিয়েই এর ফার্ম শুরু করা যায়। তবে সফলভাবে লালন পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহন করা জরুরী তা নাহলে লাভের পরিবর্তে লোকসানের ঝুকি বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারিভাবে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এখন খুব সহজলভ্য। এছাড়াও রয়েছে পশু মোটাতাজা করণ প্রকল্প যার মাধ্যমেও অল্প সময়ে প্রচুর পরিমানে অর্থ উপার্জন করা যায়। এর মাধ্যমে পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এর মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়। ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। বাজারে গরুর মাংসের চেয়ে ছাগলের মাংসের মূল্যও বেশি। ছাগলের বংশ খুবই তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। ছাগী ১০ থেকে ১২ মাস বয়সে গর্ভধারণ করে। একটি ছাগী গড়ে বছরে দুই বারে চার থেকে ছয়টি বাচ্চা দেয়। ছাগলের রোগ হয় না বললেই চলে। ফলে এতে ঝামেলা খুব কম। ছাগলের বিষ্ঠা জমির একটি উৎকৃষ্ট জৈবসার। একটি ছাগলের বিষ্ঠা থেকে বছরে গড়ে ২০০ কেজি জৈবসার পাওয়া যায়। এ ছাড়া গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নিরসনে ছাগল পালন কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

---

[১৫০] সুরা আবাসা, আয়াত : ২৪-৩২

[১৫১] সূরা আস-সাজদা, আয়াত : ২৭

অধিক হারে ছাগল পালনে পর্যাপ্ত দুধ উৎপন্ন হলে বিদেশ থেকে শিশুখাদ্য হিসেবে দুধের আমদানি হ্রাস পাবে। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। তা ছাড়া এ দেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল খ্যাত ছাগলের চামড়ার বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ফলে এর চামড়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দুধমা হালিমার ঘরে অবস্থান কালে দুধ ভাইদের সঙ্গে ছাগল চরাতেন। অনুরূপভাবে তিনি যৌবনেও ছাগল চরিয়েছেন। এ সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন-

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْه'' فَإِنَّه'' أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاهَا

"জাহরান নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহর সঙ্গে ছিলাম। আমি সেখানে পিলু ফল ছিঁড়ছিলাম। তিনি দেখে বললেন, কালো কালো দেখে ছিঁড়, এগুলো সুস্বাদু হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি কি ছাগল চরাতেন (যে কারণে আপনি এটা জেনেছেন)? তিনি বললেন হ্যাঁ, এমন কোনো নবী নেই, যিনি ছাগল চরাতেন না"।[১৫২]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিসে বর্ণিত আছে, "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এমন কোনো নবী নেই যিনি ছাগল চরাতেন না। সাহাবিরা আরজ করলেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি"।[১৫৩]

অর্থনৈতিক সংকট দূর করে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য বাড়িতে ছাগল-ভেঁড়া পালন খুব সহজ কাজ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উম্মে হানী (রা.) কে বলেছিলেন,

الإِبِلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"উট তার মালিকের জন্য গৌরবের ধন, ছাগল-ভেড়া হলো বরকতপূর্ণ সম্পত্তি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ যুক্ত রয়েছে"।[১৫৪]

নবী কারীম (সা.) ছাগলের দুধ ও মাংস খেতেন। মাংসের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন ছাগলের সামনের রানের মাংস। ছাগল পালন মানুষের একটি আদি পেশা। এর সঙ্গে নবী-রাসূলরাও যুক্ত ছিলেন। কাজেই গবাদি পশু পালন করাকে হেয় বা ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ

"আর নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তার পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর"।[১৫৫]

---

১৫৩ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২১১৯, পৃ. ১১২

১৫৪ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ২৩০৫, পৃ. ৩৩৫

১৫৫ সূরা আন-নাহ্‌ল, আয়াত : ৬৬

এখানে আয়াতে এটা বলা হচ্ছে না যে গোবর থেকে দুধ বের হয়। বরং দেহাভ্যন্তরের এক বিশেষ প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে খাদ্যসার থেকে গোবর আলাদা হয় ও দুধ পাওয়া যায়। আর এর বাহক হচ্ছে রক্ত।

বাংলাদেশে অনেক এলাকায় পতিত ভূমি রয়েছে যেখানে খুব সহজে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পালন খুব সহজলভ্য। তাছাড়া এগুলোর ফার্ম করে পালন করে দুধ, বাচ্চা বিক্রি করে প্রচুর পরিমানে অর্থ উপার্জন করা যায় যা বর্তমানে আমাদের দেশে একটি লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। গরু, মহিষের গোবর একটি উত্তম জৈব সার। কৃষি কাজে দিন দিন তার ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুর চামড়া, হাড় দিয়ে নানা রকমের পণ্য উৎপাদিত হয়। সে জন্য পশুর গোস্ত, চামড়া, হাড্ডি সবই ব্যবহার উপযোগী। বর্তমানে গরুর গোবর ব্যবহার করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। তাই এগুলোও সংরক্ষণ করে বিক্রি করার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় এবং এর মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা যায়।

বাংলাদেশের অর্ধেক জনশক্তিই হচ্ছে নারী কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নারীরা এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। এই সকল সমস্যার সমাধান করে নারী শক্তির যথার্থ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পারিবারিক খামারের বিকল্প আর কি হতে পারে। প্রথমত মহিলাদেরকে বাড়ির বাইরে যেয়ে কাজ করতে হচ্ছে না। তাছাড়া বাড়িতে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি খামারে সময় দিতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের নারীরা এই সকল কাজে বেশ পারদর্শীও বটে। সুতরাং, পারিবারিক খামার স্থাপন হলে বাংলাদেশের নারী শক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার সম্ভব হবে। তাছাড়া, এর দ্বারা নারীরা স্বাবলম্বীও হতে পারে খুব সহজে।

বাংলাদেশের সকল কর্মক্ষেত্র নারীবান্ধব নয়, গ্রামাঞ্চলে নারী কর্মসংস্থানের অভাব। তাই তাদেরকেও এই পেশায় সংযুক্ত করা গেলে তারাও উপার্জন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

পারিবারিক খামারের ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ বেশি থাকে। কারণ, বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করতে হলে প্রথম থেকে সব কিছু শুরু করতে হয়। বাণিজ্যিক খামার দেখাশুনার জন্য আলাদা লোক প্রয়োজন হয়। যার ফলে খামারের ব্যয় বেড়ে যায়। তবে এর সুফলও আছে তাহল অন্যান্য মানুষের কর্মক্ষেত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া পারিবারিক খামারে খুব বেশি মুনাফার প্রয়োজন হয় না।

৩.৬.১৩.১. ইসলামের দৃষ্টিতে পাখি পালন

মানুষ মাত্রই বিনোদন প্রিয়। মানুষ মাত্রই বন্ধু প্রিয়। মানুষ মাত্রই সঙ্গ প্রিয়। তাই মানুষ নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ অনুযায়ী বিনোদন লাভের চেষ্টা করে। এবং নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য কিংবা অবসর সময়টা আত্মতৃপ্তির সাথে অতিবাহিত করার জন্য সঙ্গীর সহায়তা নেয়। এই সঙ্গী হতে পারে অন্য কোন মানুষ কিংবা কোন প্রাণী।

স্বজাতী মানুষের বাইরেও মাছ, গাছ, পশু, পাখি প্রভৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তবে বহুকাল আগে থেকেই মানুষ তার সঙ্গী হিসেবে রিফ্রেশমেন্টের জন্য বিভিন্ন পশু ও পাখি পুষে আসছে। শুধুমাত্র মুসলিম নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের মাঝেও এই শখ আছে বলে আমরা ইতিহাস হতে জানতে পাই। আমরা যারা গ্রামে থাকার সৌভাগ্য পেয়েছি তারা দেখেছি মানুষ শখে হাস-মুরগী-কবুতর জাতীয় পাখি পালন করে থাকে। এই শখ মূলতঃ বিনোদন থেকে আসেনি। বরং অবসর সময়টা যেন বাড়ীর মহিলাদের কোয়ালিটি টাইম হয় সে ধারণা থেকেই এসব পালন করা। এগুলো পেলে পুষে তাদের সময় যেমন কাটে তেমনি ডিম বাচ্চা থেকে দু পয়সা ইনকামও হয় হাত খরচের জন্য। তবে বাংলার শহুরে সংস্কৃতিতে অনেককেই কথা বলা ময়না, টিয়া, শালিক, কবুতর সহ নানা ধরনের পাখি স্রেফ শখের বসে

পুষতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ বানিজ্যিকভাবে বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় পাখির খামার করে অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন পাখি পালন সংগঠনের ফেসবুক গ্রুপ, ওয়ার্কশপ ও সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর পজেটিভ ইম্প্যাক্ট হিসেবে ইয়ং জেনারেশন এবং তরুণদের অনেকেই পাখি পালন শখ হিসেবে বেছে নিয়েছে। অনেক মানসিক ফ্রাস্টেশনে ভোগা লোক আছে যারা পাখি পুষতে শুরু করার পর আজেবাজে নেশা ও আড্ডাবাজি থেকে ফিরে এসে কোয়ালিটি টাইম পাস করতে সক্ষম হচ্ছে। ইসলাম মানুষকে সঙ্গীহীন নিরস জীবন কাটাতে বলেনি। অর্থাৎ বৈধ শখ থাকা এবং তা বৈধ উপায়ে মেটানোকে ইসলাম সমর্থন করেছে।

আমরা আল কুরআনে দেখতে পাই হযরত সুলায়মান (আ.) এর পোষা পাখি ছিল। যার নাম ছিল হুদহুদ। কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "হযরত সুলায়মান পক্ষীকুলের খোঁজ-খবর নিল। অতঃপর বলল, কি হল হুদহুদকে দেখছি না যে? না-কি সে অনুপস্থিত"।[১৫৬] আর বিখ্যাত সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু সাখর-কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বিড়ালের ছানা পালার কারণে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) (বিড়াল ছানার বাপ) এর নামকরণ করেছেন। হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট আসতেন, আর আমার একটা ছোট ভাই ছিল-যার কুনিয়াত (ডাক নাম বা উপনাম) ছিল আবূ উমায়র। তার ছোট একটা পাখী ছিল, যা নিয়ে সে খেলা করতো। হঠাৎ পাখিটি মারা যায়। তখন নাবী (সা.) একদিন তার কাছে এসে তাকে বিমর্ষ দেখে বলেন- তার কি হয়েছে? লোকেরা জবাব দেয়- তার চড়ুই/পাপিয়া পাখিটি মারা গেছে। তখন তিনি (ওর মন ভালো করার জন্য ছন্দে ছন্দে) বলেন, "ইয়া আবা উমায়র মা ফাআলান নূগায়র!"[১৫৭] অর্থ হে আবূ উমায়র! কেমন আছে তোমার নুগায়র?[১৫৮]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবী আনাস এর ছোট ভাইয়ের পাখি পালন সম্পর্কে জানতেন। এজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বাড়িতে গেলে পাখিটির খোজ খবর নিতেন। লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, বনের পাখি ঘরে পালন যদি অবৈধ হতো তবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জানা মাত্রই পাখিটিকে ছেড়ে দিতে বলতেন, তা না করে আবূ উমায়রের সাথে পাখিটিরও খোঁজ-খবর জানতে চেয়ে মজা করতেন না। ইসলামী শরীয়ায় খাঁচা বা বদ্ধ জায়গায় পাখি ও পশু পালনে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না অর্থাৎ একে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়নি। আবার উৎসাহিতও করা হয়নি। অর্থাৎ এটা মুবাহ (সওয়াবও নেই, গুনাহও নেই)। তবে যদি কেউ কোন পাখি বা পশু শখ করে পুষতে চায় তবে ইসলাম তার শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দিয়েছে। আর সে শর্ত হচ্ছে- পোষা পাখি ও পশুর প্রতি যত্নবান হতে হবে, তাদেরকে উপযোগী বাসস্থান দিতে হবে, পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য প্রদান করতে হবে, অবস্থান অনুযায়ী সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করাতে হবে। যদি পালকের অযত্ন ও অবহেলার কারণে পোষা পাখি ও পশুর কোনরূপ কষ্ট হয় বা তারা মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে নিশ্চিত মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট কঠিন জবাবদিহীর সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের দয়ার নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে বলেছেন। অকারণে তাদেরকে মেরে ফেলা, তাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া, নিজেদের বিনোদনের নামে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়াকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قيل وَمَا حَقِّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا وَلَا يقطع رَأْسَهَا ويَطرحها

---

১৫৬ সূরা আন-নামল, আয়াত : ২০

১৫৭ আরবী নুগায়র হচ্ছে চড়ুইয়ের মত একটি ছোট্ট পাখি। কেউ কেউ একে পাপিয়া বা বুলবুলি পাখিও বলেছেন।

১৫৮ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৩ খ্রি., খ. ৯, হাদীস নং- ৫৭৭০, পৃ. ৪৯৩

> যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশি চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! অধিকারটা কি (যে অধিকারে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে)? তিনি বললেন, অধিকার হল এই যে, তা যবাই করে তা খাওয়া হবে এবং মাথা কেটে (হত্যা করে) ফেলে দেওয়া হবে না।[১৫৯]

পরিশেষে বলবো, সঠিক যত্নের সঙ্গে পশু-পাখি খাঁচায় বন্দি করে পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে যদিও জায়েজ, কিন্তু এর দ্বারা যেন তাদের বিচরণের স্বাধীনতা হরণ করা না হয়। তাই যে সকল পাখি বনে জঙ্গলে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম এবং সরকারের নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভূক্ত এসকল পাখি আমাদের কারো হাতে আসে তাদের বন্দি না বানিয়ে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

কুরআন ও হাদীস থেকে পাখি পালনের ব্যাপারে যেহেতু বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় না সেহেতু ইসলামে পাখি পালন নিষিদ্ধ নয় এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। গবেষক আলেমগণও এই মত ব্যক্ত করে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

প্রাণিজগৎকে পৃথক জাতি সত্তার স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, '"পৃথিবীতে বিচরণশীল যত প্রাণী আছে আর যত পাখি দুই ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মতো একেক জাতি"।[১৬০] পবিত্র কুরআনে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য আয়াতে প্রাণিজগতের প্রসঙ্গ এসেছে। এর বাইরেও পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রাণীর নামে অনেক সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন সুরা বাকারা (গাভি), সুরা আনআম (উট, গরু, বকরি), সুরা নাহল (মৌমাছি), সুরা নামল (পিপীলিকা), সুরা আনকাবুত (মাকড়সা), সুরা ফিল (হাতি) ইত্যাদি। এসব নামকরণ থেকে প্রাণিজগতের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। পশু-পাখির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, খাবার দাবার ও প্রয়োজনে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ইসলাম এগুলোকে প্রকৃতি ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কুরআনের বক্তব্য দেখুন, "প্রাণিকুল সৃষ্টির (অন্যতম) কারণ হলো, এগুলোতে তোমরা আরোহণ করে থাকো আর এগুলো সৌন্দর্যের প্রতীক"।[১৬১] ইসলাম ধর্ম মতে, পশু-পাখির প্রতি নম্রতা প্রদর্শন ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "চতুষ্পদ জন্তুর অনিষ্ট ক্ষমাযোগ্য"।[১৬২] পাখি পালন যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ তাই মুরগি পালন, পাখি পালন, কবুতর পালন, কোয়েল পালন, হাস পালন এর খামার, ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে কোন বাধা নেই। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে প্রয়োজনে সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশেও সরকারিভাবে এ খাতে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। ফলে মানুষের নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করছে।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা: www.ajkerkrishi.com, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : www.dyd.gov.bd, বিসিক : http://www.bscic.gov.bd/, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর : http://www.dwa.gov.bd/

৩.৬.১৪. আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য হালাল উপার্জনে উৎসাহ প্রদান

হালাল ও বৈধ উপার্জনকারীর পরকালীন সাফল্য হালাল উপার্জন একটি ইবাদত। কারণ হালাল উপার্জনকারী আল্লাহর হুকুম পালন করে। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন, সে সেগুলো

---

[১৫৯] হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী [অনু. হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক], *আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব*, ঢাকা : হাসনা পাবলিকেশন, ২০১৬, হাদীস নং- ১০৯২

[১৬০] সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত : ৩৮

[১৬১] সুরা আন-নাহ্ল, আয়াত : ৮

[১৬২] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৩, খ. ১০, হাদীস নং- ৬৪৪৪, পৃ. ২৭৯

পরিত্যাগ করে। যেসব মুমিন ব্যক্তি হালাল ও বৈধ পন্থায় জীবিকা তথা অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা দান করবেন। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا شْتَرٰى وَاِذَا قْتَضٰى "আল্লাহ তা'আলা ঐ উপার্জনকারীর প্রতি রহম করেন, যে বেচা কেনা এবং পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়।"[১৬৩]

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবেনা, সেদিন সেই ছায়ায় ঐ ব্যক্তিকে স্থান দেয়া হবে, যে আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকার) সন্ধানে বের হয় এবং তা সংগ্রহ করে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ "সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দিক এবং শহিদগণের সঙ্গী হবে।"[১৬৪]

৩.৬.১৫. হালাল বা বৈধ উপার্জনের পদ্ধতি

হালাল ও বৈধভাবে অর্থ উপার্জনের উপায় সমূহ বর্ণনা করে বৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও ভোগ ব্যবহারের নির্দেশই ইসলামে দেয়া হয়েছে। ইসলাম অবৈধ উপার্জন ও জীবিকাকে নিষিদ্ধ করে এবং উত্তম ও সুন্দর উপার্জন ও জীবিকাকে প্রশংসা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ
حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ رَزَقَكُمُ وَكُلُوا مِمَّا

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যেসব ভালো জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমরা সেগুলো নিষিদ্ধ করে নিওনা এবং সীমালংঘন করোনা। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও ভালো জীবিকা-জীবনোপকরণ দিয়েছেন সেগুলো ভোগ আহার করো এবং সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।[১৬৫]

মূলত নিষিদ্ধ উৎস সমূহ ছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে উপার্জনের বাকি সব উৎসই হালাল বা বৈধ। আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণের জন্য আয় উপার্জনের নিম্নোক্ত উৎস সমূহ হালাল এবং বৈধ :

৩.৬.১৫.১. ব্যবসা করা

ইসলাম অলস বসে থেকে বা বৈরাগ্য গ্রহন করে পরনির্ভর হয়ে জীবনযাপন করতে নিষেধ করেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছে। বৈধ পন্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলাম সর্বাধিক উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

---

১৬৩ প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৪৬, পৃ. ১৮

১৬৪ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ২০০৬, হাদীস নং- ১২১২, পৃ. ৪৯৬

১৬৫ সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৮৭-৮৮

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বৈধ"।[১৬৬] ব্যবসা করা যায় :

ক. একক ব্যবসা,

খ. পূজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ভাগে ব্যবসা,

গ. পূঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে যৌথ বা ভাগে ব্যবসা।

৩.৬.১৫.২. ইসলামের দৃষ্টিতে কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

যাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে তারা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী কিস্তিতে বিক্রি করার মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যবসা শর্ত সাপেক্ষে বৈধ। কিস্তিতে লেনদেন মানে বিক্রেতা তার বিক্রয় পণ্য ক্রেতাকে বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দেবে; কিন্তু ক্রেতা তৎক্ষণাৎ ক্রয় মূল্য পরিশোধ করবে না; বরং ক্রেতা চুক্তিপত্রে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক বিক্রয় মূল্য পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করবে। এভাবে লেনদেন করাকে ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় বাইয়ে বিত তাকসিত তথা কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। কিস্তিতে বেচাকেনা সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন, বারিরা (রা.) এসে বলল, আমি ৯ উকিয়ার বিনিময়ে নিজেকে গোলামি থেকে মুক্ত করার চুক্তি করেছি, প্রতিবছর এক উকিয়া করে দিতে হবে। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন"।[১৬৭] কিস্তিতে বেচাকেনার বৈধতার বিষয়টি এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বাকিতে লেনদেন সম্পর্কে এরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগন! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বাকিতে লেনদেন করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও"।[১৬৮] হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) নিজেই বাকিতে ক্রয় করে ছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"নবী কারীম (সা.) এক ইহুদির কাছ থেকে বাকিতে কিছু খাবার খরিদ করেছিলেন এবং বিনিময়ে তার একটি লৌহবর্মও সেই ইহুদির কাছে বন্ধক রেখেছিলেন"।[১৬৯]

সুতরাং যেমনি ভাবে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ, তেমনি ভাবে কিস্তিতে বেচাকেনাও জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের সমাজে কিস্তিতে বেচাকেনার বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। সব পদ্ধতিকে নির্বিচারে জায়েজ বলা যায় না। তাই কিস্তিতে বেচাকেনা জায়েজ কিনা, এ বিষয়টি জানার আগে বেচাকেনা সম্পর্কে কিছু মূলনীতি জানা প্রয়োজন।

প্রথম মূলনীতি: ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে সুদ কঠোরভাবে হারাম। সুদ হলো বিনিময়হীন কোনো বস্তু বা মুনাফা লাভ করা।

---

১৬৬ সূরা আন নিসা, আয়াত : ২৯

১৬৭ *সহিহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৯৩, পৃ. নং ৩২৮

১৬৮ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৮২

১৬৯ *সহিহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২২২৮, পৃ. ২০৩

উল্লেখ্য, যে বস্তুকে শরিয়ত বিনিময় যোগ্য মনে করে না, তার বিনিময়ে কোনো কিছু লাভ করা, বিনিময় ছাড়া মুনাফা লাভেরই নামান্তর। আর তেমনি একটি বিষয় হলো আজল বা মেয়াদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে মেয়াদ বিনিময় যোগ্য কোনো বস্তু নয়। তাই বেচাকেনার ক্ষেত্রে মেয়াদের বিনিময়ে কোনো মুনাফা ধার্য করা হলে, তা সুদ হিসেবেই বিবেচিত হবে। অতএব ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে বর্ধিত সময়ের কারণে বিক্রেতা অতিরিক্ত মুনাফা দাবি করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি নির্ধারিত মেয়াদের আগেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে তার জন্য সময়ের আগে পরিশোধ করার কারণে কিছু টাকা কমিয়ে রাখার দাবি করাও জায়েজ হবে না। কারণ যদি এমনটি করা হয়, তবে তা আজল তথা মেয়াদের বিনিময় ধরা হবে, যা নাজায়েজ ও হারাম। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় কিছু বাড়িয়ে দেয় বা বিক্রেতা নিজ থেকেই কিছু কম নেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এ সম্পর্কে হাদিসে এসছে,

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

"হযরত জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.)-এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা আদায়ের সময় আমাকে কিছু অধিক প্রদান করেন"।[১৭০]

দ্বিতীয় মূলনীতি: ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত বস্তু ও মূল্যের পরিমাণ এবং বাকিতে চুক্তি হলে তার মেয়াদ ইত্যাদি নির্ধারিত ও জানা থাকা শর্ত। এর কোনো একটি অনির্ধারিত বা অজানা থাকলে চুক্তি শুদ্ধ হবে না। ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) বলেন, "অজানা বস্তুর বিক্রি সহিহ হবে না"।[১৭১]

তৃতীয় মূলনীতি: ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় সাফকা ফিস সাফকাহ তথা এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তিকে শর্ত করা নিষিদ্ধ।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, কিস্তিতে বেচাকেনা মূলত বাকিতে বেচাকেনারই একটি পদ্ধতি। আর বাকিতে লেনদেন করতে গেলে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে গ্যারান্টি আদায় করে নিতে পারেন। গ্যারান্টি নেয়ার দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

১. ক্রেতা তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু বিক্রেতার কাছে বন্ধক হিসেবে রেখে দেবে।

২. কোনো ব্যক্তিকে জামিন হিসেবে পেশ করবে। বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে গ্যারান্টি হিসেবে কোনো বস্তু রাখলে, সেই বস্তু থেকে বিক্রেতা কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারবে না। এই বস্তুটির মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ে তার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারবে মাত্র। কোনো সময় যদি ক্রেতা তার ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করে বা টালবাহানা করে তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে ক্রেতা কর্তৃক রাখা বন্ধককৃত বস্তুটি বিক্রয় করে তার ঋণের টাকা নিয়ে নিতে পারবে। বিক্রেতা পাওনা টাকা থেকেও যদি বন্ধককৃত বস্তুটির বিক্রয়মূল্য বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতার জন্য অতিরিক্ত অংশ ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। ইসলামী নিয়ম কানুন মেনে কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা ইসলামী শরীয়াহ সম্মত একটি বৈধ পদ্ধতি।

---

[১৭০] *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং- ৩৩১৪

[১৭১] ইমাম আবু বকর আল রাযি আল জাসসাস, *শরহু মুখতাসারিত তহাবি*, দিল্লী : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১০৮

৩.৬.১৫.৩. কৃষি কাজ

চাষাবাদ মানবজীবনের অপরিহার্য অংশ। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা। মানব জাতির সূচনা থেকেই কৃষিকাজ বা চাষাবাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। চাষাবাদের ইতিহাস এত পুরনো, যত পুরনো এই পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস। ইসলাম এই পেশাকে মর্যাদার চোখে দেখেছে। কৃষিকর্ম জীবিকা নির্বাহে অন্যতম উপার্জন মাধ্যম। ইসলাম এটিকে মহৎ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিকার্যের সুচনা হয়েছে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকেই তাঁকে কৃষি কার্য, আগুনের ব্যবহার ও কুটির শিল্প শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।[১৭২] পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে এ ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছেন।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ (٢٤) اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (٢٧) وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا (٢٨) وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا (٢٩) وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا (٣٠) وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا (٣١) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ (٣٢)

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। তারপর যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর ও শাক-সবজি, যায়তূন ও খেজুর বন, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা, আর ফল ও তৃণগুল্ম। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ"।[১৭৩] পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)। তাঁর সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের আদম (আ.) সম্পর্কে বলব। তিনি কৃষিকাজ করতেন"। হাজারো নবীর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.)। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে বলব, "তিনি চাষাবাদ করতেন"।[১৭৪]

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চাষাবাদ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লামা সারাখসি (রহ.) লিখেছেন, "মহানবী (সা.) জারেক নামক স্থানে চাষাবাদ করেছেন"।[১৭৫] কৃষি কাজ করা হযরত রাসূল (সা.) আদর্শও বটে। কোনো ভূমি যেন পরিত্যক্ত বা অনাবাদি না থাকে, সে জন্য হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা জমি আবাদ কর আর যে ব্যক্তি নিজে আবাদ করতে না পারে, সে যেন ভূমিটিকে অন্য ভাইকে দিয়ে দেয়, যাতে সে আবাদ করে ভোগ করতে পারে"।[১৭৬] কুরআনে এসছে, "তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল আর রসযুক্ত খেজুর বৃক্ষ এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধি গুল্ম"।[১৭৭]

খাদ্যশস্য উৎপাদনে বীজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনিই বীজ দিয়েছেন, যা থেকে হয় ফুল-ফল, রবিশস্য। বীজ ব্যতিত কৃষি উৎপাদনের কথা ভাবাই যায় না। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যে বীজ বপন কর, তা

---

১৭২ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ২৯৫; ইবন খালদুন, *মুকাদ্দমা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭-৮

১৭৩ সূরা আবাসা, আয়াত: ২৪-৩২

১৭৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাকিম আন-নিশাপুরী, *কিতাবুল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনি লিল-হাকেম*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, তা.বি., হাদীস নং- ৪১৬৫

১৭৫ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবী সাহল শামছুল আইম্মা আস-সারাখসী, *কিতাবুল মাবসুত লিস-সারাখসী*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২৩

১৭৬ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২১৮৯, পৃ. ১৭৭-১৭৮

১৭৭ সূরা আর-রহমান, আয়াত : ১১-১২

সম্পর্কে ভেবে দেখছ কী? তোমরা সেটা উৎপন্ন কর, নাকি আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছে করলে সেটা খড়কুটোয় পরিণত করে দিতে পারি। তখন তোমরা অবাকও হয়ে যাবে"।[১৭৮]

পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে চাষাবাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে, তিনিই (আল্লাহ) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে আমি সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; তারপর তা থেকে সবুজ ফসল নির্গত করি, যা থেকে ঘন শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি আর আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি এবং জয়তুন ও আনারও। এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশ। লক্ষ করো তার ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। ঈমানদারদের জন্য এগুলোয় অবশ্যই নিদর্শন আছে।[১৭৯] যেমন :

ক. নিজের জমিতে ফল, ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও উপার্জন,

খ. পরের জমিতে বর্গা চাষের মাধ্যমে উৎপাদন ও উপার্জন,

গ. পরের জমি ভাড়া (ইজারা) নিয়ে উৎপাদন।

এগুলো ছাড়াও বর্তমানে আরো অনেক বৈধ পদ্ধতি রয়েছে যা আলোকপাত করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে যে কোন পেশা প্রহন করার আগে এর বৈধতা যাচাই করে নেওয়া একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩.৬.১৬. উপার্জনের প্রকারভেদ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের খাদেম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে তা থেকে উপার্জন বা সম্পদ আহরণ করবে। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সেজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

> হালাল বা বৈধ সুস্পষ্ট এবং হারাম বা অবৈধও স্পষ্ট আর এ দু এর মধ্যবর্তী বিষয়গুলো হলো সন্দেহজনক। আর বেশীরভাগ লোকই সেগুলো (সম্পর্কে সঠিক পরিচয়) জানে না। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক জিনিসগুলোকে পরিহার করলো সে তার দ্বীন ও মান-সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মাঝে পতিত হলো তার উদাহরণ ঐ রাখালের মত যে পশু চরায় সংরক্ষিত ভুমির সীমানায় এমনভাবে যে, যে কোনো সময় সে তাতে প্রবেশ করবে।[১৮০]

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় উপার্জন দুই ধরনের-

ক. হালাল উপার্জন খ. হারাম উপার্জন

তাই উপার্জন করার ক্ষেত্রে হারাম পদ্ধতি পরিহার করে হালাল পন্থায় উপার্জন করতে হবে। হারাম উপার্জন যতই সহজলভ্য হোক তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আত্মনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার জন্য হারাম উপার্জন যতই সহজলভ্য হোক তা থেকে বিরত থাকা একজন মু'মিনের জন্য জরুরী।

---

১৭৮ সূরা আল-ওয়াক্বিআহ, আয়াত : ৬৩-৬৫

১৭৯ সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত : ৯৯

১৮০ *বুখারী শরীফ*, অনুবাদ, প্রাগুক্ত, ২০০৩, খ. ১, হাদীস নং- ৫০, পৃ. ৪০

৩.৬.১৭. হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও ফযিলত

৩.৬.১৭.১. হালাল উপার্জন ইবাদাত সমতুল্য

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বান্দাহ যেসব ইবাদাত করে থাকে হালাল উপার্জন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"তাই, আল্লাহর কাছে রিয্ক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে"।[১৮১]

৩.৬.১৭.২. উপার্জনের উৎস সম্পর্কে কিয়ামাতে জিজ্ঞাসা করা হবে

কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে তার উপার্জনের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য মুমিনের জন্য হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও স্বস্থান হতে নড়তে দেওয়া হবে না।

১. তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে,
২. যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে,
৩. ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে,
৪. তা কিভাবে ব্যয় করেছে,
৫. সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা।[১৮২]

৩.৬.১৭.৩. ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত

আল্লাহর ইবাদাত করবে অথচ তার উপার্জন হালাল হবে না, এটা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব হালাল উপার্জন ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

---

[১৮১] সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত : ১৭

[১৮২] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ১৯৯২, খ. ৪, হাদীস নং- ২৪১৯, পৃ. ৬৬২

হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মু'মিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলগণকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুজি হিসেবে দান করেছি। এবং নেক আমল করো। নিশ্চয়ই আমি জানি তোমরা যা কর সে সম্পর্কে'। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুজি হিসেবে দান করেছি। অতঃপর এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে, হে আমার রব, হে আমার রব অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। সুতরাং তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? ।[১৮৩]

৩.৬.১৭.৪. হালাল উপার্জন করা আল্লাহর পথে বের হওয়ার শামিল

হালাল উপার্জন করার জন্য প্রয়োজনে বিদেশেও যেতে হতে পারে। সেজন্য এটিকে কুরআন মাজীদে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সাথে হালাল উপার্জনকে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ

"আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে" ।[১৮৪]

৩.৬.১৭.৫. হালাল উপার্জন আখেরাত বিমুখিতা নয়

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে এ দুনিয়াতে হালাল উপার্জন করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। সেজন্য উপার্জন করতে বৈধভাবে চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্য কিছু করা আখেরাত বিমুখতা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।[১৮৫]

৩.৬.১৭.৬. হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের উপায়

মানুষের দুটি জীবন রয়েছে, একটি দুনিয়ায়, অপরটি আখেরাতে। অতএব হালাল পন্থায় উপার্জনকারী দুনিয়াতে কখনও সমস্যায় থাকলেও আখেরাতে জান্নাতে যাবে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

---

১৮৩ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০১০ খ. ২, হাদীস নং- ২২১৮, পৃ. ৪২৯

১৮৪ সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০

১৮৫ সূরা আল-ক্বাছাছ, আয়াত : ৭৭

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি হালাল উপার্জিত খাবার খায় ও সুন্নাতের উপর আমল করে এবং মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[১৮৬]

৩.৬.১৭.৭. হালাল উপার্জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন

পৃথিবীর জীবন নির্বাহে হালাল উপার্জন করার সুযোগ বা যোগ্যতা লাভ করা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। সেজন্য হালাল পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জান্নাতে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা করছে। হাদীসে এসছে,

أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة

"চারটি জিনিস যখন তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে তখন দুনিয়ার অন্য সব কিছু না হলেও কিছু যায় আসে না। তা হলো, আমানতের সংরক্ষণ, সত্য কথা বলা, সুন্দর চরিত্র, হালাল উপার্জনে খাদ্য গ্রহণ"।[১৮৭] উপার্জন হালাল হলে তাতে বরকত লাভ করা যায়, আত্মনির্ভর হওয়াও সহজ হয়।

৩.৬.১৭.৮. উপার্জনের ক্ষেত্রে মাধ্যমটি বৈধ হওয়া

উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থ সম্পদ উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনগণকে সর্তক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ۚ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা"।[১৮৮]

৩.৬.১৭.৯. উপার্জনে কম বা বেশি হওয়াকে পরীক্ষা হিসেবে মনে করা

বেশি বা কম উপার্জন করার মধ্যে আল্লাহ পরীক্ষা করে থাকেন। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ

"আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে

---

১৮৬ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২৫২২, পৃ. ৭১৯

১৮৭ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, হাদীস নং- ৬৬৫২, পৃ. ১৭৭,

১৮৮ সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৯

পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিয্ককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন"।[১৮৯]

৩.৬.১৭.১০. উপার্জন আল্লাহর বিধান পালনে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না

অনেক সময় উপার্জন করতে করতে আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে না। আল্লাহর ইবাদাতের কথা ভুলে যায়। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত"।[১৯০]

৩.৬.১৭.১১. কেবল সম্পদ অর্জনই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় নয়

কেবল সম্পদ অর্জন আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাঁধাও হতে পারে, এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ

"আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে"।[১৯১]

৩.৬.১৮. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য হালাল উপার্জনে করণীয়

৩.৬.১৮.১. সততা অবলম্বন

উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে সততা থাকতে হবে। উপার্জেয় বস্তু হালাল এবং পদ্ধতিগতভাবে হালাল হলেও সততা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না। আর সততা অর্জন করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসছে,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে থাকবে"।[১৯২]

---

১৮৯ সূরা আল-ফাজর আয়াত : ১৪-১৫

১৯০ সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত : ৯

১৯১ সূরা সাবা, আয়াত : ৩৬

১৯২ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ১২১২, পৃ. ৪৯৬,

৩.৬.১৮.২. আমানতদারিতা

আমানতদারিতা এমন একটি গুণ যা হালাল উপার্জন করার জন্য অপরিহার্য। আমানতদারিতা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ

"আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে কর, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে"।[১৯৩]

৩.৬.১৮.৩. ওয়াদা পালন করা

চাকরি বা ব্যবসায় যেসব ওয়াদা করা হবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। ওয়াদা পালন করে হালাল উপার্জন করার পাশাপাশি আল্লাহর ভালবাসাও পাওয়া যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন"।[১৯৪] তাছাড়া ওয়াদা পূরণ জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে। হযরত উবাদা ইবন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أبصاركم وكفوا أيديكم

"তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমদেরকে জান্নাতে যাওয়ার যামীন হব, যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, যখন আমানত গ্রহণ করবে তখন তা আদায় করবে, তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুগুলো নীচু করে রাখবে এবং হাতগুলো নিয়ন্ত্রনে রাখবে"।[১৯৫]

৩.৬.১৮.৪. আন্তরিকতা

উপার্জন হালাল করার জন্য উক্ত কাজে আন্তরিক হতে হবে। কথা ও কাজের গরমিল পাওয়া গেলে হালাল উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আন্তরিকতার ঘাটতি মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ "তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তর সমূহে নেই"।[১৯৬]

৩.৬.১৮.৫. স্বচ্ছতা

উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে, কোনো গোজামিল বা অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৯৩ সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ২৮৩

১৯৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৬

১৯৫ নাসির উদ্দীন আলবানী, *আসসিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ৩, হাদীস নং- ১৪৭০, পৃ. ৩৩

১৯৬ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল"।[১৯৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

قُلۡ إِن تُخۡفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمۡ أَوۡ تُبۡدُوهُ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

"বল, তোমরা যদি তোমাদের অন্তর সমূহে যা আছে তা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর আসমান সমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা আছে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।[১৯৮]

৩.৬.১৮.৬. শৃঙ্খলা

ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকতে হবে। এমন বিধি-বিধান যা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নয় তা মেনে চলতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের"।[১৯৯]

৩.৬.১৮.৭. ইলম অর্জন করা

যেহেতু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু নেই, সেজন্য ব্যক্তিকে হালাল উপার্জন করার জন্য ইলম অর্জন করতে হবে। কারণ তাকে জানতে হবে কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল। কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ

"বল, কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিয্ক?"[২০০]

৩.৬.১৯. আত্মনির্ভরশীলতা বিরোধী কর্মকাণ্ড অনুৎসাহিত ও নিষিদ্ধকরণ

৩.৬.১৯.১. ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ

পরনির্ভরশীলতার সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। হযরত রাসূল (সা.) ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে স্বনির্ভরতা অর্জনের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদিসের ঘটনায় যার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিল। হযরত রাসূল (সা.) তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেন যে, তার কি সম্পদ আছে। হযরত রাসূল (সা.) তার সম্পদ অর্থাৎ একটা পেয়ালা ও একটা কম্বল আনতে বললেন, ঐ গুলো নিলাম করে দিয়ে ২ দিরহাম সংগ্রহ করলেন। ১ দিরহাম দিয়ে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে একটা কুঠার ক্রয় করে আনালেন। ঐ কুঠার তিনি নিজে হাতল লাগানোর পর তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন,

---

[১৯৭] সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৭০

[১৯৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৯

[১৯৯] সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৯

[২০০] সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ৩২

যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাট এবং ১৫দিন তোমাকে যেন আর না দেখি এভাবে তিনি শ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে বলেছেন। হযরত রাসূল (সা.) ভিক্ষায় অর্জিত সম্পদকে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর বলেছেন-

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

"যে ব্যক্তি অভাব ব্যতীত ভিক্ষা করে সে যেন (জাহান্নামের) পাথর ভক্ষন করে"।[২০১]

তিনি আরও বলেন,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"তোমাদের মাঝে যে ভিক্ষা করে সে যখন আল্লাহর সামনে যাবে তখন তার চেহারায় এক টুকরা গোশতও থাকবে না"।[২০২]

মহানবী এমনিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিরুৎসাহিত করণের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন। সুদমুক্ত ঋণ প্রদান দরিদ্র ও পরনির্ভরশীল মানুষদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য করজে হাসানাহ বা সুদ মুক্ত ঋণ দান একটি অতি উত্তম পন্থা। এ কারণে ইসলামী শরিয়ত দরিদ্র অসহায়, নিঃস্ব, অভাবী মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ঋণ প্রদানকে সম্পদশালী ও ধনীব্যক্তিদের উপর ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। যাতে পারস্পারিক সহযোগিতা প্রীতি, ভালবাসা বৃদ্ধিপায় এবং দায়িত্বানুভূতি বিকশিত হয়। যদিও বিরাজমান পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা সুদ মুক্ত ঋণদানকে বোকামী মনে করে। আল্লাহ তা'আলা সমাজের ধনশালীদের ঋণদানে উৎসাহিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

"তোমরা আল্লাহকে করজে হাসানাহ (উত্তম ঋণ) দাও"।[২০৩]

অন্য আয়াতে অভাবী নিঃস্ব পীড়িতকে ঋণদান প্রকারান্তরে আল্লাহকে ঋণ প্রদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"যে আল্লাহকে উত্তমরূপে ঋণ (সুদমুক্ত) প্রদান করবে, আল্লাহ তার সেই দানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে (কিয়ামতের দিন পুরস্কার হিসেবে) দিবেন"।[২০৪] বাস্তবতায় বর্তমানে সারা পৃথিবীর কোথাও ইসলামের এ সুমহান শিক্ষার অনুসরণ করা হচ্ছে না। বিধায় সুদের রাজত্ব সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে গোটা বিশ্বব্যাপী, দেশ, অঞ্চল, প্রতি জনপদে। অর্থনীতির চাকা সুদ ছাড়া ঘুরছে না। ফলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে আর অভাবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্রের চুড়ান্ত পর্যায় অসহায় ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। লক্ষ-কোটি বনী আদম মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। অথচ করজে হাসানাহ

---

২০১ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং- ১৭৫৪৩

২০২ আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৮৯, পৃ. ৪৬

২০৩ সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০

২০৪ সুরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৪৫

প্রচলিত থাকলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ পেত। আত্মনির্ভরশীল হতে পারত। এতে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দুর হয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হত।

৩.৬.১৯.২. কাজে গাফিলতি ও অলসতা না করা

ইসলাম কাজে গাফিলতিকে কোনমতেই সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়"।[২০৫] আয়াতের অর্থ হলো, নিজে নেয়ার সময় কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নেয়। কিন্তু অন্যকে মেপে দিতে গেলে কম দেয়। ফকিহদের মতে, এখানে তাওফিফ বা মাপে কম-বেশি করার অর্থ হলো, পারিশ্রমিক পুরোপুরি আদায় করে নিয়েও কাজে গাফিলতি করা। অর্থাৎ আয়াতে ওই সব শ্রমিকও শামিল যারা মজুরি নিতে কমতি না করলেও কাজে গাফিলতি করে; কাজে ফাঁকি দিয়ে ওই সময় অন্য কাজে লিপ্ত হয় বা সময়টা অলস কাটিয়ে দেয়। তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলতেন, "হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে।[২০৬] এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করা একজন মু'মিন ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩.৬.১৯.৩. নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যের বিলোপ সাধন

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী অর্ধেক তার নর...' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার মতো নারী-পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে গড়তে অবদান রাখলেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে পদে পদে। বিশেষ করে বেতন-ভাতা ও মজুরির দিক থেকে। নারী-পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে প্রায় প্রতিটি স্তরে সমানতালে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-কূটনীতির সঙ্গে সঙ্গে মাটি কাটা, ইট ভাঙা, কৃষি কাজ করা, বোঝা টানা, নির্মাণ কাজ, গৃহকর্ম, মৃৎশিল্প, গার্মেন্টস শিল্প-কারখানা, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির টুকরো কাপড় অর্থাৎ জুট বাছার কাজ, চা বাগানগুলোতে চা তোলার কাজ, চিংড়ি রপ্তানি প্রকল্প, শুঁটকি প্রকল্পসহ বিভিন্ন শ্রমবাজারে রয়েছে এ দেশের নারীদের বলিষ্ঠ পদচারণা। কিছু কিছু স্তর ছাড়া অধিকাংশ স্তরের কাজেই নিয়োজিত শ্রমজীবী নারীদের প্রায় অধিকাংশই অশিক্ষিত। এসব শ্রমজীবী নারীর মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগই অশিক্ষিত, বাকি ১০ ভাগ সামান্য লেখাপড়া জানে। ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে পারেনা। জীবন ও জীবিকার তাকিদে ছুটে চলাই যেন তাদের লক্ষ্য। কোথাও এতটুকু অবসর নেই। নেই কোনো বিনোদন, নেই ভালো খাবার-দাবার। সংসারের কঠিন ঘানি টানা এসব শ্রমজীবী নারীর সন্তানরা ভালো স্কুলে পড়তে পারেনা। ছোট্ট দুধের শিশুকে নিয়েও নারীকে কাজে বের হতে হয়। এ চিত্র আরো করুণ। এসব খেটে খাওয়া নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য সচেতন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাটি কাটার কাজে একজন পুরুষ শ্রমিক যেখানে পায় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, সেখানে একজন নারী শ্রমিক পাচ্ছে ১০০ থেকে ১১০ টাকা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এসব নারী শ্রমিক নিজেরাও জানে না তাদের বৈষম্যের কথা। কোনো কোনো নারী শ্রমিককে বলতে শুনা যায় "বেটা মানুষ, মাইয়া মানুষের চাইয়া বেশি কাম করে তাই তাগো বেশি টাকা দেয়"। আসলে কী তাই? একজন পুরুষ শ্রমিক যদি ১০ ঘণ্টা কাজ করে নারী শ্রমিকও সেই একই সময় এবং সমপরিমাণ কাজ করছে। তবে কেন এ বৈষম্য? শ্রমজীবী যেসব নারী মজুরিভিত্তিক কাজ করে তারা নিজ গৃহে গিয়ে সামান্যতম বিশ্রামটুকু কী নিতে পারে? এখানেও রয়েছে ঘর-গৃহস্থালির কাজ। বাড়ি ফিরে তাকে করতে হয় রান্না-বান্না, ছেলে-মেয়েদের নাওয়া-খাওয়াসহ অন্যান্য কাজ। শুধু শ্রমজীবী নারীর ক্ষেত্রে নয়

---

[২০৫] সূরা আল মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ১-৩

[২০৬] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৩, খ. ৫, হাদীস নং ২৬৯৪, পৃ. ১৬৫-১৬৬

সচ্ছল পরিবারের নারীরাও বাইরে চাকরি না করলেও ঘরের হাজারও কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। অথচ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কেউ তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করছেনা। বরং তাদের এ কাজকে কাজ হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়না, পরিবারের কর্তা ব্যক্তি সারাদিনে ঘরের কাজের হিসাব চায়, এ রকম হাজারো বৈষম্য আমাদের সমাজে বিদ্যমান। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পারিবারিক কাজে তার স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করতেন, এমনকি বিদায় হজ্বের ভাষণে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে নারীর প্রতি সদাচরণ ও তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য জোর তাকিদ প্রদান করে গেছেন, আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের সাথে তুলনায় তাদের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই তাদের কাজ ও শ্রমকে বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নাই। নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন সহজ হবে। তাদের সকল কাজে সহযোগিতা করতে হবে তাহলেই কাঙ্খিত সাফল্য আসবে।

৩.৬.১৯.৪. জীবনযাপনে অপচয় ও অপব্যয় না করা

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা এবং সম্পদ ভোগ করার অনুমতি ও নির্দেশ প্রত্যেক ধর্ম ও সভ্যতায় রয়েছে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম বা সভ্যতায় ইসলামের মত আয়-ব্যয়কে নিয়ম-নীতির ফ্রেমে আবদ্ধ করা হয়নি। ইসলাম একদিকে যেমন হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে, অপরদিকে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পথে ব্যয় করারও নির্দেশ দিয়েছে। মানব সমাজে অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় আজ একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলাম এটিকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল। -

আরবী ইসরাফ (إسراف) শব্দের অর্থ হল সীমালঙ্ঘন, অপচয়, অপব্যয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, মাত্রাতিরিক্ততা, অপরিমিতি।[২০৭] কতিপয় বিদ্বান ইসরাফ শব্দকে ব্যয় করা ও খাওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ শরীফ আলী জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হিঃ) ইসরাফ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

الإسراف هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتجاوز الحد في النفقة، وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو يأكل مما يحل له فوق الاعتدال، ومقدار الحاجة

"ইসরাফ হল কোন হীন উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা। কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তির অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করা অথবা তার জন্য যা কিছু হালাল তা অপরিমিত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা"।[২০৮] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ،

"তোমরা এগুলির ফল খাও যখন তা ফলবন্ত হয় এবং এগুলির হক আদায় কর ফসল কাটার দিন। আর তোমরা অপচয় করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না"।[২০৯]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف "যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে এক দিরহামও খরচ করল সেটাই অপচয়"।[২১০]

---

২০৭ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ৭৮

২০৮ শরীফ আলী জুরজানী, *কিতাবুত তারীফাত*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি., পৃ. ৩৮

২০৯ সূরা আল-আনআ'ম, আয়াত : ১৪১

আর তাবযীর (التبذير) অর্থও অপচয়, অপব্যয়, বাজে খরচ, অমিতব্যয় ইত্যাদি।[২১১] এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো القاء البذر وطرحه অর্থাৎ বীজ ছিটানো ও নিক্ষেপ করা। এ থেকে শব্দটি রূপকভাবে অর্থ-সম্পদ অযথা ব্যয় করার অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২১২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ "তুমি অপব্যয় করবে না, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই"।[২১৩] ফক্বীহগণ তাবযীর-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, عدم إحسان التصرف في المال وصرفه فيما لاينبغي "সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা এবং তা অনুচিত কাজে ব্যয় করা"।[২১৪]

অপচয় ও অপব্যয়ের কারণ : অপচয় ও অপব্যয়ের বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মৌলিক কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.৬.১৯.৫. রিয্ক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করা

রিয্ক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخَذِ الْحَلالِ، وَتَرَكِ الْحَرَامِ

"রিয্ক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায় না যতক্ষণ না তার নির্ধারিত শেষ রিয্ক তার কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমরা হালাল রিয্ক সুন্দরভাবে তালাশ করো। হালাল গ্রহণ কর, আর হারাম থেকে বিরত হও"।[২১৫]

৩.৬.১৯.৬. অবৈধ উপার্জনে নিষেধাজ্ঞা

অনেক মানুষ এমন আছেন যারা পরিবার পরিজন, সন্তানদের মায়ায় পড়ে, কিংবা সম্পদের মোহে পড়ে হালাল হারামের পরওয়ানা না করে যে কোন উপায়ে উপার্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন। তারা একবারও ভাবেন না তাদের এই উপার্জনের পরকালীন ফলাফল কি হবে ? অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

---

২১০ ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি., খ. ১৩, পৃ. ৭৩

২১১ *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২১২ আবুল কাসেম আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল মা'রুফ বির রাগিব আল ইস্পাহানী, *আলমুফরাদাত ফি গরীবিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, তা.বি., পৃ. ৪০

২১৩ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৬-২৭

২১৪ ইমাম নববী, *তাহরীরু আলফাযিত তানবীহ*, দামেশক : দারুল কলম, ১৪০৮ হি., পৃ. ২০০

২১৫ মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ আবু হাতিম আততামিমী আবুসতী, *সহীহ ইবন হিব্বান*, খ. ৭, হাদীস নং-৩২৩৯, পৃ. ৩২

"আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না"।[২১৬]

পরকালে সম্পদ, সন্তান সন্ততি কোন কোন উপকারে আসবে না। শুধু নেক আমলই তার জন্য উপকারে আসবে। আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ

"যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না"।[২১৭]

যাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে অবৈধ উপার্জন করা হয়েছে তারা কেউ এর পাপের দায়ভার নিবেনা। নেওয়ার সুযোগও থাকবে না। সে কথা আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়"।[২১৮] হারাম ও অবৈধ উপার্জনের ভয়াবহ পরকালীন শাস্তির কথা কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য জায়গায় উল্লেখ আছে। এখানে দুটি হাদিস উল্লেখ করছি। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ

"যে শরীর (যে ব্যক্তি) হারাম (উপার্জন ভোগ) দ্বারা লালিত ও বিকশিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা"।[২১৯] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

> اِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوْا صَالِحًا وَّقَالَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ مَطْعَمُه حَرَامٌ وَّمَشْرَبُه حَرَامٌ وَّمَلْبَسُه حَرَامٌ وَّغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ
>
> আল্লাহ উত্তম-পবিত্র। তিনি উত্তম এবং পবিত্র (পন্থা ও বস্তু) ছাড়া গ্রহণ করেন না। তিনি মুমিনদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলগণকে। তিনি তাদের বলেছেন : হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম ও পবিত্র জীবিকা আহার করো, ভোগ করো এবং আমলে সালেহ করো। তিনি আরো বলেছেন, হে মুমিনগণ! আমার প্রদত্ত উত্তম ও পবিত্র জীবিকা ভোগ-আহার করো। অতপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দেখো, এক ব্যক্তি দূর দুরান্ত সফর করে আসে। তার চুল এলোমেলো, দেহ ধূলোমলিন। সে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করে বলে, হে প্রভু, হে

---

২১৬ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ৪৮

২১৭ সূরা আশ শুয়ারা, আয়াত : ৮৮

২১৮ সূরা ফাতির, আয়াত : ১৮

২১৯ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২৬৬৭, পৃ. ২৩২

প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম (অর্থাৎ হারাম উপার্জনের), হারাম উপার্জনই সে ভোগ করে। কী করে কবুল হবে তার দোয়া?[২২০]

৩.৬.১৯.৭. হারাম উপার্জন ইসলামী শরিয়তে নিষেধ

হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানা না থাকলে উপার্জনকে শতভাগ হালাল করা যাবে না। সেজন্য কোনটি হারাম উপার্জন তা সম্পর্কেও জানতে হবে । এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন"।[২২১] হারাম উপার্জন দুইভাবে হতে পারে: একটি বস্তুগত হারাম অপরটি হলো পদ্ধতিগত হারাম।

বস্তুগত হারাম

কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগতভাবেই হারাম। এগুলোকে কোনভাবেই হালাল করার সুযোগ নেই। যেমন: মদ, চুরি, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা, শুকরের গোশত, মৃত প্রাণির গোশত ইত্যাদি।

পদ্ধতিগত হারাম

কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগত হারাম নয় পদ্ধতির কারণে হারাম। যেমন, সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিস, জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবর দখল, লুণ্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাপ্পাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি। আয়ের ক্ষেত্রে যদি হালাল-হারাম মানা না হয়, তাহলে অপচয় ও অপব্যয়মুক্ত জীবনযাপন করা যাবেনা। ফলে আত্মনির্ভর হওয়া সুদুর পরাহত হবে।

৩.৬.২০. হালাল উপার্জনে বর্জনীয়

৩.৬.২০.১. মিথ্যাচার ও প্রতারণা আশ্রয় না নেওয়া

মিথ্যা এমন একটি খারাপ গুণ যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা কথা বলে যে উপার্জন করা হবে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

"আর তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা নিয়ে যায় পাপ কাজের দিকে, আর পাপকাজ জাহান্নামে নিক্ষেপ করে"।[২২২]

---

[২২০] আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০১০, খ. ২, হাদীস নং- ২২১৭, পৃ. ৪৩৯

[২২১] সূরা আল-আল-আনআ'ম, আয়াত : ১১৯

[২২২] *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৪০১, পৃ. ১৩২

৩.৬.২০.২. অধিক লোভ-লালসা বর্জন করা

সম্পদ অর্জনে অবশ্যই লোভ-লালসাকে বর্জন করতে হবে। লোভ-লালসা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এ থেকে বিরত থাকার জন্য আল কুরআনে বিশেষভাবে তাকীদ দেয়া হয়েছে-

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে"।[২২৩]

৩.৬.২০.৩. অভিশপ্ত সুদ বর্জন করা

সুদ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা রাখা যাবে না। কেননা কুরআনে এসেছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

> হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপর যুলুম করা হবে না।[২২৪]

সুদ মানব সমাজে গরীবকে আরো গরীব করে। সুদের মাধ্যমে পরিশ্রম ছাড়া উপার্জনের সুযোগ থাকায় সমাজের সম্পদশালী লোকেরা তাদের সম্পদ কোন উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করবে না। এতে মানুষের কর্মসংস্থান পথ বাধাগ্রস্থ হবে এবং সুদী কারবারে জড়িত পুঁজিপতিদের কাছে সমাজ জিম্মি হয়ে পড়বে। তাই ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সমাজে আত্মনির্ভরশীলতার পথ সুগম হবে।

৩.৬.২০.৪. কোন ধরনের যুলুম বা অত্যাচার না করা

ইসলামে যে কোনো ধরনের যুলুম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা যুলুমের ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। সেজন্য তা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীসে এসেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ ، وَلاَ مَتَاعَ لَهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ ، فَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا ، فَيَقْعُدُ ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

> তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে

---

[২২৩] সূরা আত-তাকাছুর, আয়াত : ১-৩

[২২৪] সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ২৭৮-২৭৯

আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২২৫]

৩.৬.২০.৫. ঘুষের লেনদেন বন্ধ করা

ঘুষ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা রাখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ .

"রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়কে লানত দিয়েছেন"।[২২৬] তাই ব্যক্তিগত ভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বস্তরে ঘুষের লেনদেন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৩.৬.২০.৬. সর্বত্র খেয়ানত বন্ধ করা

খেয়ানতের মাধ্যমে যে উপার্জন করা হয় তা অবৈধ। তাই সকল প্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্মান নষ্ট করা তোমাদের জন্য হারাম"।[২২৭]

৩.৬.২১. হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিক সমূহ

৩.৬.২১.১. আল্লাহর নির্দেশ অবজ্ঞা করার শামিল

আল্লাহ তা'আলা কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে হারাম পথ বেছে নিবে সে আল্লাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা করলো এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলো। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল উপায় অবলম্বন করতে হবে। যারা হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাদের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন-

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

"মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোনো উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করবে না"।[২২৮]

---

২২৫ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৩৪৩, পৃ. ১১৪

২২৬ *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৫৪২, পৃ. ৪৪৪

২২৭ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৬৩০, পৃ. ১৬৫

৩.৬.২১.২. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

হারাম উপার্জন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম"।[২২৯]

৩.৬.২১.৩. জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক

হারাম উপার্জন জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। এ বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

"হে কা'ব ইবন উজরাহ, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তা জান্নাতে যাবে না"।[২৩০]

৩.৬.২১.৪. হারাম উপার্জন যালিমের হাতিয়ার

যখন সমাজে হারাম উপার্জন করার সুযোগ থাকে তখন যুলুম-নির্যাতন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। আর যুলুমের মাধ্যমে অসহায় মানুষ নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ যুলুমের মাধ্যমে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে"।[২৩১]

৩.৬.২১.৫. হারাম উপার্জনের দান আল্লাহ গ্রহণ করেন না

হারাম উপার্জন এমন খারাপ জিনিস যা থেকে দান করলেও কোনো লাভ নেই এবং আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করেন না। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না, আর হারাম উপার্জনের দানও আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না"।[২৩২]

---

২২৮ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৩১, পৃ.১১

২২৯ নাসির উদ্দীন আলবানী, *সহীহ জামিউস সাগীর*, খ. ২, হাদীস নং- ৮৬৪৮, পৃ. ৮৩১

২৩০ আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন আল-ফাদল বিন বাহরাম বিন আবদ আল-সামাদ আল-দারেমি সমরকন্দি, *সুনান আদ দারেমী*, করাচী : কদেমি কুতুবখানা, তা. বি., খ. ২, হাদীস নং- ২৭৭৬, পৃ.৪০৯

২৩১ সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১০

২৩২ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুজাইমাহ আস-সুলামী আন-নিসাপুরী, *সহীহ ইবন খুযাইমাহ*, বৈরুত : আলমাকতাবুল ইসলামী, তা. বি., খ. ১, হাদীস নং- ১০, পৃ. ৫০

৩.৬.২২. আত্মনির্ভরতা অর্জনে পরনির্ভরশীলতা পরিহার করা

ইসলাম পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে স্বনির্ভরতা অর্জনে উৎসাহিত করেছে। হযরত রাসূল (সা.) মানবতাকে হীনতম অবস্থা থেকে সম্মানজনক অবস্থায় সমাসীন করার লক্ষ্যে ভিক্ষুকের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আত্মনির্ভরশীলতার জন্য মহানবী (স.) থেকে একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে- ভিক্ষুকের শেষ সম্বল কম্বল বিক্রয় করে কুড়াল ক্রয় করে দিয়ে স্বনির্ভরতার দীক্ষা প্রদান করেছেন। বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে স্বাবলম্বীতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের যথার্থ দিক নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম জাতিকে হীনমানসিকতা ও দুর্দশা থেকে মুক্তির নিমিত্তে এ বিষয়ে জ্ঞার্নাজন বিশেষ প্রয়োজন।

পরনির্ভরশীলতা বিশ্ব মানবতার জন্য অভিশাপ। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারে। এমনকি দারিদ্রতা মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে। এ জন্য প্রায় সবসময় আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ তুমি আমার খাদ্যে বরকত দাও, আর আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায রোযা করতে পারবো না। আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্য পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না"।[২৩৩]

পরনির্ভরশীলতা হল রক্তশূন্যতা বিশেষ। অর্থ সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে যা রক্ত করে মানুষের দেহের জন্য। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে মানুষের দেহে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপ সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে।[২৩৪] তা যেমন ব্যক্তি জীবনে বিপর্যয় সুষ্টি করে তেমনি করে সামষ্টিক জীবনে। কারণ মানুষের আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয় জন্ম মুহূর্ত থেকেই। অর্থ সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি মান-মর্যাদা থাকে না তেমনি পরনির্ভরলশীল জাতিও বিশ্ব জাতি সমূহের সামনে সম্মান সম্ভ্রম থেকে হয় বঞ্চিত। এ বঞ্চনা ও অবমাননা হতে মুক্তির লক্ষে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। মহানবী (সা.) রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর সামনে এক উজ্জ্বল শিক্ষা ও আদর্শ।

৩.৬.২৩. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে আবাসন ব্যবসা

৩.৬.২৩.১. ইসলামের দৃষ্টিতে আবাসন

ইসলাম মানুষের আত্মিক ও পার্থিব উভয় দিককেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। বাসস্থান নির্মাণ করা মানুষের জীবন যাপনের অত্যাবশকীয় উপাদান। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না"।[২৩৫]

দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জিবনেও নিরাপদে, সুখে, স্বাচ্ছন্দে বসবাসের জন্য সুন্দর একটি বাড়ি মানুষের জীবনে লালিত স্বপ্ন, প্রশান্তির লাভের জায়গা, সর্বোপরি এটি মহান আল্লাহর অপার নিয়ামত যা তিনি বান্দাহকে দান করেন। আল্লাহ বলেছেন,

> এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্যে পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা একে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। এবং তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন এদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ। এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাহতে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার

---

২৩৩ আহমাদ শালাবী, *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো : দারুল আরব, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ৫৩০

২৩৪ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৩১৬

২৩৫ সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৭৭

> ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্যে পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্যে বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।[২৩৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের বাসস্থানের কথা সহ জীবনধারণের নানা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

বাড়ি নির্মাণ কাঠ, বাঁশ যাই হোক বা ইট, সিমেন্ট, রড়ের হোক যে কোন উপায়ে বসবাসের বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে তাতে অগনিত লোকের কর্মসস্থানের সৃষ্টি হয়। ইট, সিমেন্ট, রড, বা কাঠ যাই হোক এ গুলো উৎপাদন, প্রস্তুত, ডিজাইন করা, নির্মাণ করা, রং করানো, প্রয়োজনীয় কাঠের ফার্নিচার তৈরি সহ একটা বাড়িতে অনেক আসবাব পত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যার ব্যবস্থাপনা করতে অনেক মানুষের শ্রম বিনিয়োগ করে উপার্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পেশায় অগণিত মানুষ জড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে বাড়ি নির্মাণের কাজে অনেক ডেভেলপার কোম্পানী বাড়ি করার উপযোগি করে জায়গা, কোন কোন কোম্পানী সরাসরি বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছে। এটি একটি লাভ জনক হালাল ব্যবসা। এই খাতে অগণিত অশিক্ষিত, শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, লোকজন দিন-রাত কাজ করে জিবিকা নির্বাহ করছে। আত্মনির্ভরশীলতার এ সম্ভাবনাময় খাতে সরকারি তদারকির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।

৩.৬.২৩.২. স্থাপত্য নির্মাণে ইসলাম

স্থাপত্য শিল্প মানবজীবনে অতি প্রয়োজনীয় একটি শিল্প। বর্তমানে সারা বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গড়ে উঠছে পর্বত সমান নানান অট্টালিকা ও সুউচ্চ স্থাপনা। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য সমূহ পর্যালোচনা করে আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

স্থাপত্য শিল্পের পরিচয়

স্থাপত্য একটি শিল্প, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক না থাকলেও এর সংজ্ঞা নিয়ে স্থাপত্যবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থাপত্য শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়। স্থাপত্যকে এ কারণেই সব শিল্পকর্মের উৎস বা Mother of all arts বলা হয়েছে।[২৩৭] স্থাপত্যের সংজ্ঞায় কোন কোন ঐতিহাসিক যে কোন নির্মিত বস্তুকে স্থাপত্য বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ সুদৃঢ় ও সুশোভিত প্রাসাদকে স্থাপত্য বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৩৮] স্থাপত্য শিল্প বুঝাতে ইংরেজিতে অৎপযরঃবপঃঁৎব পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। যার আভিধানিক অর্থ হলো, ভবনের নকশা বা নির্মাণ-কৌশল বা নির্মাণ রীতি।[২৩৯] প্রফেসর ডব্লিউ. আর লেথাবি (ড. জ. খবঃযধনু) স্থাপত্যের সংজ্ঞায় লিখেছেন, অৎপযরঃবপঃঁৎব রং ঃযব ঢ়ৎধপঃরপধষ ধৎঃ

---

২৩৬ সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৮০-৮১

২৩৭ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ১৭

২৩৮ ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, *স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮, পৃ. ১০০

২৩৯ 'Zillur Rahman Siddiqui edited, *Bangla Academy English-Bengali Dictonary,* Dhaka : Bangla Academy, 2008, p. 37'

ড়ভ নঁরষফরহম ঃড়ঁপযবফ রিঃয বসড়ঃরড়হ, হড়ঃ ড়হষু ঢ়ধৎঃ, নঁঃ হড়ি ধহফ রহ ঃযব ভঁঃঁৎব.[২৪০] যদিও স্থাপত্য বলতে কেবল ইমারতেকেই বোঝায় না, কারণ ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণ প্রক্রিয়া ছাড়াও অসাধারণ ভাস্কর্য চিত্রকলা এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা বুঝায়।[২৪১]

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক; নেতিবাচক নয়। ইসলাম মুসলিমদের স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের অনুমোদন দেয়। তাতে শৈল্পিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর অনুমোদনও দেয়। বাড়িঘর এবং অট্টালিকা কারুকার্যময় করার অনুমতিও দেয়। তবে তা সবই হতে হবে অহঙ্কার প্রকাশ না করার ও বিলাসিতা প্রকাশ না করার শর্তে এবং অপব্যয় ব্যতিরেকে। আল কুরআন এবং মহানবীর হাদীসে এর প্রতি বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল-কুরআনে হুসুন[২৪২] বা কিল্লা, সায়াসি[২৪৩] বা দুর্গ, বুরুজ[২৪৪] বা উচ্চ অট্টালিকা ও দুর্গ, কুসুর[২৪৫] বা অট্টালিকা, গুরুফ,[২৪৬] বা কক্ষ, জুদুর[২৪৭] বা দেয়াল, কুরা মুহাস্সানা[২৪৮] বা সুরক্ষিত জনপদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়েছে।[২৪৯] যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর"।[২৫০] অর্থাৎ তোমরা সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গে অবস্থান করলেও তোমাদের মৃত্যু অবশ্যই আসবে। তোমরা মৃত্যু থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না, পালাতে পারবে না। এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা ও তাতে বসবাস করা বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেন, "তাকে বলা হলো, প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর। অতঃপর যখন সে তা দেখল, সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং তার পায়ের নলাদ্বয় অনাবৃত করল। সুলাইমান বললেন, এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ"।[২৫১] এ আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, অতি উচ্চমানের শিল্পসম্মত সুরম্য বাড়ি ও প্রাসাদ নির্মাণ করা বৈধ। কারণ হযরত সুলাইমান (আ.) একটি স্বচ্ছ কাঁচের উচ্চ মানের শিল্প সম্মত প্রাসাদ নির্মাণ করে তার তলদেশ দিয়ে পানি প্রবাহিত করেন। তা এমন সুকৌশলে নির্মাণ করেন যে, যারা এর সম্পর্কে অবগত নয়, তারা মনে করে যে, তা পানি। অথচ পানি এবং পথচারীর মধ্যে স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ রয়েছে। ফলে তার পায়ে পানি লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, সুলাইমান (আ.) নির্মিত এ প্রাসাদটিতে অতি উচ্চমানের শিল্প নৈপুণ্যের সমাবেশ ঘটেছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, এ জাতীয় শিল্পমানের প্রাসাদ তৈরি করা এবং প্রাসাদকে কারুকার্যময় করা, তাতে বসবাস করা ইসলামে বৈধ।

---

২৪০ 'W. R. Lethaby, Architecture, London : Macmillan and co., 1892, p. 8; উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

২৪১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২৪২ সূরা আল-হাশর, আয়াত : ২

২৪৩ আল-আহযাব, আয়াত : ২৬

২৪৪ সূরা আল-বুরূজ, আয়াত : ১

২৪৫ সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ৭৪

২৪৬ সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৭৫

২৪৭ সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৪

২৪৮ সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৪

২৪৯ ড. হাসান আল বাশার, মাদখাল ইলাল আসার আল ইসলামিয়া, কাহেরা : দারুণ নাহদা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ২১

২৫০ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৮

২৫১ আন-নামল, আয়াত: ৪৪

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনি সহ সকল নবী-রাসূলকে একটি সুউচ্চ ও সুন্দর অট্টালিকার সাথে তুলনা করে বলেন, "তারা বললো, এ প্রাসাদের নির্মাণ কৌশল কতোই না চমৎকার হতো, যদি তাতে এই ইটটি বসানো হতো!"[২৫২] অট্টালিকা নির্মাণ বৈধ না হলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো নবী-রাসূলগণকে এবং মুসলিমদের অবৈধ ও হারাম একটি জিনিসের সাথে তুলনা করতেন বলে মনে হয় না।

সাহাবীদের পরে তাবিয়ীন, তাবে-তাবিয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে এবং তার পরবর্তী যুগেও মুসলিমরা পৃথিবীর সর্বত্র নির্দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। দুর্গ গড়ে তুলেছেন। ইসলাম সৌন্দর্যকে নিরুৎসাহিত করেনি বরং উৎসাহিত করেছে। সুন্দরের ব্যাপারে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنةً، فَقَالَ :إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

> আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেনঃ "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললেন, একজন ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা হোক চমৎকার। তিনি বলেছেন, আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্য পছন্দ করেন, প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করে"।[২৫৩]

ইসলাম সব সময় সত্য ও সুন্দরের পক্ষে। আর এটা বর্তমানে একটি আধুনিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। যেখানে অগিণত মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। এই খাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ করে দিলে এর মাধ্যমে অসংখ্য বেকার কর্মেও মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাবে।

৩.৬.২৪. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে শ্রম

৩.৬.২৪.১. শ্রমের পরিচয়

শ্রম শব্দের আভিধানিক অর্থ মেহনত, দৈহিক খাটুনী, শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি। অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রম বলা হয়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম-প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।[২৫৪]

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রমের পরিচয় প্রদানে বলা হয়ে থাকে, "মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সকল কায়িক ও মানসিক শক্তিকে শ্রম বলে"। বাহ্যত এ শ্রম উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হোক কিংবা পারিশ্রমিক না থাকুক অথবা সে পারিশ্রমিক নগদ অর্থ হউক কিংবা অন্য কিছু এবং শ্রমের পার্থিব মূল্য না থাকলেও পারলৌকিক মূল্য থাকবে।[২৫৫]

---

২৫২ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ খ্রি., খ. ১৫, হা. নং- ৯৩৩৭, পৃ. ১৯৪

২৫৩ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-২০১০, খ. ১, হা. নং ১৬৭. পৃ. ১৩৬

২৫৪ ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২৬৮

২৫৫ সম্পাদনা পরিষদ, *মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি., পৃ. ১২২

আরবীতে 'আল আমালু' শব্দের অর্থ হল কাজ, যিনি কাজ করেন তাকে আমেল বা শ্রমিক বলে, আর মালিক শব্দটি আরবী যা বাংলা ও আরবীতে সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়, এর অর্থ হল মালিক বা অধিকারী, স্বত্তাধিকারী, ইংরেজীতে শ্রমের প্রতিশব্দ labour, work, আর শ্রমিকের প্রতিশব্দ হল worker। ইসলামের পরিভাষায় মানুষ জীবন ধারনের জন্য যে সব কাজ করে থাকে শ্রম বলে। মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার, অপরের কল্যাণের এবং সৃষ্ট জীবের উপকারের জন্য যে কাজ করে তাই শ্রম। মানুষ জীবন ধারনের জন্য বৈধ পন্থায় যে সকল কাজ করে থাকে তাকেই বলা হয় শ্রম ।

সাধারণ অর্থনীতিতে পারিশ্রমিক বিহিন কোন কাজই শ্রম নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক শর্ত নয়। সাধারণ অর্থনীতিতে যে কাজে আনন্দ আছে তা শ্রম নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সৃষ্টির সেবা, নৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি যে কোন কার্য যদিও আনন্দদায়ক হয়ে থাকে সবই শ্রম।

ইসলামী অর্থনীতিতে জনকল্যাণ বিরোধী কোন কাজই শ্রম হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতিতে এরূপ কোন শর্ত নেই। তাই এই শাস্ত্রের জন্য অনিষ্টকর কাজ শ্রম, যদিও তাতে পরিশ্রমিক থাকে।

৩.৬.২৪.২. শ্রমের প্রকারভেদ

ইসলামে শ্রমকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে -

ক. শারীরিক শ্রম

শারীরিক বা কায়িক শ্রম হলো পুঁজিবিহীন জীবিকা অর্জনের জন্য দৈহিক পরিশ্রম। যেমন রিক্সাচালক, দিনমজুর ও শ্রমজীবীদের দৈনন্দিন পরিশ্রম। শারিরীক বা কায়িক শ্রম হলো মানুষের পুঁজিবিহীন জীবিকা অর্জনের আসল মাধ্যম।

খ. শৈল্পিক শ্রম

শৈল্পিক শ্রম বলতে বুঝায়, যে কাজে শিল্প ও কৌশলবিদ্যাকে অধিক পরিমাণে খাটানো হয়। যেমন, অংকন, হস্তশিল্প, স্থাপনা ইত্যাদি।

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম

বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সকল পুঁজিহীন শ্রমকে বুঝায়, যেগুলোতে দেহের চেয়ে মস্তিষ্ককে বেশি খাটানো হয়। যেমন, শিক্ষকতা, ডাক্তারী, আইন পেশা ইত্যাদি।[২৫৬]

৩.৬.২৪.৩. ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন

ইসলাম একটি আদর্শ ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। মানূষের প্রয়োজনীয় সকল দিক বিভাগের বর্ণনা একমাত্র ইসলাম প্রদান করেছে, একটি সমাজ, রাষ্ট্র, ও প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে শ্রমের কোন বিকল্প নেই, পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উন্নতি, বিকাশ, মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে একমাত্র শারিরীক ও মেধাশ্রমের মাধ্যমে। শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষ উপার্জন করে থাকে। আর সেই উপার্জনের অর্থ বা সম্পদ দিয়ে নিজেকে আত্মনির্ভর করে তোলে। তাই আত্মনির্ভরশীলতার জন্য শ্রম ও শ্রমিকের সঠিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম ছাড়া আর কোন মতাদর্শ দিনমজুর, দাসদের এবং শ্রমের ক্ষেত্রে এত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেনি। মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) একজন ক্রীতদাসকে অভিজাত

---

[২৫৬] ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

মানুষের কাতারে তুলে এনেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এই ক্রীতদাসরা। ইসলামে যেহেতু মালিক শ্রমিকে কোন তফাৎ নেই, তাই সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ মানবীক অধিকার ফিরে পেতে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল দারুণভাবে। ইসলামের জ্ঞানার্জনের পথেও এই ক্রীতদাসরাই অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। কুড়িয়ে নিয়েছিলেন অভিজাতদের চেয়েও অনেক সম্মান। তাই দাস শ্রেণি থেকে উঠে আসা ইবনে মোবারকের আগমনে ব্যাপক মানুষের উপস্থিতির শোরগোল কম্পন সৃষ্টি করেছিল বাদশাহ হারুনের রাজমহলেও।

আজ বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো-শ্রমিকেরাই ইসলামের সৌন্দর্যের ছায়া থেকে অনেক দুরে। ফলে তারা চরম নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। শ্রমিকরা পাচ্ছেনা কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ, কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক বেতন কাঠামো, ব্যাপক সময় কাজ করেও সঠিক মূল্যায়ন, অপর দিকে নানাভাবে শারিরীক ও মানষিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, বিশেষ করে গৃহ শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র প্রতিনিয়ত আমরা পত্রিকা, মিডিয়ার কল্যাণে দেখতে পাই, শুনতে পাই, অথচ তারাও আমাদের মত মানুষ এ কথাটিই যেন ভুলেই গেছি আমরা। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গৃহের কর্মচারীকে তার কাজে সাহায্য করতেন, এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের মত মনে করতেন, বর্তমান বিশ্ববাসী শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য প্রতি বছর ১লা মে বিশ্বব্যাপি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মে দিবস তথা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিবস পালন করছে, কিন্তু আজও আমরা কি তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি? আমরা কি পেরেছি তাদের মৌলিক অধিকার পূরণ করতে? যা পেরেছি তাতে তাদের হাড্ডিসার বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আমরা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শ্রম ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে শ্রমিক তার শ্রমের সঠিক মূল্য ও অধিকার ফিরে পেয়ে সে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য তার কর্মস্থলে মন প্রাণ উজাড় করে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে কাজ করবে, মালিকও তাকে তার কাজের সহযোগি হিসেবে মনে করে আপন ভাইয়ের মত মনে করবে। ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজে গতি ফিরে আসবে। দুর হবে শ্রমিক অসন্তোষ, হরতাল, অবরোধ, মারামারি ও কলকারখানায় ভাঙচুর। অর্থনৈতিক চাকা হবে গতিশীল। সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করার নিশ্চয়তা পাবে।

৩.৬.২৪.৪. শ্রমিকদের আত্মনির্ভর করতে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে মজুরগণ যাতে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে, মজুর আন্দোলনকে সেই জন্য যত্নবান হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শ্রমিক আইন এর পরিবর্তন ও সংশোধন সূচিত করা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময়ের পরিমাণ হ্রাস, সাধারণ জীবনযাপনের মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের শিশু সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করণ এবং সেই সঙ্গে মজুর সংগঠনের এবং সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা চালাতে হবে। মজলুমের সাহায্য ও জুলুম প্রতিরোধের জন্য বীর দর্পে এগিয়ে আসতে হবে। সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক শ্রমজীবী যাতে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার পেয়ে জীবনযাপন করতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর গোটা আন্দোলনকে এমন প্রকৃতিতে গড়ে তুলতে ও চালাতে হবে যে, তাতে যাবতীয় দাবি দাওয়াকে সংঘর্ষের পরিবর্তে একই সমাজের দুইটি শ্রেণির পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির পর্যায়ে রেখে সকল দাবি-দাওয়া আদায় ও সকল সমস্যার সমাধানের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পথ উন্মুক্ত হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এক নবতর আদর্শবাদী শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। বর্তমান শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ শ্রমজীবীগণের আশু দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৩.৬.২৪.৫. শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় করণীয়

শ্রমিকদের হারানো অধিকার ফিরে পেতে হলে প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। একমাত্র ইসলামই পারবে তাদের সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের সোনালী যুগে মালিক-শ্রমিক পরস্পরে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কায়েম হয়ে ছিল মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক। আন্দোলন বা সংগ্রাম করে নয় বরং ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত মালিকরাই প্রাপ্যের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছিল শ্রমিকদেরকে। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) তার গোলামের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একই পোশাক পরিধান এবং হযরত ওমর (রা.) তার গোলামের সঙ্গে পালাক্রমে উটের পিটে চড়ে মরুভূমি অতিক্রম সে কথাই প্রমাণ করে। প্রতি বছর মে দিবস আসে, গতানুগতিক ধারায় পালিত হয়। শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে এ দিনে শোভাযাত্রা, মিটিং, মিছিল, জনসভা, শ্রমিক সমাবেশ, ঘোলটেবিল আলোচনা, মাতামাতি হয় অনেক। কিন্তু দিনটি চলে গেলে হতভাগ্য শ্রমিকদের নিয়ে আর গরজ বোধ করে না কেউই। এভাবে হাজারো মে দিবস অতিবাহিত হলেও আদায় হবে না এ দিবসের প্রকৃত দাবি। তাই শ্রমিকদের অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সম্মিলিতভাবে ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণ করতে হবে। এতেই রয়েছে মালিক-শ্রমিক উভয়ের সাফল্যের হাতছানি। শ্রমিকের অধিকার আদায়ে ইসলাম নিম্নোক্ত নীতিমালা গ্রহণ করেছে-

(ক) শ্রমজীবী মানুষদেরকে হযরত রাসূল (সা.) মালিক-পুঁজিপতিদের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই সমাজে সে ততটুকু পদমর্যাদা ও সম্মান পাবে, যা সমাজের অন্য সদস্যরা পেয়ে থাকে। পেশার কারণে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না।

(খ) শ্রমিক যে প্রতিষ্ঠান বা মালিকের কাজ করবে তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকের মৌলিক প্রয়োজন সমূহ পূরণ করা।

(গ) কোনো শ্রমিকের উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

(ঘ) কাজ শেষ হলে পারিশ্রমিক আদায়ে কোনো ধরনের গড়িমসি করা চলবে না।

(ঙ) শ্রমজীবীদের সহায়তার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সহজ সুদ বিহীন কিস্তিতে ঋণ দিতে হবে।

(চ) একজন শ্রমিক ইচ্ছা করলে মালিকের সঙ্গে মূলধনে শরীক হতে পারবে। উল্লেখিত নীতিমালা সমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম শ্রমিকের সর্বোচ্চ ও যথাযথ অধিকার দিয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদে কল্পনাও করা যায় না।

এ কথা হলফ করেই বলা যায় যে, দুনিয়ার কোথাও শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি এবং তাদের বাঁচার উন্নত পরিবেশ এখনও কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিকের মেহনতের কষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। সে জন্য তিনি যে ঐশ্বরিক বিধান চালু করেছিলেন তাতে শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর অমোঘ বাণী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আজও সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে অতুলনীয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ককে ভাই ভাই উল্লেখ করে তিনি তাদের অধিকার ও পাওনার ব্যাপারে যে উক্তি করেছিলেন তা অসাধারণ। মহানবী (সা.) বলেছেন, "মজুর-শ্রমিকও ভৃত্যদের যথারীতি থাকা ও পোশাক দিতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে

দিয়েছেন"।[২৫৭] মহানবী (সা.) শ্রমিককে আপনজনের সাথে তুলনা করে বলেছেন, তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে যেমন ব্যবহার কর, তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে । ইসলামের আলোকে শ্রমিক-মালিকদের তাদের প্রাপ্য অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে আশা করা যায় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে তারাও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাবে।

৩.৬.২৫. ইসলামে শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার

শ্রম ও শ্রমিক পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রম হলো, শারীরিক ও মানসিক কসরতের মাধ্যমে কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়া। যিনি কাজটি আঞ্জাম দেন তিনি শ্রমিক এবং যে কাজটি সম্পন্ন করা হয় তা উৎপাদন। সাধারণত পুঁজিহীন মানুষ, যারা তাদের পুঁজি বিনিয়োগের উপায় না থাকায় নিজেদের গতর খেটে পেট চালান, তাদের শ্রমিক ও তাদের কাজকে শ্রম বলা হয়। শ্রমিক পুঁজিহীন, দরিদ্র শ্রেণির লোক বলে তাদের মধ্যে কোনোরূপ লজ্জাকর অনুভূতি ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কাজে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও লজ্জার ব্যাপার নয়; বরং এ হচ্ছে নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। প্রত্যেক নবী-রাসূলই দৈহিক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন বলে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "যখন তোমাদের সালাত শেষ হয়ে যাবে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজক) অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে যাও"।[২৫৮]

ইসলাম সৎ উপার্জনের দিকে যেমন উৎসাহিত করেছে, তেমনি উৎসাহিত করেছে শ্রমের প্রতি। পক্ষান্তরে শ্রম না দিয়ে অলস ও বেকার বসে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ।

প্রসঙ্গত এখানে এটা প্রণিধানযোগ্য যে, আধুনিক অর্থনৈতিক মতাদর্শ শ্রমকে কেবল মানুষের পার্থিব জীবন ও তার উপায়-উপকরণের তুলাদন্ডে বিচার করছে। তারা শ্রম দ্বারা মানুষের সেই মেধাগত ও শারীরিক অনুসন্ধানকেই কেবল উদ্দেশ্য করেছে, যার বিনিময়ে সে শুধু পয়সাই পায়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর অর্থনৈতিক মতাদর্শের আলোকে শ্রম হলো, পার্থিব জীবনে মেহনত করে পরকালীন জীবনকেও এর দ্বারা নির্মাণ করা। সুতরাং একজন মুসলমান শারীরিক বা মেধাগত যেকোনো বৃত্তেই শ্রম ব্যয় করুক, সে এর প্রতিদান দুনিয়াতে পয়সার বিনিময়ে এবং আখিরাতে সওয়াবও বিনিময়ে জান্নাত পাবে। তাই মহানবী (সা.)-এর আদর্শের আলোকে নির্দেশিত অর্থনীতির ভিত্তিতে শ্রমের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায়, শ্রম ওই মেধাগত ও শারীরিক কর্মবৃত্তির নাম, যার বিনিময়ে এই পার্থিব জীবনে এমন বস্তুগত প্রতিদান অর্জিত হয়, যার দ্বারা মানুষ তার নিজের, তার আপনজনের এবং সমাজের অভাবী লোকদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে পারে এবং জীবিকা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত হয় অথবা এর বিনিময়ে পুণ্য অর্জিত হয়, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্যই সফলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যম হয়।[২৫৯]

৩.৬.২৫.১. শ্রমের মজুরি প্রাপ্তির অধিকার

শ্রম গ্রহীতার কাঁধে যেসব বাধ্যবাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমের মূল্য বা মজুরি। ইসলাম এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমরা দেখেছি ইসলাম কিভাবে কাজ বা শ্রমকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। কিভাবে একে সকল ইবাদতের উপর স্থান দেয়। যে ভাই তার অপর আবেদ (শ্রমিক) ভাইয়ের পক্ষ নেয় তাকে তার চেয়ে আবেদ আখ্যা দেয়। আর শ্রমের এই পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ইসলাম শ্রমিকের মজুরি বা পারিশ্রমিককেও পবিত্র ঘোষণা করে। উদ্বুদ্ধ করে যাতে সকল শ্রমিককে তার শ্রমের মূল্য পরিশোধ করা হয়। পবিত্র কুরআনে দেড়শ স্থানে 'আজর' তথা শ্রমের মূল্য বা বিনিময়

---

২৫৭ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২৩৭৭, পৃ. ৩১৫-৩১৬

২৫৮ সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত : ১০

২৫৯ মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ, *ইসলামের শ্রমিকের অধিকার*, ঢাকা : পাথেয় পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৪১

শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। সবগুলোই কর্মজীবনে পারস্পরিক বিনিময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে অধিকাংশ অর্থে তা বিবৃত হয়েছে পার্থিব জীবনের নানা পর্বে-অনুষঙ্গে এবং তার স্বল্পদৈর্ঘ স্থায়ীত্ব বিষয়ে। কর্মজীবনের নানা বিনিময়ের অর্থে এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীসে ব্যাপকহারে বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"বল, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি, বরং তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর নিকট এবং তিনি সব কিছুর উপরই সাক্ষী"।[২৬০] আরেক জায়গায় হযরত শুআইব ও হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনার বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

"অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বলল যে, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে"।[২৬১] এই দুই দৃষ্টান্তে আজর বা প্রতিদান শব্দটি আমাদের মাঝে প্রচলিত কষ্ট বা শ্রমের বিনিময় কিংবা সেবার মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি পবিত্র কুরআনে আমলের সঙ্গে সঙ্গে আজর বা প্রতিদানের কথাও বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"আর সকলের জন্যই তাদের আমল অনুসারে মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ যেন তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিতে পারেন। আর তাদের প্রতি কোন যুলম করা হবে না"।[২৬২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিদান।[২৬৩] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস সমগ্রে নজর দিলেও আমরা আমলের সঙ্গে আজর তথা কর্মের সঙ্গে প্রতিদানের কথা পাশাপাশি দেখতে পাই। এসব শব্দের সবগুলোই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থবোধক। যেমন, ইবন হাযম (রহ.) বলেন, যে আয়াতগুলোয় আমল ও আজর তথা প্রতিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে সবগুলোই শুধু ধর্মীয় কাজের সঙ্গে বিশিষ্ট নয়, বরং তা যে কোনো ধরনের কাজ-কর্মের ব্যাপক ও বিস্তৃত একটি নিয়ম। চাই তা দুনিয়াবী কাজ হোক অথবা আখেরাতের আমল হোক।

৩.৬.২৫.২. পূর্বশর্ত অনুযায়ী মজুরি প্রাপ্তির অধিকার

শ্রম গ্রহীতার জন্য জরুরী হলো শ্রমিককে সেই অধিকারগুলো প্রদান করা যার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। তাতে হ্রাস বা বিয়োগের চেষ্টা না করা। কারণ, তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনার মতো জুলুম।

---

[২৬০] সূরা সাবা, আয়াত : ৪৭

[২৬১] সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ২৫

[২৬২] সূরা আল-আহকাফ, আয়াত : ১৯

[২৬৩] সূরা আত-তীন, আয়াত : ৬

শ্রম গ্রহীতার জন্য আরও জরুরী শ্রমিকের কাজের তীব্র প্রয়োজনের সুযোগের অসৎ ব্যবহার করত তাকে তার অধিকারে না ঠকানো এবং একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রাপ্য মজুরির তুলনায় তাকে ধোঁকা দিয়ে কম নির্ধারণ না করা। কেননা ইসলাম সর্বপ্রকার ধোঁকা ও প্রতারণাকে হারাম ঘোষণা করেছে। বাস্তবায়ন করেছে ক্ষতি করব না আবার ক্ষতির শিকারও হব না নীতি। একইভাবে তার জন্য আরও জরুরী, শ্রমিকের পাওনা হেফাযত করা যখন সে অনুপস্থিত থাকে কিংবা এর কথা ভুলে যায় এবং কাজ শেষ কিংবা নির্ধারিত মেয়াদ পূরণ হবার পর মজুরি দিতে টালবাহানা বা বিলম্ব না করা। তেমনি চুক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশি কাজ করলে তার (অতিরিক্ত) বিনিময় প্রদানে ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ না হওয়া। কেননা আল্লাহ আমাদেরকে প্রত্যেক শ্রমের মর্যাদা দিতে বলেছেন। সব কাজের প্রতিদান দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর"।[২৬৪]

হাদীসে হযরত রাসূল (সা.) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

"ধনী ব্যক্তির (পক্ষ থেকে কারও পাওনা প্রদানে) টাল-বাহানা করা জুলুম; আর যখন তোমাদেরকে কোনো কাজ আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত করা হয়, তখন সে যেন তার অনুসরণ করে"।[২৬৫]

অপর হাদীসে এসেছে,

قَالَ اللهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

"আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না"।[২৬৬] অপর হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "শ্রমিককে তার শ্রমের প্রাপ্য তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই প্রদান কর"।[২৬৭]

৩.৬.২৫.৩. স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিতে বাধ্য না করার অধিকার

শ্রম গ্রহীতার জন্য জরুরী হলো শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিংবা কাজে অক্ষম বানানোর মতো কাজে তাকে বাধ্য না করা। হযরত মূসা (আ.) কে নিজ সম্পদের তত্ত্বাবধানের কাজ বুঝিয়ে দেবার সময় যেমন আল্লাহর নেক বান্দাহ বলেছিলেন,

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

---

[২৬৪] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত : ১

[২৬৫] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২১৪২, পৃ. ১২৮-১২৯

[২৬৬] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২০৮৬, পৃ. ৮৮

[২৬৭] *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ২৪৪৩, পৃ. ৪০১

"আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে"।[২৬৮] শ্রম গ্রহীতা যখন তার প্রতি এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয় এবং যার ফলে পরবর্তীতে তার স্বাস্থ্য বা ভবিষ্যতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তবে তার অধিকার রয়েছে চুক্তি বাতিল কিংবা বিষয়টি দায়িত্বশীলদের কাছে উত্থাপন করার। যাতে করে তারা তার উপর থেকে শ্রম গ্রহীতার অনিষ্ট রোধ করেন।

৩.৬.২৫.৪. কর্মে বহাল থাকার অধিকার

শ্রম গ্রহীতার অনুমতি নেই যে তিনি কাজ চলাকালে হওয়া কোনো রোগ বা বার্ধক্য হেতু উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় শ্রমিককে তার কাজ থেকে অব্যাহতি দেবেন। সাধারণ নিময় হলো, শ্রমিক যখন কোনো মালিকের সঙ্গে কাজের চুক্তিতে আবদ্ধ হন আর সে তার কাজে নিজের যৌবন কাটিয়ে দেয়। অতপর বার্ধক্য হেতু তার কর্মোদ্যমে অবসন্নতা বোধ করে তাহলে শ্রম গ্রহীতা তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারেন না। বরং তার করণীয় হলো, শ্রমিকের বার্ধক্যকালীন উৎপাদনেও তেমনি সন্তুষ্ট হওয়া যেমন সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি তার যৌবন ও সামর্থ্যকালে।

৩.৬.২৫.৫. আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার

শ্রম গ্রহীতার আরেকটি কর্তব্য হলো, শ্রমিকের সম্মান রক্ষা করা। অতএব তাকে কোনো অবমাননা বা লাঞ্ছনাকর কিংবা দাস সুলভ কাজে খাটানো যাবে না। ইসলাম এবং ইসলামের মহান ব্যক্তিদের জীবনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে সমানাধিকারের মূলনীতিকে সমর্থন করে। যেমন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রমিক ও কাজের লোকের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন। তার কাজের বোঝা লাঘবে সরাসরি সহযোগিতা করতেন। তেমনি শ্রমিককে প্রহার বা তার উপর সীমালঙ্ঘনেরও অনুমতি নেই। যদি তাকে প্রহার করে তবে তাকে এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩.৬.২৫.৬. আল্লাহর বিধান পালনের অধিকার

শ্রম গ্রহীতার আরেকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো, শ্রমিককে তার উপর আল্লাহর ফরযকৃত যাবতীয় ইবাদত যেমন, সালাত ও সিয়াম ইত্যাদি সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করা। মনে রাখবেন একজন দীনদার বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কিন্তু অন্য যে কারও চেয়ে নিজ দায়িত্ব পালনে বেশি আন্তরিক। কারণ, সে সবার জন্য মঙ্গল সাধন করতে সচেষ্ট থাকে। তার নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি এবং চুক্তি রক্ষার প্রচেষ্টা সঙ্গত কারণেই বেশি হয়। সাবধান হে মালিক ভাই, আপনার অবস্থান যেন আল্লাহর ইবাদত কিংবা ইসলামের প্রতীক রক্ষার কাজে বাধা প্রদানকারীরদের পক্ষে না হয়। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ

"যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে"।[২৬৯] সৎ কাজে বাধা না দিয়ে বরং তাতে ব্রতী হতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন,

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ١١ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ١٢ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ١٣ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ

---

[২৬৮] সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ২৭

[২৬৯] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩

"তুমি কি দেখেছ, যদি সে হিদায়াতের উপর থাকে, অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? যদি সে মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন?"[২৭০] পরন্তু শ্রম গ্রহীতা শ্রমিকদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। সুন্দর উপায়ে তাদেরকে নিজ ধর্মীয় শিষ্টাচার পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। কেননা, শ্রমিকদের দীনদারির অনুভূতির লালন-অনুশীলনের মাধ্যমে কাজে তাদের মনোযোগ বাড়বে। এটি তাদেরকে আপন কাজে আরও বেশি নিষ্ঠাবান এবং কাজের স্বার্থ রক্ষায় অধিক যত্নবান বানাবে।

৩.৬.২৫.৭. বিচার প্রার্থনার অধিকার

শ্রম বা কর্ম সম্পর্কিত ইসলামী বিধানগুলো কেবল শ্রমিকদের অধিকার সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী প্রবর্তনেই সীমিত থাকে নি; বরং এসব বিধান পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক বিধিগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা শ্রমিকের অভিযোগ ও বিচার চাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। ইসলাম চুক্তির পক্ষগুলোকে একেবারে ছেড়ে দেয়নি। বরং তাদের জন্য নিজেদের অধিকারগুলো সহজে পাবার পথ প্রশস্ত করেছে। হোক তা স্বেচ্ছায় কিংবা আদালতের ফয়সালায়। পাশাপাশি তাদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণে অত্যাধিক আগ্রহ দেখিয়েছে এবং এসব অধিকার রক্ষায় সর্বপ্রকার উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আর এই উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের মাঝে অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। কেননা অধিকার ও ইনসাফ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল প্রশান্তি ছড়ায়। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজে একে অপরের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আস্থা মজবুত হয়। সম্পদ উন্নত হয়। স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়। ফলে কেউ অস্থিরতার মধ্যে পতিত হয় না। সর্বোপরি শ্রম ও উৎপাদনে মালিক ও শ্রমিক প্রত্যেকেই নিজ নিজ লক্ষ্যে ধাবিত হয়। পথ পরিক্রমায় এমন কিছুর সৃষ্টি হয় না, যা শ্রমিকের কর্মস্পৃহাকে ভোতা কিংবা মালিকের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ইনসাফ ও ন্যায়ানুগতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। জুলুম ও বঞ্চিত করার মানসিকতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি জুলুম করেন না; বরং তিনি কোনো প্রকার জুলুম প্রত্যাশাও করেন না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ "আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন যুলম করেন না"।[২৭১]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا

"হে আমার বান্দা, আমি নিজের উপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না"।[২৭২] পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল তাদের জুলুম ও অত্যাচারী আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ "আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলম করেছে"।[২৭৩] আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, "সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়ি-ঘর, যা তাদের যুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে"।[২৭৪]

---

২৭০ সূরা আল-আলাক, আয়াত : ১১-১৪

২৭১ সুরা গাফের, আয়াত : ৩১

২৭২ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০১০, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৩৩৮, পৃ. ১১১

২৭৩ সুরা ইউনুস, আয়াত : ১৩

২৭৪ সূরা আন-নামল, আয়াত : ৫২

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন, "আর তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সম্বরণরত অবস্থায়। যালিমদের জন্য নেই কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে"।[২৭৫] আল্লাহ অন্যত্র এরশাদ করেন, "আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।[২৭৬]

৩.৬.২৫.৮. জামানত লাভের অধিকার

জামানত বা তাযমীন শব্দটি ফিকহ শাস্ত্রের আধুনিক পরিভাষায় নাগরিক কর্তব্য শব্দের প্রতিশব্দ। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষের জামানত বলতে বুঝায় অন্য কর্তৃক সাধিত ক্ষতির মোকাবেলায় যা প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, "আর কোন মু'মিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মু'মিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)"।[২৭৭] তেমনি নানা উপলক্ষ্যে পবিত্র সুন্নাহও একে সমর্থন করেছে, যা ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। সরাসরি ক্ষতি পূরণে একে সমর্থন করেছে। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم « طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ

"নবী (সা.) এর কাছে তাঁর কোনো এক স্ত্রী একটি থালায় আহার হাদিয়া পাঠান। আয়েশা (রা.) তাতে আঘাত করেন। ফলে থালায় যা ছিল তা পড়ে যায়। তখন নবী (সা.) বলেন, আহারের বদলে আহার এবং একটি পাত্রের বদলে আরেকটি পাত্র"।[২৭৮] একে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে অন্যের মালিকানাধীন সম্পদের প্রতি নিজে হাত বাড়ায়। অতপর অনুমতি ছাড়া জোরপূর্বক তা হরণ করে বা ধ্বংস করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "হাতে যা গ্রহণ করো যতক্ষণ না সে তা প্রকৃত মালিকের নিকট আদায় করে দিবে ততক্ষণ এর দায়িত্ব তার উপর থেকে যাবে"।[২৭৯] জোরপূর্বক মালিকানা সূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্বের ক্ষেত্রে এটিই মূলনীতি। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় গছব বা অবৈধ আত্মসাৎ। এটি ছাড়াও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পরবর্তীতে সাহাবীদের বিচারের খোঁজ করলে নাগরিক দায়িত্ব বা মালিকানার এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আর উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে শ্রমিকের জন্য শ্রম গ্রহীতার কাছে জামানতের অধিকার দাবী করার সুযোগ রয়েছে উল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে। তার জন্য আরও সুযোগ রয়েছে তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণে বিচার বা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও ওজনে পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না; আর তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে না তা সংশোধনের পর"।[২৮০] এভাবে সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি অর্জন কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন শ্রমিকের প্রতি ইসলামের এই অনুপম উদার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে পরিণত হবে। ফলে শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

---

২৭৫ সূরা আল-মু'মিন, আয়াত : ১৮

২৭৬ সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত : ৭১

২৭৭ সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৯২

২৭৮ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ১৯৯২খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ১৩৬৩, পৃ. ২২

২৭৯ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ২০০৬, হাদীস নং- ১২৬৯. খ. ৩, পৃ. ৫৪৬

২৮০ সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৮৫

৩.৬.২৫.৯. শ্রমিক-মালিক ইনসাফ ভিত্তিক সুসম্পর্ক রক্ষার অধিকার

মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করলেও সামাজিক অবস্থান সবার একই রূপ নয়। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ উঁচু বংশের, কেউ নীচু বংশের, কেউ দক্ষ, কেউ অদক্ষ। আবার এক একজন এক এক বিষয়ে পারদর্শী। ফলে বিভিন্ন পেশায় তারা নিয়োজিত। ইসলাম সকল বৈধ পেশাকে উৎসাহিত করে এবং সকল পেশার মানুষকে সমান সম্মান করে। সম্পদ, বংশ ও পেশার কারণে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিরূপিত হয় নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন"।[২৮১] কাজেই যে কোন পেশার লোক সম্মানের পাত্র। কেননা সমাজ জীবনে তথা দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন পেশার লোকের মুখাপেক্ষী হই। এমনকি শ্রমিক-মজুর, দাস-দাসী, শিক্ষক, জেলে, তাঁতী ও ব্যবসায়ীসহ সব পেশার মানুষই সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কাজেই প্রত্যেক পেশাজীবীর অধিকারের প্রতি আমাদের সমান যত্নবান হওয়া এবং সমান সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক, মানসিক ও কৌশলগত শক্তি আছে। এগুলি কাজে বিনিয়োগ করার নাম শ্রম। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তি শ্রমিক। শ্রমের দ্বারা মানুষ তার ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়, আত্মনির্ভরশীল হয়। পৃথিবীর সব মহৎ কাজের পিছনে অজস্র মানুষের শ্রম জড়িত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى

"মানুষ যতটুকু চেষ্টা করবে, ততটুকু সে পাবে"।[২৮২]

আত্মনির্ভরশীলতা ও উন্নয়নের জন্য শ্রমের বিকল্প নেই। তাই শুধু ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে মশগূল না থেকে জিবিকা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সালাত শেষে জীবিকা অর্জনের জন্য পৃথিবীতে বের হয়ে পড়"।[২৮৩]

শ্রমিক কাজের দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে অলসতা প্রদর্শন করলে তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা ওযনে কম দেয়। নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং দেওয়ার সময় কম করে দেয়"।[২৮৪] শ্রমিক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিবে এটা তার কর্তব্য। আর এ কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করলে তার জন্য দ্বিগুণ পুণ্যের কথা হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "তিন শ্রেণির লোকের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হল যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও আদায় করে"।[২৮৫]

শ্রমিক শুধু দায়িত্ব পালন পূর্বক মালিকের মনোরঞ্জন করে চলবে আর তার কোন প্রাপ্যতা থাকবে না এটা হতে পারে না। সে যেমন নিজের দেহের রক্ত পানি করে মালিকের কাজের যোগান দিবে, তেমনিভাবে তার মালিকের নিকট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা হল, কোন

---

২৮১ সূরা আল-হুজরাত, আয়াত : ১৩

২৮২ সূরা আন্ নাজম, আয়াত : ৩৯

২৮৩ সূরা আল জুমু'আ, আয়াত : ১০

২৮৪ সূরা আল মুতাফফিফিন, আয়াত : ১-৩

২৮৫ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১১৭ খ. ৩, পৃ. ৪০০

ক্ষতি করা চলবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।[২৮৬] শ্রমিকের প্রথম দাবী বা অধিকার হল তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। শ্রমজীবী লোকদের মজুরি লাভ করা তার নায্য দাবী সমূহের মধ্যে অন্যতম।

শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার আদায় করতে হলে শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) প্রয়োজন ও দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে বেতন নির্ধারণ করে দিতেন। অনেক সময় শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকগণ উপযুক্ত মজুরি প্রদান না করে ইচ্ছামত মজুরি দেন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন ও ঠকান। শ্রমিকগণ নীরবে তা সহ্য করে থাকে। এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তার মধ্যে একজন হল যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে, অথচ তার পূর্ণ মজুরি প্রদান করে না"।[২৮৭] শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কাজের সময় নির্ধারণ ও তাদের সামর্থের বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে না দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"কাউকে আল্লাহ তার সাধ্যের অতীত কাজের দায়িত্ব দেন না"।[২৮৮] কাজ করে নেয়ার আগে শ্রমিককে তার কাজের ধরন সম্পর্কে অবগত করতে হবে। তাকে এক কাজে নিয়োগ করে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাজে লাগানো উচিত নয়। এমনকি তার সম্মতি ব্যতীত যেকোন কাজে নিয়োগ দান সমীচীন নয়। শ্রমিক দিয়ে এমন ধরনের কাজ করানো আদৌ সঙ্গত হবে না যা তার জন্য অতি কষ্টকর বা সাধ্যাতীত। সর্বদা মনে রাখতে হবে শ্রমিক মালিকের হাতের ক্রীড়নক নয়, বরং সে তারই সমমর্যাদার অধিকারী স্বাধীন এক সত্তা।

শ্রমিকের পেশা পরিবর্তন বা কর্মস্থল পরিবর্তনে অধিকার থাকবে। এতে কারও হস্তক্ষেপ অর্থই তার স্বাধীন সত্তায় বাধা দানের শামিল। আমরা দেখতে পাই শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও মুনাফা লুটে নেয় মালিক শ্রেণি।[২৮৯] সমাজের সদস্য হিসাবে অন্য সব মানুষের ন্যায় শ্রমিকেরও মৌলিক অধিকার রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে। এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিকদের একান্ত কর্তব্য। তাদের যথোপযুক্ত দাবী পূরণের কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.) বলেন, "শ্রমিকদেরকে যথারীতি খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে"।[২৯০]

বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ শ্রমিকগণের সবচেয়ে বড় প্রাণের দাবী। শ্রমই শ্রমিকগণের একমাত্র পুঁজি। শ্রমিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জীবিকা নির্বাহের কোন পথই থাকে না, যা দিয়ে সে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সে তখন একেবারে অসহায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। খাদ্যের জন্য সে তার যৌবনের উষ্ণ রক্ত ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে আজ সে নিঃস্ব ও রিক্ত অথচ মালিকগণ ভুলেও তার করুণ দৈন্যদশার দিকে ফিরে তাকায় না। তাই বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসহায় ও দুর্বল লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মালিক ও সরকারের। সরকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবে,

---

[২৮৬] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৪০, খ. ২, পৃ. ৩৫১-৩৫২

[২৮৭] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২০৮৬, পৃ. ১২০

[২৮৮] সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৮৬

[২৮৯] *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[২৯০] আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী [তাহকীক : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)` অনু., সম্পাদনা পরিষদ], *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা : হাদিস একাডেমী, ২০১৬, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৩৪৪, পৃ. ৪০১-৪০২

প্রয়োজন অনুপাতে ভাতা নির্ধারণ এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

"আমি মু'মিনের অভিভাবক। তাদের মধ্যে হতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে এবং তার উপর কর্য (দেনা) থাকলে আর তা পরিশোধের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে তা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। আর যদি সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার অংশীদারগণ এ সম্পদের অধিকারী হবে"।[২৯১] শ্রমিক ও মালিকের এ বিষয়গুলো জানা এবং সে আনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা, সুষ্ঠভাবে এগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা উভয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাহলে শ্রমিক ও মালিকের মাঝে কোন দ্বন্দ বিক্ষোভের সূত্রপাত হবে না। সর্বত্র সুন্দর ও কাঙ্খিত পরিবেশ বিরাজ করবে। ফলে শ্রমিক আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাবে।

৩.৬.২৬. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য শ্রমিকদের কাম্য গুণাবলী

শ্রমিকের এমন কিছু গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, যা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অটুট রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলাম মালিকদের উপর অনেক দায়িত্ব যেমন অর্পণ করেছে, তদ্রুপ শ্রমিকের উপরও আরোপ করেছে কিছু আবশ্যক ন্যায়নীতি। যেমন-

আমানতদারিতা : শ্রমিকের উপর অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই আমানতদারিতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "সর্বোত্তম শ্রমিক সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও আমানতদার (দায়িত্বশীল) হয়"।[২৯২]

সংশ্লিষ্ট কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা : দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা তার থাকতে হবে। শারীরিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকেই তাকে কর্মে সক্ষম হতে হবে।

নিজের কাজ হিসেবে করা : কাজে নিয়োগ পাওয়ার পর শ্রমিক কাজকে নিজের মনে করে সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ পূর্ণ দায়িত্বশীলতার ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে কাজটি সম্পাদন করে দেয়া তার দায়িত্ব হয়ে যায়।

আখিরাতের সফলতা ও আত্মনির্ভরতার জন্য কাজ করা : একজন শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করবে, তা যেন হালাল হয় এবং এর বিনিময়ে পরকালীন সফলতা লাভে ধন্য হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সেবার মানসিকতা ও আত্মনির্ভর হওয়ার পরম আগ্রহ নিয়ে আনন্দের সাথে কাজটি সম্পন্ন করাই হবে শ্রমিকের নৈতিক দায়িত্ব।

৩.৬.২৭. আল-কুরআনের বর্ণিত শ্রমিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

৩.৬.২৭.১. শক্তিশালী তথা সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সামর্থ্যবান হওয়া

সামর্থ্যবান শ্রমিক যদি বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে মালিকের পক্ষে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকে। তাইতো মূসা (আ.) যখন মিশর থেকে মাদায়েনে হিযরত করেন ঘটনাক্রমে নবী শুয়াইব (আ.) এর দরবারে নীত হন, তখন হযরত শুয়াইব (আ.) এর এক মেয়ে তার বাবাকে পরামর্শ দিয়ে বলছিলেন, "হে পিতা! আপনি মূসা (আ.) কে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে এমন ব্যক্তিই, যে

---

[২৯১] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১০৭০, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

[২৯২] সূরা কাসাস, আয়াত : ২৬

একই সাথে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত"।[২৯৩] হযরত সুলায়মান (আ.) এর এক কর্মচারী, জ্বীনের জবানবন্দীতেও বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে হযরত সুলায়মান (আ.) আরো বললেন, "হে আমার পারিষদবর্গ! তারা (রাণী বিলকিস ও তার সাথীরা) আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? এক শক্তিশালী জ্বীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি ঐ সিংহাসন নিয়ে আসব; আর এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত"।[২৯৪]

৩.৬.২৭.২. আমানাতদারি ও বিশ্বস্ততা

পৃথিবীতে ব্যাপক চর্চিত একটি শব্দ আমানত। যে আমানত রক্ষা করে চলবে, যথাযথ ব্যক্তির কাছে আমানত পৌঁছে দেবে, তার মধ্যে আমানতদারিতা আছে। আমানত বা বিশ্বস্ততা মুসলিমদের প্রধান গুণ। বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের প্রথম যোগ্যতাই হচ্ছে আমানতদারিতা। আমানত নেতৃত্ব ও দায়িত্বের একটি অপরিহার্য বিষয়। আমানতদারিতার অর্থ হল প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি, সম্পদ ও যাবতীয় দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রাখা। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে আমানত রক্ষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করার নির্দেশ করছেন।[২৯৫] লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমানতের একবচন ব্যবহার করেননি; এর বহু ক্ষেত্র বোঝাতে বহুবচনরূপে শব্দটিকে ব্যক্ত করেছেন। আমানতের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নেই। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমানতের যথাযথ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও হযরত রাসূল (সা.) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না।[২৯৬] আমানত হচ্ছে সফলতার সোপান। সফল মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারীদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।[২৯৭] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (স.) বলেন, যার আমানতের ঠিক নেই সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন নয়।[২৯৮] তাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য একজন শ্রমিককে তার কাজ করার ক্ষেত্রে আমানতদারিতার পরিপূর্ণ চর্চা করা একান্ত কর্তব্য।

৩.৬.২৭.৩. শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মালিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ভাল মালিকের মূল বৈশিষ্ট্য পাঁচটি। যথা-

এক : সে বুঝে-শুনে সচেতনভাবে শ্রমিক নিয়োগ দেয়,
দুই : পারিশ্রমিক আগেই নির্ধারণ করে নেয়,
তিন : শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ করে,
চার : শ্রমিককে অযথা কষ্ট দেয় না এবং
পাঁচ : শ্রমিকের সাথে সদাচরণ করে।

---

২৯৩ সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত : ২৬

২৯৪ সূরা আন-নামল, আয়াত : ৩৮-৩৯

২৯৫ সূরা আন নিসা, আয়াত : ৫৮

২৯৬ সূরা আল আনফাল, আয়াত : ২৭

২৯৭ সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত : ০৮

২৯৮ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী [অনুবাদ, মাওলনা এ, বি, এম এ খালেক মজুমদার], *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২, খ. ১, হাদিস নং- ৩১, পৃ. ৬৪

এই শিক্ষাই আমরা নিচের আয়াত ও তার দৃশ্যপট থেকে পাই, শুয়াইব (আ.)-এর দুই মেয়ের একজন বলল, পিতা তুমি মূসাকে (আ.) মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। শুয়াইব (আ.) মূসা (আ.) কে বলল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মনির্ভরশীলতায় বাংলাদেশ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

৪. আত্মনির্ভরশীলতায় বাংলাদেশ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

এ অধ্যায়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য কর্মসংস্থান বিষয়ে মূখ্যত আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এ আলোচনায় কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের বাস্তব অবস্থা ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও এসব বিষয়ে ইসলামের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে নবী-রাসূলদের জীবন থেকে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

৪.১. কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের বাস্তব অবস্থা ও ইসলামের শিক্ষা

৪.১.১. বর্তমান শ্রমিক-মালিকদের মনোভাব আত্মনির্ভরশীলতার পথে অন্তরায়

আমাদের জীবনে শ্রম একটি অপরিহার্য বিষয়। আল্লাহর এ সৃষ্টিকুলের অফুরন্ত নেয়ামতরাজিকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার পেছনে শ্রমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সভ্যতার চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির নেপথ্যে কাজ করছে শ্রম। আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকি। মানুষ সুউচ্চ মনোরম অট্টালিকায় বাস করে আয়েশ করার পেছনে রয়েছে একদল শ্রমিকের ঘাম ঝরানো ক্লেশ। কিন্তু তারা এ আরামের বিন্দুমাত্রও উপভোগ করতে পারেন না। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত থাকলেও এখানকার শ্রমিকরা তাদের মজুরি নিয়ে বেজায় অসন্তুষ্ট। বৈদেশিক মুদ্রা আনয়নকারী জাতীয় অর্থনীতির 'লাইফ লাইন' হিসেবে স্বীকৃত বড় খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প, এর পরে রয়েছে জনশক্তি রফতানি খাত। আর সর্বনিম্ন মজুরি দেয়ার দুর্নামও রয়েছে এ শিল্পের, শ্রমিক অসন্তোষের মূলে রয়েছে কম মজুরি। ২০১৩ সালের ২৪ শে এপ্রিল প্রায় ১ হাজার ২০০ পোশাক শ্রমিক নিহত হন সাভারে রানা প্লাজা অকস্মাৎ ধ্বংসের ফলে।[১] পরবর্তীকালে ব্যাপক আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে গঠিত হয় মজুরি কমিশন। তারা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা ধার্য করে। কিন্তু সে অনুযায়ী মজুরি না পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে অনেক পোশাক কারখানার বিরুদ্ধে। নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের অনেক উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা নির্বীকার থাকেন নারীদের মজুরি বৃদ্ধি ও ক্ষতিপূরণ বাস্তবায়নের ইস্যুতে। নারী শ্রমিকরা কম-বেশি যেখানেই শ্রম দিচ্ছে সেখানেই তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, চাতালকল, চা বাগান, গৃহকর্মসহ অপরাপর কর্মক্ষেত্রেও শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না- এটাই এ সমাজের বাস্তবতা। নিয়োগকর্তা ও কর্মীরা যদি ইসলামী অর্থব্যবস্থার চেতনা অনুযায়ী সেগুলো পালন করত তাহলে এ দেশটিতে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে উঠত। নারী-পুরুষ সকলেই কর্মের মাধ্যমে

[১] https://www.bbc.com › bengali › news-56872708

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ লাভ করত। জাতীয়ভাবে আমাদের সচেতনতা ও উদাসীনতা এ পথে প্রধান অন্তরায়। এ সকল সমস্যা সমাধানের আইন হলেও বাস্তবে তা রূপলাভ করেনা।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চলছে বিরোধ এবং সংঘাত। মালিক শ্রেণি চায় কিভাবে শ্রমিকদের বেশি কাজ করিয়ে কম পারিশ্রমিক দেয়া যায়। পক্ষান্তরে শ্রমিকরা চায় ঠিকমতো কাজ না করেই পূর্ণ মজুরি আদায় করে নিতে। উভয় শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মনোভাবের ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দূরত্বের। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পুঁজিবাদী মতাদর্শে শ্রমিক শ্রেণি গোলামের সমতুল্য। তাদের সঙ্গে খুব ভালো আচরণের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের একটি কলের সঙ্গে তুলনা করে থাকে। তাদের মতে, শ্রমিকের দায়িত্ব শুধু কাজ করে যাওয়া। লাভ-ক্ষতি নিয়ে মাথা ঘামানো শ্রমিকের দায়িত্ব নয়। শ্রমিক মনে করে দিন শেষে আমার মজুরি পেলেই হল। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাভ ক্ষতি নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। অথচ শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রই তার জীবন জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে থাকে, যে পশুটি আমাকে দুধ দেয় সে যদি বেঁচে না থাকে তাহলেতো সবই শেষ হয়ে যাবে। নিজের কর্মক্ষেত্র কে অবশ্যই বাঁচাতে হবে তাহলে আমিও বাঁচতে পারব। একথা শ্রমিককে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। আর মালিককে মনে রাখতে হবে শ্রমিকরা আমার সহযোগি ও ভাইয়ের মত। ইসলাম এ দুই শ্রেণির মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। একদিকে মালিক পক্ষকে বলা হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষ তোমাদের ভাই, সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে ভাই সুলভ আচরণ করো। অন্যদিকে শ্রমিকদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এতে উভয়ের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিরাজ করবে। এজন্য শ্রমিকদের অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সম্মিলিতভাবে ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

৪.১.২. নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যের বিলোপ সাধন

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী অর্ধেক তার নর...' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার মতো নারী-পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে গড়তে অবদান রাখলেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে পদে পদে। বিশেষ করে বেতন-ভাতা ও মজুরির দিক থেকে। নারী-পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে প্রায় প্রতিটি স্তরে সমানতালে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-কূটনীতির সঙ্গে সঙ্গে মাটি কাটা, ইট ভাঙা, কৃষি কাজ করা, বোঝা টানা, নির্মাণ কাজ, গৃহকর্ম, মৃৎশিল্প, গার্মেন্টস, শিল্প-কারখানা, গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির টুকরো কাপড় অর্থাৎ জুট বাছার কাজ, চা বাগানগুলোয় চা তোলার কাজ, চিংড়ি রপ্তানি প্রকল্প, শুঁটকি প্রকল্প সহ বিভিন্ন শ্রমবাজারে রয়েছে এ দেশের নারীদের বলিষ্ঠ পদচারণা। কিছু কিছু স্তর ছাড়া অধিকাংশ স্তরের কাজেই নিয়োজিত শ্রমজীবী নারী। এসব শ্রমজীবী নারীর মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগই অশিক্ষিত, বাকি ১০ ভাগ সামান্য লেখাপড়া জানে। ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে পারে না। জীবন ও জীবিকার তাকিদে ছুটে চলাই যেন তাদের লক্ষ্য। কোথাও এতটুকু অবসর নেই। নেই কোনো বিনোদন, নেই ভালো খাবার-দাবার। সংসারের কঠিন ঘানি টানা এসব শ্রমজীবী নারীর সন্তানরা ভালো স্কুলে পড়তে পারে না। ছোট্ট দুধের শিশুকে নিয়েও নারীকে কাজে বের হতে হয়। এ চিত্র আরো করুণ। এসব খেটে খাওয়া নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য সচেতন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাটি কাটার কাজে একজন পুরুষ শ্রমিক যেখানে পায় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, সেখানে একজন নারী শ্রমিক পাচ্ছে ১০০ থেকে ১১০ টাকা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এসব নারী শ্রমিক নিজেরাও জানে না তাদের বৈষম্যের কথা। কোনো কোনো নারী শ্রমিককে বলতে শুনেছি 'বেটা মানুষ, ম্যাইয়া মানুষের চাইয়া বেশি কাম করে তাই তাগো বেশি টাকা দেয়। ' আসলে কী তাই? একজন পুরুষ শ্রমিক যদি ১০ ঘণ্টা কাজ করে নারী শ্রমিকও সেই একই সময় এবং সমপরিমাণ কাজ করছে। তবে কেন এ বৈষম্য? শ্রমজীবী যেসব নারী মজুরিভিত্তিক কাজ করে তারা নিজ গৃহে গিয়ে সামান্যতম বিশ্রামটুকু কী নিতে পারে? এখানেও রয়েছে ঘর-গৃহস্থালির কাজ। বাড়ি ফিরে তাকে করতে হয় রান্না-বান্না, ছেলে-মেয়েদের নাওয়া-খাওয়াসহ অন্যান্য কাজ। শুধু শ্রমজীবী নারীর ক্ষেত্রে নয় সচ্ছল পরিবারের নারীরাও বাইরে

চাকরি না করলেও ঘরের হাজারও কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। অথচ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কেউ তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করছেনা। বরং তাদের এ কাজকে কাজ হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়না, পরিবারের কর্তা ব্যক্তি সারাদিনে ঘরের কাজের হিসাব চায়, এ রকম হাজারো বৈষম্য আমাদের সমাজে বিদ্যমান। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পারিবারিক কাজে তার স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করতেন, এমনকি বিদায় হজ্বের ভাষণে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে নারীর প্রতি সদাচরণ ও তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য জোর তাকিদ প্রদান করে গেছেন, আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের সাথে তুলনা তাদের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই তাদেরকাজ ও শ্রমকে বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নাই।

৪.১.৩. গৃহকর্মীদের অবহেলার শিকার হওয়া

বর্তমানে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সব দেশেই দাস-দাসীদের মত কঠোর পরিশ্রম করেও যারা তাদের কাজের পেশার স্বীকৃতি পায়নি। নেই কোন সামাজিক স্বীকৃতি, বরং পেশাকে দেখা হয় খারাপ চোখে। অথচ তাদের পরিশ্রমেই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক পরিচালিত হচ্ছে, তাই গৃহকর্মীদের গৃহ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। গৃহকর্মীদের গৃহ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন দরকার। কিন্তু আমরা সে আন্দোলনটা করতে পারছি না। বৃহত্তর একটি আন্দোলন কেবল অধিকার আদায়েই সহায়ক হয় না, আমাদের মনোজগতেরও পরিবর্তন ঘটায়। তাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন দরকার।

দেশে শ্রমিক সংগঠন দিন দিন বাড়ছে। সে অনুপাতে শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে না। নানা প্রতিকূলতার কারণে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গৃহকর্মীদের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি, নীতিমালা, আইন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু আইন করে দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো যায় না। তাই আইন বা নীতিমালা করেই আমরা এর দায় এড়াতে পারি না। আইএলও কনভেনশনে যদিও নীতিমালা আছে তা বাস্তবে পুরোপুরি শ্রমবান্ধব নয় এ জন্য শ্রমের ইসলামীক নীতিমালা অনুযায়ী খুব দ্রুত গৃহকর্মীদের গৃহশ্রমিকের মর্যাদা দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের উপর হয়রানি, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। সংবাদ মাধ্যমে চোখ রাখলে প্রায় প্রতিদিনই গৃহকর্মী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণের ঘটনা চোখে পড়ে।

বেঁচে থাকার তাকিদে, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে গৃহকর্মীরা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। কিন্তু অধিকাংশ বাড়িতেই তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকে না। পান থেকে চুন খসলেই গাল-মন্দ, মারধর এমনকি তাদের হত্যাও করা হয়। বাংলাদেশে গৃহকর্মীর সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসেবে দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে ১ হাজার ৭০টি গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ৫৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।[২]

বাংলাদেশে প্রায় ২০ লাখ মানুষ গৃহকর্মে নিয়োজিত যার অধিকাংশ নারী ও শিশু। যদিও ১৯৬১ সালে প্রণীত গৃহকর্মী রেজিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স এবং ২০১০ সালে গৃহীত জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন আইনে গৃহকর্মী ও শিশু শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত আছে। তারপরও ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তবে আমাদের দেশে ও ২০১৫ সালে "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫" এ আইনে তাদের অধিকার, কর্তব্য, মর্যাদার বিষয় এবং শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধের মূলণীতি সরকার প্রণয়ন করেছে।[৩] সেখানে তাদের জন্য বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন হলেও নানা সমস্যার কারণে এখনও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সমাজের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দুর্দশার কথা আমরা মুখে বলেই শেষ করছি বাস্তবে তাদের অধিকারের জন্য কেউ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেনা। তারা কি আজীবনই পরনির্ভরশীল থাকবে

---

২ BBC বাংলা, ৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি., https://www.bbc.com › bengali › news-37571118

৩ https://bangladesh.gov.bd › files › files › policy

? কিভাবে তারা আত্মনির্ভরশীল হবে এ বিষয়ে তারা কোন পথ খুজে পায়না। তাই প্রয়োজনে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য দাবীর পক্ষে ইসলামী শ্রমনীতি চালুর জন্যে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নয়তো তারা আজীবন এভাবে ধুকে ধুকে মরবে।

৪.১.৪. শ্রমিক ও তাঁর শ্রমের গুরুত্ব

জীবন একটি সংগ্রাম। সংগ্রাম করেই এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়। আর পরিশ্রমই হলো এই সংগ্রামের মূল শক্তি। পৃথিবীর জীব-জগতের প্রতিটি জীবই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। শ্রম ছাড়া এক দিনের আহার উপার্জন করা সম্ভব নয়। মানুষও শ্রম ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কঠোর পরিশ্রম করেই বেঁচে থাকতে হয়। সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার দিকে চোখ রাখলে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। এই উৎকর্ষের মূলে রয়েছে যুগ যুগান্তরের অগণিত মানুষের নিরলস শ্রম। মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনি সে আপন ভাগ্যের নির্মাতা। নিজের ভাগ্যকে মানুষ নিজে গড়ে নিতে পারে। আর এ জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো শ্রম। শ্রম দ্বারা সব কিছুই অর্জন করা সম্ভব। কোন কাজই ঘৃণ্য নয়। সমাজে সব ধরনের কাজেরই গুরুত্ব রয়েছে। নেতার নেতৃত্ব, চিন্তাবিদদের চিন্তা, শিক্ষকের শিক্ষা, বিশেষজ্ঞের উপদেশ ইত্যাদি যেমন আবশ্যক তেমনি কুলি, মজুর, মেথর, ডাক হরকরা, দোকানি, কেরানি প্রভৃতি ব্যক্তিদের শ্রমও সমানভাবে আবশ্যক। সব ধরনের কাজই মহৎ এবং প্রয়োজনীয়। উন্নত বিশ্বে সব শ্রমকেই মহৎ এবং বড় মনে করা হয়। আর এ কারণে তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। বিশ্বের সব কালজয়ী কীর্তিগুলো শ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। তাজমহল, রোম নগরী, চীনের প্রাচীর, মিশরের পিরামিড প্রভৃতি মহান কীর্তিগুলো শত বছরের হাজার হাজার মানুষের পরিশ্রমের ফসল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যত সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে সবই শ্রমের ফলশ্রুতি। যে দেশগুলো আজ বিশ্বে উন্নতির শিখরে আসীন, সেই উন্নতির পেছনেই রয়েছে জাতিগত শ্রম।

ইসলাম ধর্মে শ্রমকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষকে বিশেষ মর্যাদার আসন দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ "কোনো ব্যক্তি বা জাতি যতক্ষণ নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা না করে ততক্ষণ আল্লাহ তার সহায় হন না"।[৪] আজ শ্রমের জয় বিঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে। দেশে দেশে আজ শ্রমিক সংঘ এবং শ্রমিক কল্যাণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। শ্রেণি স্বার্থ নয়, সমবণ্টনই কাম্য। সমাজের সম্পদ, তার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সকল মানুষের জন্য সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। বুদ্ধিবল, অর্থবল, বাহুবল এবং শ্রমবল-সমাজের সবই প্রয়োজন। সমাজের বেদিমূলে সবাই যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রম দান করবে। তার বিনিময়ে প্রত্যেকে তার ন্যায়সঙ্গত মূল্য পাবে। এটাই বর্তমান যুগের আদর্শ হওয়া উচিত।

যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি ও দেশ তত উন্নত। শ্রম বিমুখ জাতির পতন অনিবার্য। শ্রমকে ঘৃণার চোখে বিচার করলে দেশে উৎপাদনের জোয়ার আনা যায় না, জাতীয় সমৃদ্ধির স্বপ্ন রচনা করা যায় না। প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হয়। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নেই, এটা যাতে আসে তার চেষ্টা করতে হবে। এটি করার রহস্য হচ্ছে পরস্পরে ঈর্ষা। সর্বদাই ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে, সর্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এটাই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার আসল রহস্য। সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। জীবনতো ক্ষণস্থায়ী-একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনটা সমর্পণ করতে হবে।

পরিশ্রম ছাড়া মানুষ উন্নতি করতে পারে না। কথায় বলে, পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। প্রকৃতির নিয়মে সবাইকে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। পরিশ্রম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। সমস্ত কর্মই শ্রম সাপেক্ষ। শ্রমই মানুষের সমস্ত সৌভাগ্যের মূল। জ্ঞানীর জ্ঞান, সাধকের উপলব্ধি, বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, ধনীর ধন

---

[৪] সূরা আর রাদ, আয়াত: ১১

সবকিছুই শ্রমলব্ধ জিনিস। ব্যক্তিগত দিকটি ছাড়াও জাতীয় জীবনে যথার্থ সাফল্য ও উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। কর্ম বিমুখ জাতি কোনো দিনই উন্নতি লাভ করতে পারে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রমের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা বর্তমান থাকলেও পৃথিবীতে বারবার শ্রমকে অবহেলা করা হয়েছে। তার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হয়নি। আমাদের দেশেও শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দেয়া হয় না। শ্রমজীবীদের প্রতি তথাকথিত ভদ্রলোকের একটি অবজ্ঞার ভাব সর্বদা বিরাজ করে। কায়িক শ্রমকে অনেকেই অবজ্ঞার চোখে দেখে। যে কৃষক সমগ্র দেশের খাদ্যের যোগান দেয় সে চাষা হিসেবে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে আছে আমাদের কাছে। এ মানসিকতা আমাদেরকে হীন ও অনগ্রসর করেছে। দেশকে উন্নত করতে হলে শ্রমজীবী মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে। চাষী, শ্রমিক, তাঁতি, মালি এরাই আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ শ্রমও নৈতিকতা বলেই উন্নতি লাভ করেছে। কাজকে তারা কাজ বলেই জানে। কোনো ন্যায় কাজকেই তারা ছোট বলে মনে করে না। মুচি, কুলি, গৃহ ভৃত্য প্রভৃতি কাউকেই তারা ঘৃণা করে না। হাসিমুখে গৌরবের সঙ্গে তারা সব রকমের কাজ করে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র দোকানে সেলসম্যানের কাজ বা কুলির কাজ করতে কোনো দ্বিধা করে না। শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা আনন্দের অবকাশ। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। মানুষের ভাগ্য শ্রমের মধ্যেই সুপ্ত থাকে। শ্রম দ্বারা মানুষ সেই সুপ্ত ভাগ্যকে জাগিয়ে তুলে। পরিশ্রমে ধন আনে, আর পূণ্যে আনে সুখ। পরিশ্রম করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। দেহের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। দেহমনের সুস্থতার জন্য দরকার কায়িক শ্রম। শ্রমিকরাই সে সব দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায়।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য কোন দিক দিয়েই উন্নতি সম্ভব নয়। প্রকৃতির বুক থেকে সম্পদ আহরণ করতে গেলে কায়িক শ্রমেরই প্রয়োজন বেশি। অথচ এই সত্যকে ভুলে গিয়ে ঠুনকো সম্মানবোধ নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে আছি। কায়িক শ্রম যারা করে, তাদেরই গায়ের ঘাম ঝরে ঝরে সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠেছে। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে মন থেকে সব রকমের হীনমন্যতাবোধ বিসর্জন দিয়ে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। শ্রম সচেতনতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি দেশের উন্নতি, আমাদের এই কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের উন্নতির জন্য শ্রম সচেতনতা ও কাজের সঠিক মূল্যায়ন দেশকে সত্যিকার অর্থে গড়ে তুলতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ইসলামী শ্রম আইন বাস্তবায়ন হলে আমরা কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবো এবং আত্মনির্ভর জীবন-যাপন করতে পারবো।

১. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা : ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ এমন কিছু কাজ করে থাকে যা তার জন্য কোনভাবে করা উচিৎ নয়। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই মূলত মানুষ অপচয় করে থাকে। কোন ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী হলে তার দ্বারা অপচয় করা সম্ভব হত না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান করো। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না"।[৫] অপচয়কারীকে দুনিয়াতে আফসোস ও লজ্জিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.

---

[৫] সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ৩১

আর তুমি তোমার হাত গলায় বেড়ী করে রেখ না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না) এবং তাকে একেবারে খুলেও দিয়ো না (অর্থাৎ অপচয় করো না)। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।[৬] অপচয়কারীর জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ،

"আর বাম পাশের দল। কতই না হতভাগ্য তারা! তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। যা শীতল নয় বা আরামদায়ক নয়। ইতিপূর্বে তারা ছিল ভোগ-বিলাসে মত্ত"।[৭]

অপচয়কারীর দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলাফল হল, বৈধ জিনিস গ্রহণ করতে সে সীমালংঘন করে। আর এটাই তাকে শারীরিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই অলসতা তার উপর চেপে বসে। হযরত ওমর (রা.) বলেন,

مفسدة للجسد مورثة للفشل مكسلة, إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف

"তোমরা সীমাতিরিক্ত পানাহার থেকে সাবধান থাক। কেননা অতিরিক্ত পানাহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, অকর্মন্যতা আনয়ন কারী ও সালাত থেকে অলসকারী। তোমরা পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। কেননা পরিমিত পানাহার শরীরের জন্য উপকারী এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে"।[৮] তাই সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে হলে ইসলাম সম্পর্কে ভালো করে জানা ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলে সুন্দর, পবিত্র ও কল্যাণময় জীবনযাপন করা সম্ভব হবে।

২. **পারিবারিক প্রভাব :** মানুষ শিশুকালে তার পিতা-মাতার আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা যদি অপচয়কারী হয় তাহলে সন্তানও অপচয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। এজন্য এক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দকে সচেতন হতে হবে। হযরত রাসূল (সা.) বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রত্যেক নবজাতক ফিৎরাতের উপর তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী বা নাছারা অথবা অগ্নি পূজক বানায়"।[৯]

অপচয়ের আরেকটি অন্যতম কারণ হল অপচয়কারীদের সঙ্গ ও সাহচর্য। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ তার সঙ্গীর চরিত্র গ্রহণ করে থাকে। তাই সঙ্গী অপচয়কারী হলে তার অন্যান্য সঙ্গীরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

---

৬ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৯

৭ সূরা ওয়াক্বিআহ, আয়াত: ৪১-৪৫

৮ ইবনু মুফলিহ আল-মাক্বদিসী, *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৩৯১ হি., খ. ২, পৃ. ২০১

৯ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) [সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., খ. ২, হাদীস নং- ১৩০২, পৃ. ৪২৬

فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গীর দ্বীন গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে"।[১০]

৩. পরিচিতি ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা : অপচয়ের আরেকটি কারণ হল সমাজে নিজের খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করা। মানুষ অন্যের সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য তার সম্পদ অকাতরে খরচ করতে থাকে। মূলতঃ এর মাধ্যমে সে অপচয়ে জড়িয়ে পড়ে, যা সম্পূর্ণ হারাম।

৪. বাস্তব জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীনতা : অধিকাংশ মানুষ অর্থ-সম্পদ হাতে আসলেই বেহিসাব খরচ করে। সে একটিবারও ভেবে দেখে না যে, দুনিয়ার জীবন সর্বাবস্থায় সমান্তরাল গতিতে চলে না। আজকে হাতে অর্থ আছে কালকে নাও থাকতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নেয়ামত যথাযথভাবে ব্যয় করা। আজকের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করে বাকী অর্থ-সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা উচিত। যা তার বিপদের সময় কাজে আসতে পারে।

৫. ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে উদাসীনতা : অপব্যয়ের আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও শাস্তি সম্পর্কে উদাসীনতা। যেকোন ব্যক্তি পরকালের কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করলে সে অবশ্যই অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকবে।

৪.১.৫. কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে অবহেলা ও ইসলামের নির্দেশনা

মেধা-মনন, বুদ্ধি, দক্ষতা ও কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ। দায়িত্বশীল ও কর্মক্ষমদের কাজে উৎসাহিত করেছে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সর্বোত্তম কর্মী সেই ব্যক্তি, যে শক্তিমান ও দায়িত্বশীল"।[১১] কোনো প্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতনের বিনিময়ে চাকরিতে যোগদানের মানে সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে মেধা ও শ্রম দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে ইমানদাররা, তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো পূর্ণ করো"।[১২]

যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য। আমানত রক্ষায় ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতগুলো প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের বিচার-মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করো। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী"।[১৩]

পূর্ণাঙ্গভাবে আমানত আদায় না করা বা খেয়ানত করা মারাত্মক গুনাহ। নবী (সা.) এটাকে মুনাফিক বা বিশ্বাসঘাতকের আলামত বলেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। তা হলো মিথ্যা কথা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা"।[১৪] অন্য হাদিসে এসছে, "যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে"।[১৫]

---

১০ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী [অনুবাদক মণ্ডলী], *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১, খ. ৬, হাদীস নং- ৪৮৩৩, পৃ. ৩৪৮

১১ সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ২৬

১২ সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ০১

১৩ সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৮

১৪ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, *প্রাগুক্ত*, ২০০৪ খ্রি., খ. ১, হাদীস নং- ৩২, পৃ. ২৯

ইসলামে আমানতের পরিধি অনেক প্রসারিত। চাকরিজীবীদের কাজের সময়টুকুও আমানত হিসেবে গণ্য। সে সময় কাজ রেখে গল্প-গুজবে মেতে ওঠা বা কাজে ফাঁকি দেওয়া খেয়ানতের শামিল। অফিসের জিনিসপত্রও কর্মীর কাছে আমানত। ব্যক্তিগত কাজে তা ব্যবহার করা বা নষ্ট করা পুরোপুরি নিষেধ। আমানতের মতো খেয়ানতের বিষয়টিও ব্যাপক। কারও গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন কথা কান পেতে শোনা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। এখন খেয়ানতের বিষয়টি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ এটি কবিরা গুনাহ। এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

দায়িত্বশীলতা ও আমানত পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। কর্মীর কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ বুঝে না পেলে পরকালে অপরাধী হিসেবে শাস্তি পেতে হবে। নবীজি (সা.) এরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যককে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে"।[১৬]

সৎ, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীলরা ঠিক সময়ে অফিসে আসেন। কর্তব্য পালনে ফাঁকি, অবহেলা বা অলসতার আশ্রয় নেন না। সরকার, প্রতিষ্ঠান, মালিক ও কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হন না। তাদের আদেশ-নিষেধ আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে নেন। ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, কাজে ফাঁকি দেওয়া, মিথ্যা বলা এসব দোষ-ত্রুটি থেকে দূরে থেকে দায়িত্ব পালনে মনোযোগ দেন। সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে কাজের মান নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। দায়িত্বে অবহেলার সুযোগ নেই। প্রতিটি ব্যক্তিকে তার কর্ম, পেশা ও দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যখন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, কাজে অলসতা করে তাহলে তার এই কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের বড় রকমের ক্ষতি সাধিত করে। যার ফলে এক সময় প্রতিষ্ঠানটিই দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। যা প্রতিষ্ঠানের ও তার কর্মকর্তাদের আত্মনির্ভরশীলতার পথে বড় অন্তরায়।

৪.১.৬. শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির সংগ্রাম ও ইসলাম

শ্রমিক আন্দোলনের যে ইতিহাস ও তার পূর্বাপর ঘটনাবলি এবং বাস্তবতা নিয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তা থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি যে, ১৮৮৬ সালের পর সুদীর্ঘ একশত উনত্রিশ বছর পর শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি মিলেছে। এমন কথাও হলফ করে বলা যাবে না যে, শ্রমিক তার অধিকার সত্যিকারার্থে ফিরে পেয়েছেন এবং তারা তাদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে পেরেছেন। কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা শ্রমের হয়তবা নিয়ম প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তবে এখনও শ্রমিক নিপীড়ন থামেনি এবং শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রমের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে আমরা সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারি। আমরা হলফ করেই বলতে পারি যে, দুনিয়ার কোথাও শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি এবং তাদের বাঁচার উন্নত পরিবেশ এখনও কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগে। শ্রম দিয়ে মানুষ নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করতে চায়। নিজের পায়ে নিজে দাড়াতে চায়। চায় নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিকের মেহনতের কষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। সে জন্য তিনি যে ঐশ্বরিক বিধান চালু করেছিলেন তাতে শ্রমিক ও শ্রমের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর অমোঘ বাণী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আজও সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে অতুলনীয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

---

[১৫] আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ [অনুবাদক মণ্ডলী], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩, খ. ১, হাদীস নং- ১১৭, পৃ. ১২১

[১৬] *বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত*, খ. ৪, হাদীস নং- ২৩৮৬, পৃ.৩১৮-৩১৯

শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ককে ভাই ভাই উল্লেখ করে তিনি তাদের অধিকার ও পাওনার ব্যাপারে যে উক্তি করেছিলেন তা অসাধারণ। মহানবী (সা.) বলেছেন, মজুর-শ্রমিকও ভৃত্যদের যথারীতি থাকা ও পোশাক দিতে হবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তারা (দাস/শ্রমিক) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ যখন তার কোনো ভাইকে অধীন করে দেন, সে যেন নিজে যা খায়, তাকেও তাই খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা পরিধান করায়। তাদের সাধ্যাতীত কাজের জন্য যেন চাপ প্রয়োগ না করে। আর একান্তই যদি সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করে, তবে নিজেও যেন তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করে।[১৭]

মালিকের প্রতি শ্রমিককে তার অধিকার নিশ্চিত না করার পরিণাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সা.) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কঠিন অভিযোগ উপস্থাপন করব-যে ব্যক্তি কাউকেও কিছু দান করার ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে যে তার মূল্য আদায় করল এবং যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কাজে নিযুক্ত করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিলো, কিন্তু তার মজুরি দিলো না-এরাই সেই তিনজন।[১৮]

শ্রমিকের প্রতি মালিক যাতে সহনশীল থাকে এবং তার ভুলত্রুটি ক্ষমার মতো মহৎ মনের অধিকারী হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার তাকিদ দিয়ে আল্লাহর নবী (সা.) এক হাদীসে বলেছেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ " اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً " .

একবার এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গোলামকে কতবার ক্ষমা করবো? নবী (সা.) চুপ থাকলে সে ব্যক্তি আবার একই প্রশ্ন করে। তখনও তিনি চুপ থাকেন। লোকটি তৃতীয়বার একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নবী (সা.) বলেন, তোমরা তাদের প্রত্যহ সত্তর বার ক্ষমা করবে।[১৯]

মহানবী (সা.) সকল মালিকদের সাবধান করে বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ "অসদাচরণকারী মালিক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না"।[২০] শ্রমিকের মজুরি আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর অতি পরিচিত এবং বিখ্যাত একটি উক্তি সবার জানা। তিনি বলেছেন,

---

১৭ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী [অনুবাদকমণ্ডলী], *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা : হাদীস একাডেমী, ২০১৬খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ৩৩৪৫, পৃ. ৪০২

১৮ *বুখারী শরীফ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, হাদীস নং- ২১২৬, পৃ. ১১৭

১৯ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী [অনু. ড. আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক], *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., হাদীস নং- ৫০৭৪, পৃ. ৬১৮

২০ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *সুনান তিরমিযী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৫২, পৃ. ৩৮২

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"মজুরকে তার গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই মজুরি পরিশোধ করে দাও"।[২১] শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এই বাণী শ্রমিকের মর্যাদার বিষয়টিকে আরো বেশি মহীয়ান করেছে। এভাবে ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার যে গ্যারান্টি দিয়েছে, তা দুনিয়ার আর কোনো মতবাদ বা দর্শন দেয়নি। আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রদর্শনের কোনটাই শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদার ন্যূনতম সমাধান দিতে পারেনি। ফলে এখনও শ্রমিক-মজুররা নিষ্পেষিত হচ্ছে। মালিকের অসদাচরণ, কম শ্রমমূল্য প্রদান, অনুপযুক্ত কর্ম পরিবেশ প্রদান সহ নানা বৈষম্য শ্রমিকের দুর্দশা ও মানবেতর জীবনযাপনের কারণ হয়ে আছে। নানা আয়োজনে প্রতি বছর শ্রমিক দিবস পালন করার মধ্যে শ্রমিকের প্রকৃত কোনো মুক্তি নেই। যে অধিকারের জন্য শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন শিকাগোর রাজপথে, তা বাস্তবে এখনও অর্জিত হয়নি। আজও শ্রমিকেরা পায়নি তাদের কাজের উন্নত পরিবেশ, পায়নি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো মজুরি কাঠামো এবং স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত জীবনের নিশ্চয়তা। মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শ্রমিকের প্রতি মালিকের সহনশীল মনোভাব থাকতে হবে। শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আলোকে তাকে কাজ দিতে হবে। শ্রমিককে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য তার মজুরি সেভাবে নির্ধারণ করতে হবে। মালিককে অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তার নিজের স্বজনরা যে রকম জীবনযাপন করবে, তার অধীনস্থ শ্রমিকরাও সে রকম জীবনের নিশ্চয়তা পাবে। মালিক-শ্রমিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম যে শ্রমনীতি ঘোষণা করেছে, তাকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা গেলে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা অবশ্যই সুরক্ষিত হবে। ফলে জাতির সবাই আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

৪.২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আত্মকর্মসংস্থান এবং চলমান বাস্তবতা

৪.২.১. কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের অপচয়ের স্পৃহা ও এর পরিণতি : ইসলামের নির্দেশনা

অপচয় ও অপব্যয়ের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যেগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। অযথা খরচ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যেমন বিশৃঙ্খল করে, তেমনি ব্যক্তির আখেরাতকেও নষ্ট করে। নিম্নে অপচয় ও অপব্যয়ের কিছু ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হল। -

১. অপব্যয় হারাম উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে : অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে অনেক সময় মানুষ অর্থসংকটে পড়ে যায়। তখন সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে হারাম উপার্জনের দিকে ধাবিত হয়। অথচ হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نبَتَ منَ السُّحْتِ وكلُّ لحمٍ نبَتَ منَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সমীচীন।[২২]

---

২১ আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী [সম্পাদনা পরিষদ], *সুনানু ইবনে মাজাহ, ঢাকা :* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., খ. ২, হাদীস নং- ২৪৪৩, পৃ. ৪০১

২২ আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন আল-ফাদল বিন বাহরাম বিন আবদ আল-সামাদ আল-দারেমি সমরকন্দি, *সুনান আদ দারেমী*, করাচী : কদেমি কুতুবখানা, তা. বি., খ. ২, হাদীস নং- ২৭৭৬, পৃ. ৪০৯

২. অপচয়ের মাধ্যমে পাপের চর্চা হয় : অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে সে হারাম পথে অর্থ ব্যয় করতে উদ্যত হয়। যেমন মদ, জুয়া, লটারী, ধূমপান সহ সকল ধরনের নেশাকর দ্রব্য পান, যাত্রা, আনন্দমেলা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে সময় ও অর্থের অপচয়ের সাথে সাথে পাপের চর্চা হয় অবারিত। উপরন্তু ইসলামের নির্দেশনার বাইরে অতি ভোজনের মাধ্যমে বরং সে নিজেই নিজের ক্ষতি ডেকে আনে। অথচ ইসলাম অপচয় না করে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের সুন্দর নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ

আদম সন্তান তার পেটের তুলনায় অন্য কোন খারাপ পাত্র ভর্তি করে না। মানুষের জন্য তো কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখবে। আর যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় আর এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য রাখবে।[২৩]

৩. পরকালে সম্পদ সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে : পরকালে মহান আল্লাহর সামনে প্রত্যেককে স্বীয় সম্পদের হিসাব দিতে হবে যে, সম্পদ কোথা থেকে সে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে। হযরত রাসূল (সা.) বলেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ،

ক্বিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় তার রবের নিকট হতে একটুকুও নড়বে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? আর সে যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছিল সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না।[২৪]

৪. অপচয় ও অপব্যয় সম্পদ বিনষ্টের নামান্তর : অপব্যয় ও অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট হয়। যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। হযরত রাসূল (সা.) বলেন

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ،

আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন- (১) অনর্থক কথাবার্তা বলা (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক প্রশ্ন করা।[২৫]

৫. বরকতশূন্য হওয়া ও দারিদ্রের কবলে পড়া : অপচয়-অপব্যয় করার কারণে সম্পদে বরকত থাকে না। ফলে সম্পদ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ঐ ব্যক্তি তখন ঋণ করতে থাকে। অবশেষে সে অভাব-অনটনের মধ্যে পতিত হয়। ফলে আত্মনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে দারিদ্রতায় পতিত হয়।

---

[২৩] *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, ২০০২, খ. ৩, হাদীস নং- ৩৩৪৯, পৃ. ২২৪

[২৪] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪ .জুন ১৯৯২, হাদীস নং- ২৪১৯, পৃ. ৬৬২

[২৫] আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী [সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০খ্রি., খ. ৪, হাদীস নং- ৪৩৩৬, পৃ.২৪৫

৪.২.২. অপচয় ও অপব্যয় : বাস্তবতা

ইসলামে হারাম খাদ্য গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে এবং খাদ্যের আদব রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে পানাহারে অতিভোজন ও অপচয় যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে খাদ্য ও পানীয়ের কোম্পানীগুলো ভোক্তার অর্থ ধ্বংস করে চলেছে। অতিভোজনের জন্যই দুদিন পরপর নানা রকমের বিলাসী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট লোকদের অন্ধ অনুকরণের পিছনে মুসলিমরাও ছুটছে। অপচয় করাটাই যেন তাদের বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এর খারাপ প্রভাব যে ক্ষতিকর তা একবার কেউ ভেবেও দেখেনা।

ডাস্টবিনগুলোর অবস্থা থেকেই অনুমিত হয় দৈনিক কত খাদ্য আমরা অপচয় করে চলেছি। আর এভাবেই পশু চরিত্র আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করছে। অথচ গরীব-মিসকীনরা দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালায় তারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ খাবার অপচয় করি, তা যদি দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হত তাহলে অনেক অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা মেটানো সম্ভব হত। ইসলামে খাবার অপচয় করার কথা চিন্তাও করা যায় না। বরং খাবার গ্রহনের সময় দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যাতে খাবার পড়ে গেলে আবার তা তুলে খাওয়া যায়। খাবার নষ্ট করা, অপচয় করা সম্পুর্ন হারাম। কেননা আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন এরশাদ করেছে

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"তুমি অপব্যয় করবে না, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই"।[২৬]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কারো কাছ থেকে মাটিতে খাবার পড়ে গেলে সে যেন সেটা তুলে, ধুলোটা ঝেড়ে খেয়ে ফেলে; শয়তানের জন্য রেখে না দেয়"।[২৭] নবী (সা.) খাবার শেষে হাত পরিষ্কার করে খেতে বলেছেন, কারণ খাবারের কোন অংশে বরকত আছে সেটা মানুষ জানে না। দেখুন, খাবারের বরকত কমে যাচ্ছে বলেই কিন্তু খাবারের উৎপাদন কমছে, সেই কম খাবার সংরক্ষণের জন্য ফরমালিনের বিষ মিশানো হচ্ছে, বিষ মেশানো সেই খাবারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, খাবারের স্বাদ-তৃপ্তি সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। গোড়ায় গলদ রেখে উন্নয়ন কিভাবে হবে? অর্থাৎ নিজ হাতে কল্যাণের সব দরজা বন্ধ করে রেখে অন্যকে দোষ দিয়ে কী লাভ?

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"তোমরা এগুলির ফল খাও যখন তা ফলবন্ত হয় এবং এগুলির হক আদায় কর ফসল কাটার দিন। আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না"।[২৮] হযরত ওমর (রা.) বলেন,

> إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد مورثة للفشل مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف
>
> তোমরা সীমাতিরিক্ত পানাহার থেকে সাবধান থাক। কেননা অতিরিক্ত পানাহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, অকর্মন্যতা আনয়নকারী ও সালাত থেকে অলসকারী। তোমরা পানাহারের ক্ষেত্রে

---

[২৬] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৬-২৭

[২৭] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৮০৯, পৃ. ৩০৮

[২৮] সূরা আনআম, আয়াত : ১৪১

> মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। কেননা পরিমিত পানাহার শরীরের জন্য উপকারী এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে।[২৯]

আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য আয় বুঝে ব্যয় করা, অপচয়, অপব্যয় থেকে বিরত থাকার কোন বিকল্প নাই। যা সম্পুর্ণরুপে ইসলাম সমর্থিত।

৪.২.৩. মাদকসহ অন্যান্য নেশার প্রতি আসক্তি

মাদক এমন একটি পদার্থ, যা একটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে, ক্ষতি সাধন করে তার দ্বীন ও দুনিয়ার। মাদক পরিবার-পরিজন ও জ্ঞাতি-বংশকে এমন বিপদ-বিপর্যয়ের মাঝে ফেলে দেয়, যা থেকে বের হয়ে আসা, যা থেকে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। মাদক সমাজ ও জাতির রুহানী, বৈষয়িক এবং চারিত্রিক অস্তিত্বের প্রশ্নে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা.) লোকজনের সামনে এই ঘোষনা দিয়েছিলেন- الخَمرُ ما خامر العَقلَ -"মদ/মাদক হল তা, যা মস্তিষ্কে মাদকতা আনয়ন করে। জ্ঞান বুদ্ধি লোপ করে দেয়"।[৩০] মাদকের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
>
> হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারির তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শয়তানতো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা?[৩১]

মাদক মানব জাতিকে যতটা কঠিন আঘাত হেনেছে, ততটা কঠিন আঘাত আর অন্য কোনো কিছু হানতে পারে নি। যদি এ ব্যাপারে ব্যাপক পরিসংখ্যান চালানো যায় যে, বিশ্বের চিকিৎসালয় গুলোতে যে সমস্ত রোগাক্রান্ত মানুষ থাকে, তাদের মধ্যে কতজন মাদকের কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত ও দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে যায়; কতজন মাদকের কারণে আত্মহত্যা করে, অন্যকে খুন করে; বিশ্বের কতজনের উপর এই মাদকের কারণে স্নায়ুবিক, পাকস্থলীক এবং নাড়িতন্ত্রিক রোগের অভিযোগ ওঠে; এই মাদকের কারণে কত জন মানুষ তার নিজের ধন-সম্পদ উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব ও সর্বশান্ত হয়ে যায়; কত জন মানুষ এই মাদকের কারণে তার মালিকানাকে বিক্রি করে দেয় কিংবা প্রতারণার জালে পড়ে তা হারিয়ে বসে। নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে যায়। মাদকের এই ভয়াবহতার কারণে নবী কারীম (স.) মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণির ব্যক্তির উপরে লানত দিয়েছেন। তারা হল-

> لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ

---

[২৯] ইবনু মুফলিহ আল-মাক্বদিসী, *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৩৯১ হি., খ. ২, পৃ. ২০১

[৩০] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস নং- ৫১৮৭, পৃ. ২১৫-২১৬

[৩১] সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯০-৯১

> মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ প্রকার মানুষের উপর রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিসম্পাত করেছেন। তার প্রস্তুতকারীর উপর, যে প্রস্তুত করায় তার উপর, তার পানকারীর উপর, যে তা বয়ে নিয়ে যায় তার উপর, যার জন্য বয়ে নিয়ে যায় তার উপর, যে পান করায় তার উপর, যে তা বিক্রি করে তার উপর, যে (বিক্রি করে) তার অর্থ খায় তার উপর এবং যে ক্রয় করে ও যার জন্য ক্রয় করা হয় তাদের উপর।[৩২]

হাদিসের বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, মাদক সেবন ও এর ব্যবসা সবই হারাম। কেননা তা শুধু একজন ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনা বরং তা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

৪.২.৪. একজন কর্মীর সুস্থতা আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সহায়ক

সুস্থ শরীর ও মন মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই সুস্থ থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কেননা রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা উত্তম। এটা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম স্লোগানও বটে। এ জন্য সুস্থ থাকতে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। মানুষের সুস্থ দেহ ও মানসিক প্রশান্তি লাভে ইসলামেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। হাদিসে পাকে প্রিয় নবী (সা.) সুস্থতার প্রতি মর্যাদা দেয়ার তাকিদ দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে- হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اغتنم خمسا قبل خمس ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك

"পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে"।[৩৩]

তাইতো সুস্থ থাকতে প্রিয় নবী (সা.) ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর কাছে তোমরা সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা কর, কারণ ঈমানের পর সুস্বাস্থ্যের চেয়ে অধিক মঙ্গলজনক কোনো কিছু কাউকে দান করা হয়নি।[৩৪]

অনেক কারণে মানুষের সুস্থ থাকা জরুরি। বিশেষ করে ইসলাম সুস্থ থাকার গুরুত্ব অত্যাধিক। আল্লাহর হুকুম পালনে কিংবা ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। পরনির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার জন্য সুস্থতা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুস্থ না থাকলে আয় উপার্জন বাঁধা গ্রস্থই হবে না বরং রোগের পিছনে ব্যয় বেড়ে যাবে। তাই সুস্থ না থাকলে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন যেমন সম্ভব নয় তেমনি উপার্জনও সম্ভব নয়।

হাদিসে এসেছে- "দুর্বল মুমিনের তুলনায় শক্তিশালী মুমিন অধিক কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ"।[৩৫]

অন্য হাদিসে এসেছে- نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ "অধিকাংশ মানুষ দুটি নিয়ামত সম্পর্কে সচেতন নয়। আর তাহলো- সুস্থতা এবং অবসর"।[৩৬]

---

৩২ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, ২০০২, খ. ৩, হাদীস নং- ৩৩৮১, পৃ. ২৩৮-২৩৯

৩৩ আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী আল-বাইহাকী, *আল জামে লি শু'আবিল ঈমান*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, তা. বি., হাদীস নং- ১০২৪৮

৩৪ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৩৮৪৯, পৃ. ৪১১-৪১২

৩৫ *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৪১৬৮, পৃ. ৫৮০

পরকালে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ সুস্থতার সময় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করবেন। প্রত্যেক বান্দাকেই জিজ্ঞাসা করা হবে- আমি কি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দেইনি?[৩৭]

সুতরাং যদি কোনো বান্দা অসুস্থ হয়ে যায় তবে তাকে চিকিৎসা গ্রহণ করাও জরুরি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। লোকদের চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করতেন। চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন-

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক তিনি সৃষ্টি করেননি। তবে একটি রোগ আছে যার কোনো প্রতিষেধক নেই, তাহলো বার্ধক্য"।[৩৮] ইসলামের যাবতীয় ইবাদাত পালন ও আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সুস্থতার কোন বিকল্প নেই।

৪.২.৫. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে কারিগরি শিক্ষা : ইসলামের নির্দেশনা

শিক্ষাই হচ্ছে যে কোন জাতির মেরুদন্ড। আর শিক্ষিত জনশক্তিই হচ্ছে একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের মূল শক্তি। বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সমস্যাকেই সরকার দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইসলামীক দৃষ্টিকোণে জনসংখ্যা সমস্যা নয়। কারণ শুধু মানুষ নয় সৃষ্টিজগতের প্রাণিকুলের রিজিকের ব্যবস্থাও তিনি করে থাকেন। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন এরশাদ করেছেন,

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

"আর যমীনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই"।[৩৯]

তাই ইসলামীক দৃষ্টিকোনে জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়। বরং দক্ষ, কর্মঠ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের চালিকা শক্তি। শিক্ষিত জনশক্তির বেশির ভাগই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- বেকার সমস্যা নিরসনকল্পে আমরা সাধারণ শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করবো, না কারিগরি শিক্ষার প্রতি? বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একথা আজ সত্য যে, জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে কারিগরি শিক্ষার প্রতিই আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা এ ধরনের শিক্ষার প্রসারে বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, শিক্ষাও স্বল্পমেয়াদী এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ্রাম ও শহরের দারিদ্র পীড়িত এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব দূরীকরণে কারিগরি শিক্ষা একমাত্র উপায় যা দ্বারা তাদেরকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালের এক জরিপে দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষি কাজে জড়িত । অথচ পূর্বে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। অপ্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ফলে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে। এখনও গ্রামে কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অকৃষি মৌসুমে বলতে গেলে বেকারই থাকে। তাদেরকে আধুনিক কৃষি ও চাষাবাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দিতে পারলে উৎপাদন বাড়বে, অর্থনীতির চাকা সচল হবে, এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ ধরনের কাজকে নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন,

---

৩৬ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৫৯৭০, পৃ. ৩৫

৩৭ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৩৩৫৮, পৃ. ৭৫

৩৮ *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৩৮১৫, পৃ. ২৭৫

৩৯ সূরা হুদ, আয়াত : ০৬

> হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে একটি খেজুর বাগান অতিক্রম করছিলাম। তিনি লোকেদেরকে দেখলেন যে, তারা নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেন- এরা কী করছে? তালহা (রা.) বলেন, তারা নর গাছের কেশর নিয়ে মাদী গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি বলেনঃ এটা কোন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। লোকজন তাঁর মন্তব্য অবহিত হয়ে উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। ফলে খেজুরের উৎপদান হ্রাস পেলো। নবী (সা.) বিষয়টি অবহিত হয়ে বলেন, "এটা তো ছিল একটা ধারণা মাত্র। ঐ প্রক্রিয়ায় কোন উপকার হলে তোমরা তা করো। আমি (এ বিষয়ে) তোমাদের মতই একজন মানুষ। ধারণা কখনো ভুলও হয়, কখনো ঠিকও হয়। কিন্তু আমি তোমাদের এভাবে যা বলি আল্লাহ বলেছেন, সেক্ষেত্রে আমি কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবো না"।[৪০]

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল ফসল ফলানো সম্পূর্ণরুপে বৈধ অন্যথায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করতেন। এছাড়াও স্বীয় উদ্যোগে কারিগরি জ্ঞান যেমন-মাছ ধরার বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরি, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন দ্রব্য (ডাল, কুলা, চালুনি) তৈরির মাধ্যমে তারা অকৃষি মৌসুমেও কাজে নিয়োজিত থাকে। মানুষের শ্রম আছে। এ শ্রমের সাথে কারিগরি জ্ঞানের মিশ্রণ দারিদ্র দূর করে তাদেরকে আত্মনির্ভর করতে পারে।

শিক্ষিত বেকার ও নিরক্ষর বেকারদের যদি বিভিন্ন ট্রেডকোর্স যেমন- মোটর ড্রাইভিং, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক, কার্পেন্ট্রি, টাইপিং, প্রিন্টিং, সেলাই প্রভৃতি কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান দান সম্ভব হয়, তাহলে দ্রুত বেকার সমস্যার হাত থেকে দেশ মুক্তি পেতে পারে।

সমাজের বর্তমান লক্ষ লক্ষ বেকার নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো এখন অত্যাবশ্যক। যদি এ কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায় আর তাদেরকে মাছের চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, পশুপালন, ফলের চাষ, ড্রয়িং, গ্রাফিকস ডিজাইন, পোল্ট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, বুটিকশিল্প, কম্পিউটার ট্রেনিং অ্যান্ড সার্ভিসিং, মোবাইল সার্ভিসিং, সেলাই, ইলেকট্রনিক সামগ্রী সার্ভিসিং, সেলুন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, লেদ মেশিন স্থাপন, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, হোটেল সংক্রান্ত ট্রেনিং, দর্জি, কলকারখানার কাজ, সেলসম্যানশিপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন আরো সহজ হবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : বর্তমান সময়ের দ্রুত বিকাশমান একটি শিল্প হলো পর্যটন শিল্প। এ শিল্প তার বহুমাত্রিক বৈচিত্রের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পে উপার্জন বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে ১৯৯৯ সালে পর্যটন খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়েছিল ২৪৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা। এটি বেড়ে গিয়ে ২০০৮ সালে ৬১২ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশের GDP-এর প্রায় ২ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। পর্যটন শিল্পে প্রায় দশ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১২ সালে মোট জিডিপির ৪.৩ শতাংশ এসেছে পর্যটন খাত থেকে টাকার অংকে যা প্রায় ৩৯ হাজার ৮০ কোটি টাকা। এ ছাড়া কেবল ২০১২ সালেই পর্যটন খাতের সাথে জড়িত ছিল ১২ লাখ ৮১ হাজার ৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। যা মোট চাকরির ১.৮ শতাংশ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও আত্মনির্ভর জাতি গঠনে পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় খাত। World Travel & Tourism Council (WTTC)-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি ২০২৩ সালে বৈশ্বিক পর্যটন খাতের সম্মিলিত আয় ৯ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন বা ৯ লাখ ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। যা ২০১৯ সালের বৈশ্বিক ভ্রমণ ও পর্যটন খাতের আয়ের চেয়ে মাত্র ৫ শতাংশ কম। ২০২২ সালে এই খাতের আয়

---

[৪০] *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ২৪৭০, পৃ. ৪১১

২২ শতাংশ বেড়ে ৭ দশমিক ট্রিলিয়ন বা ৭ লাখ ৭০ হাজার কোটি ডলারে ওঠে। এই আয় ২০২২ সালের বৈশ্বিক অর্থনীতির ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৯ সালের পর এটিই ভ্রমণ ও পর্যটন খাতের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক অবস্থান।

করোনা মহামারির আগে এই খাতে কর্মসংস্থান ছিল ৩৩৪ মিলিয়ন বা ৩৩ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষের। কিন্তু মহামারির প্রথম বছর ২০২০ সালে খাতটিতে কর্মসংস্থান ৭০ মিলিয়ন বা ৭ কোটি কমে ২৬৪ মিলিয়ন বা ২৬ কোটি ৪০ লাখে নেমে যায়। তবে ২০২১ সালে নতুন ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লাখ এবং ২০২২ সালে ২১ দশমিক ৬ মিলিয়ন বা ২ কোটি ১৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। বদৌলতে কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার করা হয়। এর ফলে বৈশ্বিক পর্যটন খাতে মোট কর্মসংস্থান দাঁড়ায় ২৯৬ দশমিক ৬০ মিলিয়ন বা ২৯ কোটি ৬৬ লাখ।[৪১]

৪.২.৬. জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করতে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব

নানা নান্দনিক সৌন্দর্যের কেন্দ্র হলো বাংলাদেশ। এদেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলো নানা বৈচিত্র্যের সমাহার। কোনোটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কোনোটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত আবার কোনোটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের নান্দনিক স্মারক হয়ে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যে দেশ, ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক, এবং ঐতিহাসিক সকল সম্পদ দিয়েই সমৃদ্ধ। এ কারণে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন ঘটছে। ইতিহাস খ্যাত পর্যটক ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইবনে বতুতার মত পর্যটক হয়ে এ দেশ ভ্রমণের কাহিনী সবার জানা। বাংলাদেশে পর্যটন কেন্দ্রগুলো বৈচিময় হওয়ার কারণে পর্যটকদের মধ্যেও বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলোর নাম ও অবস্থান তুলে ধরা হলো-

১. সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন, খুলনা।
২. কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার।
৩. সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ, কক্সবাজার।
৪. কুয়াকাটা এক জায়গায় থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার জন্য বিখ্যাত স্থান, পটুয়াখালী।
৫. মহাস্থানগড় প্রাচীন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত, বগুড়া।
৬. সোনারগাঁও লোকশিল্পের জন্য বিখ্যাত, নারায়ণগঞ্জ।
৭. পাহাড়পুর/সোমপুর বিহার বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত, নওগাঁ।
৮. মাধবকুন্ড বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক জলপ্রপাত, সিলেট।
৯. শিলাইদহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের অনেকাংশ কাটিয়েছেন এই স্থানে। এখানে তার কুঠিবাড়ি রয়েছে, কুষ্টিয়া।
১০. ষাটগম্বুজ মসজিদ ও দিঘি মধ্যযুগে ইসলামী সংস্কৃতির গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশলে এটি একটি অনন্য সৃষ্টি, বাগেরহাট।
১১. সীতাকোট বিহার প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, দিনাজপুর।
১২. ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, কুমিল্লা ।
১৩. সিলেটের চা বাগান, সিলেট।
১৪. লালবাগ কেল্লা, ঢাকা।

---

৪১ "বৈশ্বিক পর্যটন খাত করোনার আগের অবস্থায় ফিরেছে", বাণিজ্য ডেক্স, বিশ্ববাণিজ্য পাতা, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ এপ্রিল ২০২৩। লিংক : https://www.prothomalo.com/business/world-business/0vpkw58p3f

১৫. নীলগিরি, বান্দরবান।
১৬. পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, চট্টগ্রাম।
১৭. নবাব বাড়ি, ঢাকা।
১৮. ভাসমান সবজিচাষ, পিরোজপুর।
১৯. ভাসমান বাজার, পিরোজপুর।
২০. বলধা গার্ডেন, ঢাকা।
২১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর।
২২. বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, গাজীপর।
২৩. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররাম, ঢাকা।
২৪. সাজেক, বান্দরবান।

এছাড়াও আরো বহু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান বাংলাদেশে রয়েছে, যা মনোমুগ্ধকর ও দৃষ্টিনন্দন।

বিনোদনের উৎস হিসেবে মানুষ যতগুলো মাধ্যম বেছে নেয় ভ্রমণ তার মধ্যে অন্যতম। আর ভ্রমণ পিপাসু মানুষের নিত্য চাহিদার উপর ভিত্তি করে পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠেছে হাজারো পর্যটন কেন্দ্র। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অবিরাম চেষ্টা চলছে। আর এই চিন্তা চেতনা থেকেই পর্যটন গড়ে উঠেছে শিল্প হিসেবে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে পর্যটকদের আগমন আজও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে পর্যটন শিল্প। এটি এমন একটি খাত যার মাধ্যমে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তাই সরকারী ও বেসরকারীভাবে এ খাতটিকে বিস্তার ঘটাতে পারলে এ দেশের অনেক বেকার জনগোষ্ঠী আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

৪.৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান : বাস্তবতা ও ইসলামী নির্দেশনা

৪.৩.১. হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। আল্লাহ পাক তাকে প্রথমেই পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, পড়, তোমার প্রভুর নামে।[৪২] শিক্ষার এই মহান বাণী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলো শিক্ষা ও উন্নয়নের ধর্ম ইসলাম। নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সূচনা করে ছিলেন তার নবুয়তি জীবনের। একটি সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে । আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানব জাতির শিক্ষকরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করেন।

প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সব নবীই ছিলেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত এবং সু-শিক্ষার ধারক ও বাহক। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সে ধারার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম প্রেরিত পুরুষ। তার মাধ্যমে ঐশী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি তার কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের মূর্খ ও বর্বর একটি জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান এবং ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

---

৪২ সুরা আলাক, আয়াত: ১

হযরত রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা মিশন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেন, "তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা। যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। যদিও ইতোপূর্বে তারা ভ্রান্তিতে (অজ্ঞতায়) মগ্ন ছিলো"।[৪৩] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই বলেন, "নিশ্চয় আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি"।[৪৪]

তার অনুপম শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন তার পুণ্যাত্মা সাহাবি ও শিষ্যগণ। আর কেনোই বা তিনি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হবেন না, যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। যার বদৌলতে তিনি অজ্ঞ, অনাহারী, অনগ্রসর, চরম পাপাচারিতায় লিপ্ত একটি জাতিকে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক আদর্শে আদর্শবান, আত্মনির্ভরশীল ও সর্বোত্তম চরিত্রে চরিত্রবান করতে সক্ষম হয়েছিলেন একমাত্র ওহীর জ্ঞানের আলোকে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারার কারণে। তার প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সর্বকালের, সর্বযুগের মানুষের কাছে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা।

তাই জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে রাসূল (সা.)-এর অনুসৃত কয়েকটি শিক্ষা পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

৪.৩.১.১. উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য। কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষক উভয়ের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষা করতেন। হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় বিদায় হজের সময় হযরত রাসূল (সা.) তাকে বলেন, মানুষকে চুপ করতে বল। অতপর তিনি বলেন, আমার পর তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফরিতে ফিরে যেও না।[৪৫]

অর্থাৎ হযরত রাসূল (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের সুযোগ দিতেন। অতপর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষাদান শুরু করতেন।

৪.৩.১.২. থেমে থেমে কথা বলে উপস্থাপন

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেনো তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। খুব দ্রুত কথা বলতেন না যেনো শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এতো ধীরেও বলতেন না যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠ দান করতেন। হযরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা কী জানো- আজ কোন দিন? ...এটি কোন মাস? ...এটি কী জিলহাজ নয়? ...এটি কোন শহর?[৪৬] প্রতিটি প্রশ্নের পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকেন এবং সাহাবারা উত্তর দেন আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন।

---

৪৩ সূরা আল-জুমুআ, আয়াত : ০২

৪৪ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ২২৯, পৃ. ১২২-১২৩

৪৫ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৬৬০০, পৃ. ৩৭৭

৪৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, হাদীস নং- ১৬৩২, পৃ. ১৬৫-১৬৬

৪.৩.১.৩. ভাষা ও বাচনভঙ্গির ব্যবহার

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে, তার দেহাবয়বেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হতো। তিনি দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠ দান করতেন। কারণ, এতে বিষয়ের গুরুত্ব, মাহাত্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রোতা শিক্ষার্থীগণ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হয় এবং বিষয়টি তার অন্তরে গেঁথে যায়। যেমন, তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তার দেহে আনন্দের স্ফূরণ দেখা যেতো। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রঙ বদলে যেতো। যখন কোনো অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে বলতেন, তার চেহারায় ক্রোধ প্রকাশ পেতো এবং কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেতো। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হযরত রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন- তার চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো। যেনো তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী"।[৪৭]

৪.৩.১.৪. গল্প বলার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে সহজ করে তোলা

গল্প-ইতিহাস জ্ঞানের সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে অনেক সময় গল্প-ইতিহাস বলতে হয়। হযরত রাসূল (সা.) ও পাঠদানের সময় গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন অত্যন্ত মিষ্টি করে। এমন মিষ্টি ভঙ্গি গল্প-ইতিহাস স্বপ্রাণ হয়ে উঠতো। জীবন্ত হয়ে উঠতো শ্রোতা-শিক্ষার্থীর সামনে।

> হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, দোলনায় কথা বলেছে তিন জন। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ...। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি (মুগ্ধ হয়ে) হযরত রাসূল (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আমাকে শিশুদের কাজ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি তার মুখে আঙুল রাখলেন। এবং তাতে চুমু খেলেন। অর্থাৎ তিনি শিশুদের মতো ঠোঁট গোল করে তাতে আঙুল ঠেকালেন।[৪৮]

৪.৩.১.৫. শিক্ষার্থীর নিকট প্রশ্ন করে জানার আগ্রহ তৈরি করা

হযরত রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করতেন। যেনো তারা প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়। কেননা নিত্যনতুন প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে নিত্যনতুন জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহী করে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সাহাবীদের বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর জন্য প্রশ্ন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর হযরত রাসূল (সা.) প্রশ্নের উত্তর বলে দিতেন। আর এটা এ জন্য যে, যাতে সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়। যেমনটি একটি হাদিসে হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন,

> "তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, (গিবত হলো) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে বাস্তবিকই থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে প্রকৃতই থেকে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে"।[৪৯]

৪.৩.১.৬. বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী অনেক বেশি মনোযোগী হয়। একাগ্র হয়ে শিক্ষকের আলোচনা শোনে। হযরত রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন।

---

৪৭ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৫, পৃ. ৫৫-৫৬

৪৮ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৩১৯৪, পৃ. ১২৫-১২৮

৪৯ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৩৫৭, পৃ. ১১৮

> হযরত সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (সা.) তাকে বলেন, "মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছে করলাম হযরত রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কুরআনে সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেবো। অতপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন"।[৫০]

অর্থাৎ হযরত রাসূল (সা.) তাকে সূরা ফাতেহা শিক্ষা দেন।

৪.৩.১.৭. প্রশিক্ষণার্থীর আগ্রহের দিকে খেয়াল রাখা

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। যেনো শেখানো বিষয়টি দ্রুত ও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (সা.) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে এবং তার উপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন"।[৫১]

৪.৩.১.৮. উদাহরণ দিয়ে বোঝানো

নবী কারীম (সা.) অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। কেননা উপমা ও উদাহরণ দিলে যে কোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়ে যায়। হযরত সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, "আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো। হযরত সাহাল (রা.) বলেন, হযরত রাসূল (সা.) তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন"।[৫২]

৪.৩.১.৯. শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার সুযোগদান

শিক্ষাদানকালে আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এসব প্রশ্নের সমাধান না পেলে অনেক সময় পুরো বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। আর প্রশ্নের উত্তর দিলে বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে আরো আগ্রহী হয়। হযরত রাসূল (সা.) শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ করতেন এবং প্রশ্ন করার জন্য কখনো কখনো প্রশ্নকারীর প্রসংশাও করতেন। এক ব্যক্তি হযরত রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করে, "আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নিবে। নবী কারীম (সা.) থামলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতপর বললেন, তাকে তওফিক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে"।[৫৩]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, হযরত রাসূল (সা.) প্রশ্নটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি। বরং তিনি চুপ থাকেন এবং সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রশ্নকারীর প্রশংসা করেন। যাতে প্রশ্নটির ব্যাপারে সকলের মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সকলেই উপকৃত হতে পারে।

---

৫০ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, হাদীস নং- ৪১২২, পৃ. ২৫৩-২৫৪

৫১ *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদীস নং- ৮০৯৫, পৃ. ৪৫৮

৫২ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস নং- ৫৫৭৯, পৃ. ৪০৫

৫৩ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ১২, পৃ. ৮১

৪.৩.১.১০. হাতে-কলমে শিক্ষাদান

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো প্রাক্টিক্যাল বা প্রয়োগিক শিক্ষা। হযরত রাসূল (সা.) অধিকাংশ বিষয় নিজে আমল করে সাহাবিদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে-কলমে। এজন্য হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন। হযরত রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা নামাজ আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো।[৫৪]

৪.৩.১.১১. বিবেকের মুখোমুখি করা

বিবেক মানুষের বড় রক্ষক। বিবেক জাগ্রত থাকলে মানুষ নানা অপরাধ থেকে বেঁচে যায় এবং বিবেক লুপ্ত হলে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি সহজ উপায় হলো- মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। হযরত রাসূল (সা.) বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন। যেমন-

> এক যুবক হযরত রাসূল (সা.) কে বললো। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা মারমুখি হয়ে উঠলো এবং তিরস্কার করলো। হযরত রাসূল (সা.) তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কী তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ কর? সে বললো, আল্লাহর শপথ না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। হযরত রাসূল (সা.) বললেন, "কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করেনা। এরপর হযরত রাসূল (সা.) একে একে তার সব নিকট নারী আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে না উত্তর দেয়। এভাবে হযরত রাসূল (সা.) তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন"।[৫৫]

৪.৩.১.১২. প্রয়োজনে চিত্রের সাহায্যে আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট করা

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য হযরত রাসূল (সা.) রেখাচিত্র ও অঙ্কনের সাহায্য নিতেন। যেনো শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে। হাদীস শরীফে এসেছে-

> হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (সা.) একটি চারকোণা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন। যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা।[৫৬]

এভাবে হযরত রাসূল (সা.) রেখাচিত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন ও জীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয় স্পষ্ট করে তুললেন।

৪.৩.১.১৩. বার বার প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান

রাসূলে আকরাম (সা.) শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর না করে বার বার প্রশিক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন; বরং বার বার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে আয়ত্ব করতে বলতেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা কুরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে"।[৫৭]

---

[৫৪] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ৬০৩, পৃ. ৫২

[৫৫] *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৬, হাদীস নং- ২২২১১, পৃ. ৫৪৫

[৫৬] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৫৯৭৫, পৃ. ৩৭

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, হাদীস নং- ৪৬৬৩, পৃ. ৩৬৪

৪.৩.১.১৪. আশা ও ভয়ের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি

রাসূলে আকরাম (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের অনাগত জীবন সম্পর্কে যেমন আশাবাদী করে তুলতেন, তেমনি তার চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। যেমন- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (সা.) একটি ভাষণ দিলেন। আমি এমন ভাষণ আর শুনিনি। তিনি বলেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

"আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে"।[৫৮]

হযরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো এবং তার উপর মৃত্যুবরণ করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? হযরত রাসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ। যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে।[৫৯]

৪.৩.১.১৫. প্রশিক্ষণার্থীদের মুক্ত আলোচনার সুযোগ প্রদান

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বহু জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ হয়ে যায় এবং উত্তম সমাধান পাওয়া যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও বহু বিষয় মুক্ত-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। সমাধান বের করতেন। যেমন, হুনায়নের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে হযরত রাসূল (সা.) তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

৪.৩.১.১৬. কথার পুনরাবৃত্তি করা

হযরত রাসূল (সা.) তার শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিন বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হযরত রাসূল (সা.) তার কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভালোভাবে বোঝা যায়"।[৬০]

৪.৩.১.১৭. ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। হাদিস শরীফে এসেছে-

> হযরত আবূ মাসউদ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি নামাজ দীর্ঘায়িত করে ফেলে। আমি উপদেশ বক্তৃতায় হযরত রাসূল (সা.) কে সেদিনের তুলনায় আর কোনোদিন বেশি রাগ হতে দেখিনি। হযরত রাসূল (সা.) বলেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমরা অনীহা সৃষ্টিকারী। সুতরাং যে মানুষ নিয়ে (জামাতে) নামাজ আদায় করবে, সে তা যেনো হাল্কা করে (দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ্য, দুর্বল ও জুল-হাজাহ (ব্যস্ত) মানুষ রয়েছে।[৬১]

---

[৫৮] *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, হাদীস নং- ৪২৬৬, পৃ. ৩৪৬

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, হাদীস নং- ৫৪১০, পৃ. ৩৩২

[৬০] *প্রাগুক্ত*, খ. ১, হাদীস নং- ৯৫, পৃ.৭২

[৬১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৯০, পৃ.৭০

৪.৩.১.১৮. প্রয়োজনে শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন

গুরুতর অপরাধের জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো তার শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে সংশোধন করতেন। তবে হযরত রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় শারীরিক শাস্তি এড়িয়ে যেতেন। ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) সহ কয়েকজনের সঙ্গে হযরত রাসূল (সা.) কথা বলা বন্ধ করে দেন। যা শারীরিক শাস্তি র তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিলো। হযরত রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতির সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের দীর্ঘ কলেবরের স্বতন্ত্র বই রয়েছে।

শিক্ষাদান পদ্ধতিতে হযরত রাসূল (সা.)-এর সাফল্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে। তাহলো-

> স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। অতপর আল্লাহতা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সঞ্চার করলেন। তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাইয়ে পরিণত হলে। প্রকৃতার্থে তোমরা অবস্থান করছিলে অগ্নিকুন্ডের প্রান্ত সীমায়। অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।[৬২]

অর্থাৎ হযরত রাসূল (সা.) পতনুখ একটি জাতিকে তার কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান। তার শিক্ষা ও সাফল্য শুধু ইহকালীন সাফল্য বয়ে আনেনি; বরং তার পরিব্যপ্তি ছিলো পরকালীন জীবন পর্যন্ত। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে যদি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হয় এবং উভয় জগতের সাফল্য অর্জন করতে হয়, তবে অবশ্যই হযরত রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৪.৩.২. নবী-রাসূলদের জীবন থেকে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগে সব জাতির কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, প্রতিটি জাতির জন্য পথ-প্রদর্শনকারী রয়েছে।[৬৩] অন্যত্র এরশাদ করেছেন, আমি রাসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দেই না।[৬৪]

সব নবী-রাসুলের কোনো না কোনো পেশা ছিল, তাঁরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হতেন না। বরং স্বীয় হস্তে অর্জিত জিনিস ভক্ষণ করাকে পছন্দ করতেন। মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ধরনের উপার্জন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, ব্যক্তির নিজ হাতে কাজ করা এবং সৎ ব্যবসা।[৬৫] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হালাল রুজি অর্জন করা ফরজের পর একটি ফরজ।[৬৬]

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ছিলেন একজন কৃষক। তিনি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর ছেলেদের পেশাও ছিল চাষাবাদ। তা ছাড়া তিনি তাঁতের কাজও করতেন। কারো কারো

---

৬২ সূরা আল-ইমরান. আয়াত : ১০৩

৬৩ সুরা আর রাদ, আয়াত : ১৩

৬৪ সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৬৫

৬৫ *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, খ ২৮, হাদীস নং- ১৭২৬৫, পৃ. ৫০২

৬৬ *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ২৭৮১, পৃ. ১৫

মতে, তাঁর পুত্র হাবিল পশু পালন করতেন। কৃষিকাজের যন্ত্রপাতির নাম আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ আদম (আ.) কে সব নামের জ্ঞান দান করেছেন।[৬৭]

হযরত নুহ (আ.) ছলেন কাঠমিস্ত্রি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৌকা তৈরির কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে তিনি নৌকা তৈরি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুসারে নৌকা তৈরি কর। আর যারা যুলম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোন আবেদন করো না। নিশ্চয় তাদেরকে ডুবানো হবে"।[৬৮]

তিনি ৩০০ হাত দীর্ঘ, ৫০ হাত প্রস্থ, ৩০ হাত উচ্চতাসম্পন্ন একটি বিশাল নৌকা তৈরি করেন। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি লাভজনক ব্যবসা। আর এ খাতকে ঘিরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে।

হযরত ঈসা (আ.) এক ব্যক্তিকে অসময়ে ইবাদাত খানায় দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে বসে ইবাদত করছ, তোমার রিজিকের ব্যবস্থা কে করে? লোকটি বলল, আমার ভাই আমার রিজিকের ব্যবস্থা করে। ঈসা (আ.) তাকে বলেন, সে তোমার চেয়ে অনেক উত্তম।[৬৯] হযরত ঈসা (আ.) চিকিৎসক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করব ও আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব"।[৭০] কবির ভাষায়- *নবীর শিক্ষা কোরো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে।* নবী-রাসূলরা হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁরা স্বহস্তে অর্জিত সম্পদে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হযরত শিস (আ.)ও কৃষক ছিলেন। তাঁর পৌত্র মাহলাইল সর্বপ্রথম গাছ কেটে জ্বালানি কাজে ব্যবহার করেন। তিনি শহর, নগর ও বড় বড় কিল্লা তৈরি করেছেন। তিনি বাবেল শহর প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত ইদরিস (আ.)-এর পেশা ছিল কাপড় সেলাই করা। أنّ إدريس عليه السلام كان يعمل بالخياطة "নিশ্চয়ই ইদরিস (আ.) কাপড় সেলাইয়ের কাজ করতেন"।[৭১] কাপড় সেলাই করে যে অর্থ উপার্জন করতেন, তা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদল পন্ডিত মনে করেন, হিকমত ও জ্যোতির্বিদ্যার জন্ম ইদরিস (আ.)-এর সময়ই হয়েছিল।

হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনী পাঠান্তে জানা যায় যে, তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য কখনো ব্যবসা, আবার কখনো চাষাবাদ করতেন أنّهم اشتغلا بالزّراعة -তারা কৃষি কাজ করতেন।[৭২] হযরত ইসমাঈল (আ.) পশু শিকার করতেন। তিনি ও তাঁর পিতা উভয়ই ছিলেন ইমারত নির্মাতা। পিতা-পুত্র মিলে আল্লাহর ঘর তৈরি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

---

৬৭ সুরা বাকারা, আয়াত : ৩১

৬৮ সূরা হুদ, আয়াত : ৩৭

৬৯ আব্দুর রহমান ইবনুল কামাল জালাল উদ্দীন সূয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর ফিত্ তাফসীরিল মা'সুর*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ২২০

৭০ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৪৯

৭১ মুহাম্মাদ আল-শায়বানী, *আল-কাসাবু*, দামেশক : আব্দুল হাদী হারসুনী, ১৪০০ হি., পৃ. ৩৫

৭২ আহমাদ আত-তাবীল, *ইত্তিক্বাউল হারামি ওয়াশ শুবহাতু ফী ত্বলাবুর রিযকি*, রিয়াদ : দারুল কুনুয ইশবিলিয়া লিন্নাশারি ওয়াত তাওযী', ২০০৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৬৪

আর (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর।[৭৩]

হযরত ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেতন হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ গ্রহণ করতেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "সে (ইউসুফ) বলল- আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের দায়িত্ব দিন, আমি উত্তম রক্ষক ও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী"।[৭৪] তিনি অর্থ বা সরবরাহের মন্ত্রী ছিলেন, এবং এটি অর্থ, পরিসংখ্যান, সঞ্চয়স্থান এবং বিতরণের সাথে সম্পর্কিত একটি পদ।[৭৫] তিনি দায়িত্ব নিয়ে মিশরে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ চলাকালে মিশরের জনগনের খাদ্যাভাব দুর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মনির্ভরশীলতার বিরল ঘটনা।

হযরত দাঊদ (আ.) ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান ও নবী। হযরত দাঊদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন এ সম্পর্কে বলেছেন,

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَ ۚ وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আমি আমার পক্ষ থেকে দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমি আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর আর পাখীদেরকেও (এ আদেশ করেছিলাম)। আমি লোহাকে তার জন্য নরম করেছিলাম। যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে পার, কড়াসমূহ সঠিকভাবে সংযুক্ত কর আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।[৭৬]

তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে আল্লাহ ! এমন একটি উপায় আমার জন্য বের করে দিন, যেন আমি নিজ হাতে উপার্জন করতে পারি। অতঃপর তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লোহা দ্বারা বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার কৌশল শিক্ষা দেন। শক্ত ও কঠিন লোহা স্পর্শ করলে তা নরম হয়ে যেত। যুদ্ধাস্ত্র, লৌহ বর্ম ও দেহবস্ত্র প্রস্তুত করা ছিল তাঁর পেশা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "তোমাদের কল্যাণার্থে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম সামরিক পোশাক (বর্ম) তৈরির কারিগরি, যাতে যুদ্ধকালে তা তোমাদেরকে পারস্পরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে"।[৭৭] এগুলো বিক্রি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হযরত দাঊদ (আ.) একজন বিচারকও ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি করেছি, কাজেই তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন-বিচার পরিচালনা কর, এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না"।[৭৮]

হযরত সুলাইমান (আ.) ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর শাসক ও নবী। তিনি তাঁর পিতা থেকে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তিনি নিজেও অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। ভিন্ন পেশা গ্রহণ করার চেয়ে নিজ

---

৭৩ সূরা বাক্বারাহ, আয়াত : ১২৭

৭৪ সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৫

৭৫ খালেদ আল-জুরাইসী, *ইদারাতুল ওয়াকতি মিনাল মানযুরিল ইসলামী ওয়াল এদারী*, বৈরুত : এহ্ইয়াউত তুরাসিল আরাবি, ১৪২৪হি., খ. ১, পৃ. ৭৮

৭৬ সূরা সাবা, আয়াত: ১০-১১

৭৭ সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮০

৭৮ সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৬

সম্পদ রক্ষা ও তদারকি করাই ছিল তাঁর প্রদান দায়িত্ব। তিনিও তার পিতারমত নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "আর সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল"।[৭৯]

হযরত মুসা (আ.) ছিলেন পশু চরিয়েছেন। তিনি শ্বশুরালয়ে মাদায়েনে পশু চরাতেন। সিনাই পর্বতের পাদদেশে বিরাট চারণভূমি মাদায়েনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লোকজন সেখানে পশু চরাত। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসা (আ.)। আট বছর তিনি স্বীয় শ্বশুর শোয়াইব (আ.)-এর পশু চরিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي

হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? সে বলল, এটা আমার লাঠি, আমি ওতে ভর দেই, এর সাহায্যে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে দেই আর এতে আমার আরো অনেক কাজ হয়।[৮০] হযরত হারুন (আ.)-এর পেশাও ছিল পশু পালন। পশু পালন করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে মহানবী (সা.) বলেছেন, জাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। তাঁর শত্রুরা তাঁর করাত দিয়েই তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে।[৮১]

ঈসা (আ.) ও মরিয়ম (আ.)-এর আবাসস্থল প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমি তাদের উভয়কে এক উচ্চ ভূমি প্রদান করেছিলাম, যা সুজলা ও বাসযোগ্য ছিল।[৮২] এই উচ্চ ভূমি হলো ফিলিস্তিন। তিনি ফিলিস্তিনে উৎপন্ন ফলমূল খেয়ে বড় হয়েছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে অলিতে-গলিতে দ্বিনের দাওয়াতি কাজ করতেন। যেখানে রাত হতো, সেখানে খেয়ে না খেয়ে নিদ্রা যেতেন।

মহানবী (সা.) ছিলেন একজন সফল ও সৎ ব্যবসায়ী। তিনি এরশাদ করেছেন, التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সঙ্গে।[৮৩] তিনি গৃহের কাজ নিজ হাতে করতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন। নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই ও ধোলাই করতেন, গৃহ ঝাড়ু দিতেন। মসজিদে নববী নির্মাণকালে শ্রমিকের মতো কাজ করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতেন। আল্লাহ সুবঃ এরশাদ করেছেন,

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا

"তারা বলে এ কেমন রাসূল যে খাবার খায়, আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে?"[৮৪] নবী-রাসূলদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এই যে বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা কখনো ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতেন না এবং সঞ্চয় করা পছন্দও করতেন না। তথাপি যেহেতু তাঁরা মানুষ ছিলেন, সেহেতু বৈষয়িক প্রয়োজনে

---

৭৯ সূরা আন নমল, আয়াত : ১৬

৮০ সূরা ত্বহা, আয়াত : ১৭-১৮

৮১ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৫৯৪৭, পৃ. ৩৫২

৮২ সুরা আল মুমিনুন, আয়াত : ৫০

৮৩ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১২১২ পৃ.৪৯৮-৪৯৭

৮৪ সুরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৭

যতটুকু জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন, ততটুকু সম্পদ অর্জনে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। সদা-সর্বদা নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ করা পছন্দ করতেন। মানুষদের থেকে কখনো তাঁরা নজর-নেওয়াজ, এমনকি বেতনও গ্রহণ করতেন না। বরং যথাসম্ভব নিজেদের উপার্জন থেকে গরিব ও দুস্থদের সাহায্য করতেন। সব নবী-রাসূল ছাগল চরাতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন কোনো নবী নেই, যিনি ছাগল চরাননি। জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? প্রত্যুত্তরে হযরত রাসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমিও মক্কায় অর্থের বিনিময়ে ছাগল চরিয়েছি। বলা বাহুল্য যে মহানবী (সা.)-এর সাহাবিরা অনেকেই ব্যবসা করতেন। বিশেষ করে মুহাজিররা ছিলেন ব্যবসায়ী আর আনসাররা ছিলেন কৃষক।

৪.৩.৩. শিশু বয়স থেকেই সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেওয়া

কোনো শিশুই মাতৃগর্ভ থেকে ব্যক্তিত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা শিখে আসে না। একটি শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই মোটামুটি তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। প্রথম পাঁচ বছরে একটি শিশু তার আশপাশে যা দেখে, যাদের সঙ্গে চলাফেরা করে, তাদের কাছ থেকেই বিভিন্ন মানবীয় গুণ শিখে থাকে। এটিকে বলা হয় শিক্ষণপ্রক্রিয়া। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ বিলিয়ন কোষ থাকে। দেহের অন্যান্য কোষ বয়সের সঙ্গে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলেও মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যা একজন মানুষের জীবদ্দশায় অপরিবর্তিত থাকে। আর একটি শিশু বেড়ে ওঠার সময় তাদের মস্তিষ্কের কোষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, আবেগ, অনুভূতি ও স্মৃতি সংরক্ষিত হতে থাকে। আর এই বিষয়গুলোই তার ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি শিশু যখন বেড়ে ওঠে, তখন তার মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য এবং উন্নত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য তার সামনে ইতিবাচক আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা আমাদের সবার কর্তব্য। উন্নত দেশগুলোতে এই কাজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই করে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেটি করা হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শেখানো হয় না। ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বও ঠিকমতো গড়ে ওঠে না। এই শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তাদের মাঝে আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মতো বিষয়গুলো তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা শিশুদের খুবই অল্প সময়ের জন্য আমাদের মাঝে পাই। ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজটি করা আমাদের জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। শিশুর মাঝে নৈতিকতাবোধ তৈরি ও তাদের উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের আরও অনেক বেশি কাজ করতে হবে। এ বয়স থেকেই ছোট ছোট কাজ দিয়ে আত্মনির্ভরতা, নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিতে পারলে বড় হলেও তাদের মধ্যে এর প্রভাব পরিচালক্ষিত হবে। কারণ শিশুরা সাধারণত অনুকরণ প্রিয়।

৪.৩.৩.১. সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল করতে বাবা-মায়ের সচেতনতা

পরিবারই হচ্ছে শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র এবং প্রথম শিক্ষক তার মা-বাবা। মা-বাবা'র কাছ থেকে শিক্ষালাভ শিশুদের সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার। শুধু তাই নয়, পরিবার থেকেই একটি শিশু সুন্দর আচরণের শিক্ষা নেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মা-বাবা নিজেরা ভুলের মধ্যে থাকলেও সন্তানদেরকে সর্বোত্তম শিক্ষাটিই দিতে চান। তবে অনেকেই শিশুকে শেখানোর সঠিক পদ্ধতি জানেন না। অনেক মা-বাবা শিশুদের মতামত একেবারেই গুরুত্ব দিতে চান না। অনেক মা-বাবা এই বাস্তবতাই উপলব্ধি করতে পারেন না যে, তাদের ছোট বেলায় যে সামাজিক পরিবেশ ছিল, তা অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে, মা-বাবাকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সন্তানের মনস্তত্ত্বকে বুঝতে হবে। তাদেরকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়ার পাশাপাশি তারা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে মিশছে- সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক থাকবে, যেখানে মা-বাবা ও সন্তান-উভয়েই উভয়ের মতামতকে গুরুত্ব দেবে এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শিশুর শিক্ষা জীবনে অতি ব্যস্ত মা-বাবা ভুলো মনেই সন্তানের উপর নানা মানসিক চাপ তৈরি করতে থাকে। লক্ষ্য একটাই, পরীক্ষায় ভালো ফল করানো। তারা ভুলে যায় তাদের সন্তানকে একজন মানবীক মানুষ হিসেবে তৈরি করার কথা। তারা ভুলে যায় তাকে একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে, একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কথা। শিশুদের উপর শুধু বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সুবিধা অনুযায়ী তাদের ছুটতে বাধ্য করা হয়।

পৃথিবীতে অনেক কঠিন কাজ আছে, তার মধ্যে অন্যতম কঠিন একটি কাজ হলো সন্তান লালন-পালন। সন্তানের বেড়ে ওঠা এবং যাবতীয় আবদার মেটাতে অধিকাংশ বাবা-মা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তাদের দু'চোখ জুড়ে থাকে স্বপ্নের খনি-তাদের সন্তান বড় হয়ে একদিন তাদের সেই স্বপ্ন পূর্ণ করবে, সমাজে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে।

তাই অনেক সময় দেখা যায়, বাবা-মার সীমাহীন যত্ন আর দেখভাল সত্ত্বেও, অনেক শিশুই বড় হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে তেমন সফলতা পায় না। আবার প্রচন্ড অভাব-অবহেলার মধ্যে জন্ম নিয়েও, বহু ছেলে মেয়ে এক সময় নিজের ক্ষুদ্র গন্ডি পেরিয়ে বড় সফলতার দেখা পায়। তবে কি বাবা-মার যত্নআত্তির কোনো ভূমিকাই নেই সন্তানের বিকাশে? অবশ্যই আছে, কিন্তু শিশুর প্রতি প্রত্যেক বাবা-মায়ের দৈনন্দিন কিছু ভুল আচরণের কারণে সেই যত্ন যেতে পারে বিফলে, সন্তানের জীবন হতে পারে ব্যর্থতা মন্ডিত। চলুন তবে জেনে নিই, এমন কিছু ভুল আচরণ সম্পর্কে।

৪.৩.৩.২. সন্তানকে গালমন্দ বদদোয়া করা

শিশু সন্তানকে বকাঝকা করা আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত একটি চিত্র। এটা সত্যি যে, বাবা-মা সন্তানের ভালো চান বলেই সন্তানের কর্মকান্ড নিয়ে চিন্তিত হন। ছোট অবস্থায় তারা দুষ্টুমি করবেই, তাদের প্রকৃতি বা খেলাধুলার ধরনই এমন। তাই মাঝেমাঝে তারা হয়তো এমন কিছু করে বসে, যা আমাদের সহ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। তাই অনেক সময় কোন কিছু না ভেবে বলে ফেলি, "অনেক হয়েছে; আজ তোর একদিন কি আমার একদিন"! এই বলে যা বলার বলে ফেলেন! অনেক বাবা-মায়ের বদভ্যাস হচ্ছে একটু এদিক-ওদিক হলেই সন্তানকে অভিশাপ, বদদোয়া করে বসেন। আমরা সন্তানের ভালো চাই, আবার রেগে গিয়ে বলি, "তুই জীবনে কিছু করতে পারবি না"! সন্তানকে বকাঝকা করলে সে আরও একগুঁয়ে হয়ে যেতে পারে;মূলত শিশু সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের আচরণের ধরনই সন্তান ভবিষ্যতে কেমন হবে, সেটা অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয়। সন্তানকে বকা দেয়া যেতেই পারে। কিন্তু তাকে শুধরে দেয়ার মন-মানসিকতা থেকে বকা দিচ্ছেন, নাকি কর্তৃত্ব ফলাতে বকা দিচ্ছেন- সেটা ভেবেছেন কখনো? নেক সন্তানের জন্য দোয়া করার কথা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন, رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নেককার সন্তান দিন।[৮৫]

সন্তানের উত্তম জীবিকা মা-বাবার সব সময়ের কামনা। তাই তাদের জীবন যেন শঙ্কামুক্ত ও সমৃদ্ধ হয় সেই দোয়া করা চাই। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর দোয়ার কথা পবিত্র কুরআনে এসছে,

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে; হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্য যে তারা যেন নামাজ কায়েম

[৮৫] সুরা সফফাত, আয়াত : ১০০

> করে। অতএব কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকা দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[৮৬]

খারাপ ভাষায় উচ্চারিত শব্দগুলো তাকে শুধরে না দিয়ে আরও একগুঁয়ে করে দিতে পারে, আপনার সাথে সন্তানের মানসিক দূরত্ব তৈরি করতে পারে, তার ভেতর পরামর্শ না নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে দিতে পারে। আমরা চাচ্ছি সন্তান যেন লেখাপড়া করে, কাজ শিখে ভালো মানুষ হয়। আত্মনির্ভরশীল হয় কিন্তু এমন আচরণ করলে এর বিপরীত ফলও হতে যা হয়ত আমরা কোনদিনও কামনা করি না।

৪.৩.৩.৩. সন্তানকে মারপিট করা

সন্তানকে শাসন করার অসংখ্য উপায় থাকতে পারে। কিন্তু শাসনের নামে গায়ে হাত তোলা আপনার শিশুর জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। উন্নত বিশ্বে শিশুদের শিষ্টাচার শেখানো, পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলা, বাবা-মায়ের অনুগত করে গড়ে তোলার জন্য দারুণ সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

শিশু যদি কথা না শুনতে চায়, তবে তার চাহিদার কথা শুনে নেওয়া জরুরি। রোগী যেমন, তাকে ঔষধও দিতে হবে তেমন। তার মানে এই নয় যে, তাকে পিটিয়ে হলেও মানাবেন। শিশুরা শারীরিক গঠনে এমনিতেই দুর্বল, তাই গায়ে অল্প হাত তোলাতেও গুরুতর শারীরিক জখমের আশঙ্কা যেমন থাকে; তেমনি প্রহারজনিত কারণে শিশুর মানসিক জগতেও আসে বড় ধরনের আঘাত।

একটা সময় দেখবেন, আপনার শিশু তার ব্যাপারগুলো আপনার কাছে প্রকাশ করছে না, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে আপনাকেই জানানোর কথা। আপনি হয়তো পরিবর্তনগুলো খেয়াল করছেন না। সে তার মনোজগতের এই বিশাল পরিবর্তন বয়ে বেড়াবে ভবিষ্যত পর্যন্ত। তার কল্পনার জগতে আপনিই হয়ে যেতে পারেন সত্যিকার ভিলেন। ভালো-মন্দ যাচাই করার মতো খুব দক্ষ শিশুরা হয় না, সেটা আপনাকেই শেখাতে হবে। আর তখনই তাকে শেখাতে পারবেন, যখন আপনি সন্তানের কাছে নির্ভরতার প্রতীক হতে পারবেন।

হযরত আনাস (রা.)-কে মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর মা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেবায় অর্পণ করেন।[৮৭] দীর্ঘদিন খেদমত করতে গিয়ে নবীজী (সা.)-কে কেমন পেয়েছেন সে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি ১০ বছর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত করেছি। আমার কোনো কাজে আপত্তি করে তিনি কখনো বলেননি, এমন কেন করলে? বা এমন করোনি কেন?"[৮৮] শুধু মুসলিম সেবক নয়, ভিন্ন ধর্মের শিশুর সেবকও ছিল নবীজি (সা.)-এর স্নেহের পাত্র। একটি ইহুদি শিশু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার শিয়রে বসলেন। তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। সে তখন নিজের বাবার দিকে তাকাল।

فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

বাবা বলল, তুমি আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। এবার ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বললেন, সব প্রশংসা আল্লাহর। তিনি ছেলেটিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[৮৯] ভবিষ্যতে সন্তানকে আত্মনির্ভর ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মা-

---

৮৬ সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭

৮৭ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৮৫৮, পৃ. ২৮০

৮৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, হাদীস নং- ৫৬১২, পৃ. ৪১৯

৮৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ২, হাদীস নং- ১২৭৩, পৃ. ৪১১-৪১২

বাবাকে বা অভিভাবককে তাদের জন্য অসুকরণীয়, অনুসরণীয় হয়ে উঠতে হবে। তাহলে কাঙ্খিত স্বপ্নপূরণ হবে।

৪.৩.৩.৪. ইলেকট্রনিক পণ্য ব্যবহারে সচেতন হওয়া

যেসব বাবা-মায়েরা ইলেকট্রনিক জিনিসের প্রতি বেশি আসক্ত, তাদের সন্তানদের ভেতর পরবর্তীতে মানসিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারা, অমনোযোগিতা, আলস্য- এসব শিশুদের ভেতর জেঁকে বসে। বাবা-মায়েরা শিশুকে যথেষ্ট সময় না দিলে তাদের কথা শিখতে দেরি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুদের বাবা-মায়েরা টিভি, স্মার্টফোনে আসক্ত, তাদের সন্তানের ভাষাগত দক্ষতা গড়ে উঠতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে। বাবা-মার ফোন বা ইলেকট্রনিক পণ্যে আসক্তি সন্তানের উপর ফেলতে পারে বিরূপ প্রভাব; কেবল বাবা-মা এগুলো থেকে দূরে থাকলেই হবে না, নিশ্চিত করতে হবে, সন্তানও যাতে এগুলো থেকে দূরে থাকে। বিশেষ করে বয়স দু' বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে টিভি, স্মার্টফোন-এগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে। বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ থেকেও বাচ্চাদের দূরে রাখতে হবে, কারণ তাদের অসুগঠিত মস্তিষ্ক এতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভাষা শেখানোর কাজটিও তাই সময় সাপেক্ষ এবং দুরূহ হয়ে পড়ে। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত চিন্তা করে এগুলো ব্যবহারে সতর্কতার বিকল্প নাই।

৪.৩.৩.৫. এশার সালাতের পরই ঘুমের অভ্যাস করা

বাড়ন্ত শিশুদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা নির্ভর করে তাদের ঘুমের পরিমাণের উপর। বিশেষ করে সঠিক সময়ে ঘুমাতে যাওয়া শিশুদের শেখার ক্ষমতা ও মনোযোগ, অনিয়মিত সময়ে ঘুমাতে যাওয়া শিশুদের চেয়ে বেশি। কিন্তু বেশিরভাগ পরিবারেই শিশুদের ঘুমানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারণ করা হয় না। বিশেষ করে আমাদের যৌথ পরিবারগুলোতে এই সমস্যা আরও বেশি। বাসার পরিবেশ তাই এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে শিশুর ঘুমানোয় ব্যাঘাত না ঘটে। হাদিসে এশার সালাতের পরই ঘুমানোর উত্তম সময় বলা হয়েছে। আবু বারযা (রা.) বলেছেন,

وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

> এশার সালত একটু বিলম্বে আদায় করাকে তিনি (হযরত রাসূলুল্লাহ) (সা.) পছন্দ করতেন। আর এশার আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর এমন মুহূর্তে তিনি ফজরের সালাত শেষ করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।"[৯০]

ঘুম যদি সঠিক সময়ে না হয় তাহলে শিশুর শারিরীক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে। যা তার ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, ভালো মানুষ হওয়ার পথে বাধা হতে পারে।

৪.৩.৩.৬. শিশুদের মতামতকে প্রধান্য দেওয়া

শিশুকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। তা নাহলে বড় হয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। বড়দের একধরনের প্রবণতা হলো শিশুদের মতামতের প্রাধান্য না দেওয়া। আমিই ভালো বুঝি আমাদের মধ্যে এমন একটা ধারণা কাজ করে। অনেক সময় আমরা শিশুদের ধমক দিয়ে বলি, বড়দের মাঝে কথা বলো কেন? আমাদের এ ধরনের আচরণ শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা ও শিশুদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার

---

[৯০] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ৫৭২, পৃ. ৩৬-৩৭

জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও পদ্ধতি গ্রহন করা উচিৎ। শিশুরা অনুসন্ধিৎসু। তাদের পিপাসু মন নতুন কিছু শুনলেই তা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে এবং নতুন কিছু দেখলেই তা নিয়ে প্রশ্ন করে। এ সময় সঠিক তথ্য তুলে ধরা না হলে শিশু বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। শিশু যখন কিছু শেখে তখন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই সে বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করার চেষ্টা করে। নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে থাকে। শিশুর এ ধরনের কথা ও মনোভাবকে মূল্যায়ন করতে হবে। তাহলেই শিশু বিকশিত হবে সাবলীলভাবে। মতামত প্রকাশে স্বাধীনতা পেলে শিশু হয়ে ওঠে সৃজনশীল। স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যমে শিশু স্বাধীনভাবে কিছু করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তার এ আগ্রহ থেকে সৃষ্টি হয় নতুনত্বের।

৪.৩.৩.৭. সন্তানকে কাজ শিক্ষা দেয়া

পিতা-মাতার অবর্তমানে বা শিশু বালেগ হয়ে যাওয়ার পর সে যেন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এরকম যে কোন একটা পেশা সন্তানকে শিখিয়ে দেয়া দায়িত্ব। যাতে সে অনাহারে কষ্ট না পায়, বিপদগ্রস্থ না হয়। যেমন চাষাবাদ, নৌকা চালানো, গাড়ি চালানো, (সার্মথ্য আনুযায়ী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কিছু বানানো) ইত্যাদি যার উপর নির্ভর করে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এরকম যে কোন একটা শিখিয়ে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। শিশু কিশোরদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"তোমার বংশধরদের অন্যের উপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল রেখে যাওয়া অনেক ভাল"।[৯১] এ জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভর হতে সহযোগিতা করা মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৪.৩.৩.৮. ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রাধান্যের অন্তর্নিহিত রহস্য সব চাইতে বেশি লুকায়িত আছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশি মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি ততবেশি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি বা যে দেশের অধিবাসীদের আগ্রহ নেই, তারা সবসময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এই ব্যবসার পথ ধরেই তাদের তাহযীব-তমদ্দুন, জীবনোপায়, রাজনীতি, এমনকি ধর্মের উপর অন্য জাতি আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাদের দাসে পরিণত করে একনায়ক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে থাকে।

যে জাতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, সে আজ না হলেও আগামীকাল অবশ্যই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। যে দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের বরকত থেকে বঞ্চিত সে বর্তমানে না হলেও ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ধ্বংসের গর্ভে নিপতিত হয়ে বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্যই ইসলাম বারবার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। তার ফজিলত ও বরকত এর কথা শুনিয়েছে; ইহকালের কল্যাণ ও পরকালে সুসংবাদ প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নামাজ শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ (ব্যবসার পণ্য ও জীবিকা) অনুসন্ধান কর এবং অর্জন কর।"[৯২] এখানে ফজল বা অনুগ্রহের অর্থ জীবিকা ও সম্পদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে।

---

[৯১] *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২৮৫৪, পৃ. ১১৯-১২১

[৯২] সূরা আল জুমআ, আয়াত : ১০

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ "তোমরা একে অপরের ধন সম্পদ বাতিল অবস্থায় খেও না। বরং পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন কর।"[৯৩] নবী করীম (সা.) বলেছেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর বা পরকাল নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে হবে।"[৯৪]

৪.৩.৪. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য অর্জনযোগ্য ব্যক্তিগত গুণাবলী

আত্মনির্ভরশীলতা বলতে আমরা নিজের উপর বিশ্বাস বা নিজের দক্ষতার উপর বিশ্বাস কেই বুঝি। অনেকের কাছে অন্যটাও হতে পারে। একেক জনের কাছে একেক রকম হতে পারে কিন্তু বিষয়বস্তু ঘুরেফিরে ওই একই দাঁড়ায়। নিজের দক্ষতা থাকলে বা নিজের উপর বিশ্বাস থাকলেই যে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যাবে বিষয়টা এমন না। এটা একদিনে আসবে না। ধীরে ধীরে অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের উপর বিশ্বাস তৈরি হবে। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার ২% মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, অন্যরা পারে না।

৪.৩.৪.১. কিছু বিষয় অভ্যাসে পরিণত করা

আমরা যদি আজ থেকেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যুদ্ধে নিজেকে শামিল করি তাহলে ওই ২% মানুষের দলে জায়গা করে নিতে পারা যাবে আত্মবিশ্বাস দিয়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মাধ্যমে। যিনি এই ২% এর মধ্যে আসতে পারবেন তিনি ভাগ্যবান। কারণ আমরা জীবনে কোনো কিছু করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই। কী সেই পদক্ষেপ? আমরা এখন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সেসব পদক্ষেপসমূহ দেখে নিবো।

১. নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটতে হবে। সকালে হাঁটলে মন প্রফুল্ল থাকে। এই ৩০ মিনিটেই সারাদিনের রুটিন করে নিতে হবে। নিজেকে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। নামাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ও শারিরীক ব্যায়াম। সে জন্য নিয়মিত আদায়ের অভ্যস্ত হওয়া। নামাজে পাঁচটি পুরষ্কারের মধ্যে একটি হলো নামাজির রিজিকের অভাব দুর হয়। তাই আত্মনির্ভরতার জন্য নামাজের গুরুত্ব অনেক বেশি.

২. নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে শিখতে হবে। যত বিপদ আসুক মনোবল হারানো যাবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করে যেতে হবে। সফলতা দানের মালিক আল্লাহ। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

"(হে নবী!)অতঃপর যখন (কোন ব্যাপারে) সংকল্পবদ্ধ হবেন, তখন আল্লাহরই প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।"[৯৫]

৩. মানসিক সাহস রাখতে হবে। আমি পারবো, আমার দ্বারা হবে এরকম মনোভাব পোষণ করতে হবে।

---

৯৩ সূরা আন নিসা, আয়াত : ২৯

৯৪ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১২১২, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

৯৫ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৫৯

৪. প্রতিদিন কোনো মোটিভেশান স্পিচ শোনা বা মোটিভেশনাল ভিডিও দেখা, সফল মানুষদের গল্প পড়া, নতুন কিছু শেখা। কিন্তু যদি সেই মোটিভেশনকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেই নিজের কাছে নিজেই যে আমি সফল হবেই সেটা যেকোনো মূল্যে হোক, তাহলে সেটা চিরস্থায়ী হবে। আর জীবনে প্রভাব ফেলবে নতুবা প্রভাব নাও ফেলতে পারে। মহানবী (স.) বলেছেন- "প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।"[৯৬]

৫. অন্যের প্রশংসা করা। ভালো কাজ কে ভালো বলা, খারাপ কাজ কে খারাপ বলা। ইসলামে অন্যের দোষ বলা, হিংসা করা হারাম।

৬. যখন কোনো কাজ নিজে নিজেই করা যাবে, অন্যের সাহায্য ছাড়াই তখন সেটাকে উদযাপন করতে শিখতে হবে এবং এটা প্রতিদিন করার চেষ্টা করতে হবে। থেমে যাওয়া যাবে না। একবার না পারলে বারবার চেষ্টা করতে হবে।

৭. সফল মানুষের সাথে চলাফেরা করতে হবে। ভুল মানুষের সাথে চলাফেরার সময় তার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে এবং অন্যকেও উৎসাহিত করতে হবে।

৮. নিজের পথে চলতে গেলে বাঁধা বিপত্তি আসবেই। কিন্তু বাঁধাকে বাঁধা মনে করা যাবে না। এসব বাঁধাকে সাফল্যের সোপান মনে করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

৪.৩.৪.২. ঘুরে দাড়াতে চেষ্টা করা

মানুষের জীবনে হাসি আর আনন্দের পাশাপাশি দুঃখ-কষ্ট, জরা-ব্যাধিসহ নানা বিপর্যয় আসবেই। অনেকেই এতে এতই ভেঙে পড়েন যে তাঁরা আর ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি, সাহস ও মনোবল হারিয়ে ফেলেন। সম্ভবত এ কারণেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নোবেল বিজয়ী নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, আমাকে আমার সফলতা দ্বারা বিচার কর না, ব্যর্থতা থেকে কতবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি তা দিয়ে আমাকে বিচার কর।

ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে রাখতে হবে, রাত ছাড়া যেমন দিন হয় না তেমনি অন্ধকার না থাকলে আলো কী জিনিস তা বোঝা যায় না। আর চাইলেই একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা নিতে পারা যায় না। নিতে হবে দুটোই। তাই, ব্যর্থতায় অনুশোচনা না করে কিভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বাড়ানো যায় সেটা চিন্তা করতে হবে। কারণ ব্যর্থতাকে চাইলেও জীবন থেকে মুছে দেওয়া যায় না। যা পারা যায় তা হলো-ব্যর্থতায় ঘুরে দাঁড়াতে। সফলতা নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। কোন কাজে সফল হতে হলে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। তাহলে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সহজ হয়।

৪.৩.৫. নগদ পুঁজি বিহীন ব্যবসা আইডিয়া

মানুষ পরনির্ভরশীল থাকতে চায় না। মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। এটি মানুষের স্বভাবজাত চরিত্র। কিন্তু আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা। আর এই কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে প্রয়োজন হয় অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ধারণা, কর্মসংস্থান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। আসলে মানুষের এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। কারণ, পৃথিবীতে অসংখ্য ব্যবসা রয়েছে যেগুলো নগদ বিনিয়োগ ছাড়াই শুরু করা সম্ভব। যেগুলো খুব সহজে বিনিয়োগ ছাড়াই শুরু করা যায়। ব্যবসায় শুরু করতে হলে যে সকল বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

---

[৯৬] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ১, পৃ. ৩

৪.৩.৫.১. পরিকল্পনা গ্রহণ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" "প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।"[৯৭] যদি আপনিও ব্যবসায় শুরু করতে চান। তাহলে সবার আগে একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। যেখানে ব্যবসায়ের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা থাকবে।

৪.৩.৫.২. বিজনেস লাইসেন্স করা

প্রতিটি দেশে ব্যবসায় শুরু করতে হলে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। তেমনি আমাদের দেশেও ব্যবসায়ের ধরন অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

৪.৩.৫.৩. বাজারজাত করণ বা মার্কেটিং

প্রতিটি ব্যবসায় পরিচালিত হয় অর্থের দ্বারা। আর এই অর্থ উপার্জন সম্ভব হয় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা গ্রাহকের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সঠিক বাজারজাতকরন তথা মার্কেটিং এর উপর।

৪.৩.৫.৪. উপকরণ ব্যবসায়

শুরু করতে উপকরণ প্রয়োজন। তবে সকল ব্যবসায় উপকরণ লাগে, এই ধারণা সঠিক নয়। কিছু ব্যবসা রয়েছে যেগুলো সামান্য কিছু উপকরণ নিয়েই শুরু করা যায়। আবার কিছু ব্যবসা রয়েছে যেগুলো শুরু করতে কোনো প্রকার উপকরণের প্রয়োজন হয় না। আর এই সকল ব্যবসায় সম্পর্কে নিচে আলোচনা করবো।

৪.৩.৫.৫. পণ্য উৎপাদন

একটি ব্যবসায়ের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে পণ্য বা সেবা। এই পণ্য বা সেবা গ্রাহকের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমেই প্রতিটি ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ উপার্জন সম্ভব হয়। আর এই লভ্যাংশের দ্বারা প্রতিটি ব্যবসায় টিকে থাকতে পারে।

৪.৩.৫.৬. নিজের তৈরি পণ্যের ব্যবসা

টাকা ছাড়া ব্যবসা শুরু করা যায় না এটি শুধু মাত্র অলস মানুষের বাণী। কারণ, অসংখ্য ব্যবসায় রয়েছে, যেগুলো আপনি চাইলেই শুরু করতে পারেন। আর যদি আপনি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আর কথাই নেই। ধরুন, আপনার চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি চান, যে আপনার চিত্রকর্ম পৃথিবীর মানুষ দেখুক এবং বিনিময়ে টাকা উপার্জন হোক। তাহলে আর ভাবনা নেই। চাইলেই শুরু করা যায় নিজের ব্যবসায়। ব্যবসায় শুরু করার টাকা কোথায় পাবেন? চিন্তা নেই, এই আধুনিক পৃথিবী সৃষ্টিশীল মানুষদের জন্য খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার দরজা। চাইলেই চিত্রকর্ম কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই আমাজন, ইবে সহ আরও অসংখ্য অনলাইন দোকানে বিক্রি করা যায়। এভাবে লাভ করা যায় প্রচুর অর্থ। তাহলে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে বাধা কোথায়?

---

[৯৭] প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ১, পৃ. ৩

৪.৩.৫.৭. কন্টেন্ট সরবরাহ

আজকের আধুনিক পৃথিবীতে যোগাযোগ খুবই সহজ। মিনিটেই মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের কর্মক্ষেত্রের আকার। এই কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির পেছনে কাজ করে যাচ্ছে অনেকগুলো অনলাইন মার্কেট স্পেস। আর এই অনলাইন মার্কেট স্পেসের মধ্যে একটি হচ্ছে ফাইবার।

এখানে কন্টেন্ট রাইটার, ফটোগ্রাফার, এডিটর এবং শিল্পীদের জন্য খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার দ্বার। এখানে আপনার কন্টেন্ট সাজিয়ে রাখতে পারেন। প্রতিদিন অসংখ্য ক্রেতা ঢু মারেন এই সাইটে। বিক্রি হয় অজস্র পণ্য। এভাবে আপনিও বিক্রি করতে পারেন আপনার কন্টেন্ট বা পণ্য, কোনো প্রকার বিনিয়োগ ছাড়াই।

৪.৩.৫.৮. মেরামত কাজ করা

মেরামতকরণ ব্যবসায় বিনিয়োগ ছাড়া আরও একটি ব্যবসায় হচ্ছে মেরামতকরণ ব্যবসা। খাটি বাংলায় আমরা বলে থাকি মিস্ত্রি। যদি একরকম দক্ষতা থাকে তাহলে বসে না থেকে শুরু করা যেতে পারে পুঁজিহীন এই ব্যবসায়। আর যদি দক্ষতা না থাকে, তাহলেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে রয়েছে আরও একটি বিকল্প আইডিয়া। তাহলো কয়েক জন মিস্ত্রীর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে একটি মেরামতকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠানে একজন মিডিয়া হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কাজ পেলে মিস্ত্রী দিয়ে সম্পন্ন করে ফেলা। কাজ শেষে মিস্ত্রীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করে দেবেন এবং বাকি টাকা আপনার লাভ। ভালো লাগলে আপনিও শুরু করতে পারেন পুঁজি ছাড়া এই ব্যবসা।

৪.৩.৫.৯. কনসালটিং ফার্ম

অসংখ্য চাকুরীজীবী রয়েছে যারা উদ্যোক্তা হতে চায়। এদের উদ্দেশ্য থাকে কিছু বছর প্রফেশনাল অভিজ্ঞতা অর্জন করে শুরু করবেন নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। যদি আপনারও এরকম মনোবাসনা থাকে, তাহলে আপনার জন্যও রয়েছে একটি নগদ পুঁজিহীন ব্যবসা আইডিয়া। এই আইডিয়াটি হচ্ছে, কনসালটিং ফার্ম বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন। বিনিময়ে উপার্জন করতে পারবেন প্রচুর পরিমাণে অর্থ। এই ব্যবসায় বিজ্ঞাপন ছাড়া তেমন কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না।

৪.৩.৫.১০. মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউরশীপ

আজকের পৃথিবী মানুষের জন্য এতটাই সহায়ক হয়ে উঠেছে যে, যদি আপনার সামান্য দক্ষতাও থেকে থাকে তাহলে আপনিও পারবেন দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করতে। যদি আপনি ড্রাইভিং জানেন তাহলে আপনি উবার, পাঠাও, ডাকো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। এখান থেকে অর্জিত টাকা দিয়ে পরবর্তীতে নিজেই কিনতে পারেন নিজের গাড়ি।

আবার ধরুন আপনার একটি বাড়ি রয়েছে। কিন্তু ব্যবসা শুরু করার মতো টাকা নেই। এমতাবস্থায় আপনি কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সন্ধান করতে পারেন। এই সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন যে, আপনি নগদ বিনিয়োগের বিপরীতে আপনার একটি রুম বা বাড়ি কারখানা তৈরির জন্য দিতে পারবে। ফলে নগদ বিনিয়োগের প্রয়োজন হলো না। অপরদিকে ব্যবসাটি শুরু করতে পারলেন। শারিরীক সুস্থতার জন্য ঘুম ও বিশ্রাম।

৪.৩.৫.১১. সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা

যে কোন কাজ করার প্রথম শর্ত হলো শারীরিক সুস্থতা। সুস্থতা আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। এজন স্বাস্থ্য বিধি মেনে জীবন যাপন করে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া করতে হবে। ইসলামী স্কলারগণ শারীরিক সুস্থতার জন্য ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় জীবন-যাপনের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দরবারে বেশি বেশি দোয়া করার কথা বলেছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

> উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স.)-এর নিকট এমন মারাত্মক ব্যথা নিয়ে উপস্থিত হলাম, যা আমাকে অকেজো প্রায় করেছিল। নবী (স.) আমাকে বলেনঃ তুমি তোমার বাম হাত ব্যথার স্থানে রেখে সাতবার বলো-
>
> أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ [আউযু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু] আল্লাহর নামে আমি আল্লাহর অসীম সম্মান ও তাঁর বিশাল ক্ষমতার উসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।[৯৮]

অন্য হাদীসে এসেছে-

> 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি আমার পিতাকে বললাম, হে আব্বাজান! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় তিনবার বলতে শুনি-
>
> اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ "হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই"।তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এ বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করতে শুনেছি। সেজন্য আমিও তার নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি।[৯৯]

---

৯৮. *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব নং- ১১০, হাদীস নং- ৫০৯২, পৃ. ৪৮৪

৯৯. *প্রাগুক্ত*, খ. ২, বাব নং- ৩৬, হাদীস নং- ৩৫২২, পৃ. ১১৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা

৫. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা

একটি স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মর্মে অত্র গবেষণায় প্রতীয়মাণ হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ অধ্যায়ে পেশ করা হলো। সাথে সাথে উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে করণীয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা সুপারিশ আকারে পেশ করা হয়েছে।

৫.১. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে বাংলাদেশের কতিপয় সমস্যা

অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষণায় যে সকল পরিমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বা ক্ষেত্র প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে তা উঠে এসেছে। এসব ক্ষেত্র সমূহের কতিপয় দিক এ অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হলো :

৫.১.১. ইসলামী অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব

বাংলাদেশ একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম প্রধান দেশ হলেও এ দেশের অর্থনীতিতে পরিপূর্ণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু নেই। ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক সহ অনেক ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং এর পাশাপাশি ইসলামী বিভাগ চালু করেছে জনগনের চাহিদার কারণে। জনগন এ ব্যাংকিং ব্যাবস্থা পছন্দের তালিকায় সর্বাগ্রে রাখলেও এ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সিলেবাস আছে তাও অপূর্ণাঙ্গ। তাই এর সুদুর প্রসারি কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। জনগনের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও নেই এর তেমন কোন প্রচার প্রসার। ফলে এর বাস্তবায়নে তেমন কোন কাঙ্খিত সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যা আত্মনির্ভরশীলতার পথে আলো ছড়াতে পারে। আত্মনির্ভরশীল হতে হলে উপার্জন করতে হবে। আর উপার্জনের জন্য ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জানা ও বুঝা আবশ্যক। বিস্তারিত জানতে না পারলেও কমপক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হলো, জাতি-ধর্ম, ভাষা-বর্ণ এবং কুল-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন বা মানব কল্যাণ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন দফা বলেছেন, কল্যাণ কামনা করাই ধর্ম। আমরা বললাম, কী ব্যাপারে এটা করতে হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি, কুরআনের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখা ও আনুগত্য

দানের ব্যাপারে এবং মুসলিমদের নেতা ও মুসলিম জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁদের কল্যাণ কামনায় (আন্তরিকতা রাখবে)।[১]

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আদল তথা ইনসাফ, সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণতা (Justice and balance)। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন.

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।[২]

ইসলামী অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, বিশ্বাসী হিসেবে দুনিয়ায় সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে আখিরাতের সাফল্য অর্জন। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নীতিমালা সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো :

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর ভান্ডারের চাবিকাঠির মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার জীবিকায় (অর্থ সম্পদে) প্রশস্ততা দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা সীমিত দিয়ে থাকেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী"।[৩]

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"আল্লাহ সেই মহানুভব সত্ত্বা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন"।[৪]

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

"(হে মানুষ!) আমি পৃথিবীতে তোমাদের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সেখানেই রেখে দিয়েছি তোমাদের জীবনের উপকরণ (অর্থাৎ পৃথিবীর বুকেই তোমরা জীবিকা সন্ধান সংগ্রহ করো)"।[৫]

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰي بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَاسْـَٔـلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেটার জন্যে তোমরা লালসা করোনা। পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। নারী যা

---

১ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী [সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০খ্রি., খ. ১, হাদীস নং- ১০২, পৃ. ১১৭

২ সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ০৮

৩ সূরা আশ-শূরা, আয়াত : ১২

৪ সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৯

৫ সূরা আল আরাফ, আয়াত : ১০

অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ (অর্থ সম্পদ, সহায় সম্বল) প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।[৬]

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"এবং তাদের (বিত্তবানদের) অর্থ সম্পদে অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।"[৭]

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

আল্লাহ জনপদবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে যা (যে সম্পদ) দিয়েছেন- তা আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতিমদের, অভাবীদের এবং পথচারীদের জন্যে। এর উদ্দেশ্য হলো, অর্থ সম্পদ যেনো কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[৮]

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে লেনদেনের (ঋণ দেয়া নেয়ার) ফায়সালা করবে, তখন তা লিখিতভাবে করবে।"[৯]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

"তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন"।[১০]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

ওদের জিজ্ঞেস করো, কে হারাম করলো আল্লাহর সেই সব সৌন্দর্যকে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে উৎপন্ন করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ সমূহকে?[১১]

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও ভালো। আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তবে তা অধিকতর ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া হবে। তোমরা যাই করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"[১২]

---

৬ সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩২

৭ সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ২৯

৮ সূরা আল হাশর, আয়াত : ৭

৯ সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৮২

১০ সূরা আল আনআম, আয়াত : ১৬৫

১১ সূরা আরাফ, আয়াত : ৩২

১২ সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭১

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"অত্মীয় স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং অভাবী ও পথিকদের দাও তাদের প্রাপ্য। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করোনা। কারণ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"[১৩]

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"হে আদম সন্তান! সালাত আদায়কালে তোমাদের উত্তম পবিত্র পোশাক পরে সৌন্দর্য গ্রহণ করো। আর আহার করো, পান করো, কিন্তু অপচয় করোনা। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[১৪]

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"তুমি (কার্পণ্য করে) নিজের হাতকে গলায় বেঁধে রেখোনা, আবার (উজাড় করে খরচ করে ফেলার জন্যে) তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করেও দিওনা। এমনটি করলে তিরস্কৃত হবে এবং খালি হাতে বসে পড়বে।"[১৫]

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"(আল্লাহর প্রিয় লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো:) তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপচয়-অপব্যয় করেনা, আবার কার্পণ্যও করেনা; বরং উভয় চরম পন্থার মাঝখানে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে"।[১৬]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

"হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল এবং উত্তম পবিত্র। তোমরা তাই খাও-ভোগ করো। তবে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা"।[১৭]

শুধু ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় ইসলামী নিয়ম থাকলেই চলবে না। বরং অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনা এবং উপার্জন করতে পারলে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হবে। সে জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারলে ইসলামী অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব দুর হবে।

৫.১.২. জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় সহায়তা

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ যথাযথরূপে পালন করতে হবে-

৫.১.২.১. ইসলামী অর্থনীতি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত না থাকা

ইসলামী অর্থনীতিই পারে জাতিকে আত্মনির্ভরশীলতার পথ দেখাতে। ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করে সেই অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠন এর ব্যবস্থা করতে পারলে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হবে। জাতি

---

১৩ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৬-২৭

১৪ সূরা আল আরাফ, আয়াত : ৩১

১৫ সূরা বনিইসরাঈল, আয়াত : ২৯

১৬ সূরা আল ফুরকান আয়াত : ৬৭

১৭ সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৬৮

আত্মনির্ভরশীল হবে। কারণ ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধান। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[১৮]

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নমুনায় ইসলামী অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে স্বনির্ভরতা বা আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজটি সম্পন্ন হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো- এখানে আত্মনির্ভরশীলতা বড় বড় বুলি আওড়াতে শোনা গেলেও অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী এবং সেজন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন তার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়না।

৫.১.২.২. দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে

দেশ রক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা জরুরী। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে সীমান্ত প্রহরায় রয়েছে এক সুপ্রশিক্ষিত জনশক্তি বা বাহিনী। কিন্তু তথাপিও সীমান্ত এলাকায় আমরা নানা রকম অনাচারের সংবাদ প্রায়ই আমরা খবরে জানতে পারি। কিন্তু সত্যিকারার্থে সীমান্ত প্রহরায় সজাগ কোনো বাহিনী থাকার পরেও সেখানে চোরাচালান, মাদক ইত্যাদির মতো ভয়াবহ কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা নয়। সেজন্য শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ, নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইসলামী আদর্শে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে তোলা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী শক্তি সামর্থ্য অর্জন করো ও প্রস্তুত রাখ, প্রস্তুত রাখ প্রয়োজনীয় যানবাহন, যেন তোমরা তার সাহায্যে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে ভীত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হও।"[১৯]

দেশ রক্ষায় নিয়োজিত সব বাহিনীকে ইসলামী জ্ঞানের আলোকে গঠন করতে না পারলে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের দেশ রক্ষার মহান দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করতে পারলে তারা দেশের স্বার্থবিরোধী, দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে না। ফলে দেশ ও জাতি আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশ সেবার পাশাপাশি তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে।

৫.১.২.৩. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

যে কোনো স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণ কিংবা স্বনির্ভর সমাজ বা রাষ্ট্রের যে কয়টি মৌলিক উপাদানের সুপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হলো বিচার বিভাগ। আর এ কথা চিরন্তন যে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা, শাসন ও বিচার-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সেজন্য পুলিশ ও দেশ রক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্য সকল প্রকার বিচারালয় স্থাপন ও ইসলামের নীতি অনুযায়ী তার পরিচালনা করা। সভ্য সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য

---

[১৮] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৩

[১৯] সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সব কিছুর সুষ্ঠ বন্টন পায়। ফলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আত্মনির্ভরশীলতার পথ সুগম হয়। সুবিচার প্রাপ্তি সব নাগরিকের অধিকার এবং ন্যায়বিচার আল্লাহর হুকুম। এটি ফরজ ইবাদত। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।[২০]

৫.১.২.৪. নাগরিকদের অধিকার

নাগরিকের অধিকার রক্ষার্থে তাদের অভাব-অভিযোগ শোনা এবং পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করা। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অজন্মা প্রভৃতি জরুরী পরিস্থিতিতে এককালীন সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করা।

৫.১.২.৫. মৌলিক অধিকার

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল জাতি গোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার মদিনা সনদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছিলেন ফলে মদিনা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা সুখে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ লাভ করলো। এছাড়াও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মীরাসী আইন কার্যকর করণ, সামাজিক জটিলতার মীমাংসা করণ। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের জন্য প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন, বিনামূল্যে শিক্ষাদান ও জনস্বাস্থ্যের জন্য সকল প্রকার আয়োজন ও বিধি ব্যবস্থা করা।

৫.১.২.৬. অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নয়ন সাধন করা। যেমন- রাস্তা-ঘাট, রেললাইন, বিমানপথ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন লাইন, বেতার কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। এগুলো তৈরি করা, পরিচালনা করা, সংরক্ষন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ খাতগুলোর প্রত্যেকটি খাত বিশাল কর্মক্ষেত্র। দেশের নাগরিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষন দিয়ে এসব খাতে নিয়োগ প্রদান করতে পারলে তারা কর্মের মাধ্যমে সেবা দানের পাশাপাশি নিজেদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারবে।

৫.১.২.৭. বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বানিজ্য সম্প্রসারণ করা বৈদেশিক বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানীর জন্য সামুদ্রিক যানবাহন ও বন্দর স্থাপন, আলোক-স্তম্ভ বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত করণ।

---

[২০] সুরা আল মায়িদা, আয়াত : ৮

৫.১.২.৮. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন

কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ক কল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কৃষি কাজের উন্নতি বিধানের জন্য পানি সেচের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন. বড় বড় পুকুর, খাল ও কূপ খনন, বাধ নির্মানের আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানি ও সার প্রয়োগে উৎপাদন হার বৃদ্ধি। শিল্পের উন্নয়নে জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করা। যেন কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং জনগণও উন্নত জীবনমান উপযোগী দরকারী দ্রব্যাদি সহজেই লাভ করতে পারে।

৫.১.২.৯. বৈদেশিক সম্পর্ক

দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল মিত্র দেশে রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার স্থায়ীভাবে নিয়োগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ বহন, দেশ-বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যাতায়াত, নিজ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরে মুসাফিরখানা স্থাপন করা, যেন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিই ফুটপাত বা গাছ তলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য না হয়।

৫.১.২.১০. অভ্যন্তরীণ সম্পদ

অভ্যন্তরীণ সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমি, বন-জঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও তার উন্নতি বিধান, কৃষক, মজুর ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা করা। অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষম বণ্টন, আহরণ ও সম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করতে সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১.২.১১. সামাজিক কল্যাণ

সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন হতে পারে এমন সব কাজে বায়তুলমাল হতেই অর্থ ব্যয় করার বিধান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই অর্থেই জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করা হতো। সরাইখানা নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার, পানির নহর খনন প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ যুগেও শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তার, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ, পথিকদের সুবিধার ব্যবস্থা সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিনামূল্যে নির্দিষ্ট একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ, দিঘী-পুকুর খনন সবই সমাজ কল্যাণের আওতাভুক্ত। মুসাফিরখানা স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের যোগান, পুষ্টিহীনতা দূর, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতিও সরকারের দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে বায়তুল মালের অর্থ ও সম্পদ হবে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

কোন নাগরিক যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে, বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের এই অধিকার ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। হযতর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও (রা) এই দাবী পূরণে যত্নবান ছিলেন।

৫.১.৩. জনসাধারণের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের উৎসাহহীনতা

আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা। ব্যক্তিগত জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হলো, জীবিকার অন্বেষণ ও উপার্জন। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা তদবীর করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এই পৃথিবী হলো কর্মক্ষেত্র। এখানে স্থবিরতা ও হাতপা নড়াচড়া না করা মৃত্যুর নামান্তর। এই বিশ্বে আল্লাহ খাদ্যোপকরণের ভান্ডার রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তা লাভ করতে হলে চেষ্টা-তদবীর ও অনুসন্ধান-অন্বেষণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"নামাজ শেষ হওয়ার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অন্বেষণ কর।"[২১]

অন্যত্র আল্লাহ পাক আরো বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ

তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা করো তারা তোমাদের জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা করো আল্লাহর নিকট।[২২]

আল্লাহ পাক আরো বলেছেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

এবং আরো কত লোক আছে, যারা পৃথিবীতে ঘুরে আল্লাহর ফযল (রিজিক) অন্বেষণ করে বেড়ায়।[২৩]

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে অভাব থাকলেও যা আছে তার সঠিক ব্যাবহারে জনগনের উৎসাহ কম। যারা লেখাপড়া শেষ করে তারা যে কোন কাজ করতে চায় না। তাদের চিন্তা থাকে শুধু চাকুরি করতেই হবে যে কোন মূল্যে হোক। নবী-রাসূলগন, খোলাফায়ে রাশেদা সহ ইসলামের বড় বড় মহামণীষীগন নিজ হাতে কাজ করে বা কোন ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার অন্যদিকে বিশাল যুব সমাজ নানা রকমের ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকে, রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নিয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধোকাবাজি করে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে ব্যস্ত। ফলে তারা কোন কর্মক্ষেত্র তৈরিতে চেষ্টা করে না। বৈধ উপার্জনের চেষ্টা করে না। আবার যাদের অর্থ আছে তারা বিভিন্নভাবে এনজিও তৈরি করে সুদের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। খুব অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকে ফলে তারা এমনভাবে অবৈধ উপার্জনের চেষ্টা করে যে, তাকে আর কোন পেশা অবলম্বনের চেষ্টা করতে দেখা যায় না। এই সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক দল ও সরকারের যথার্থ ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায় না। ফলে দিন দিন শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আর সে কারণেই জাতীয়ভাবে আমাদের আত্মনির্ভর হওয়ার পথ আস্তে আস্তে বন্ধ হতে চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন সময়ের দাবি।

৫.১.৪. আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে যাকাতের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্ববপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মাজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ সওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, -

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

---

[২১] সূরা জুম'আ, আয়াত : ১০

[২২] সূরা আল আনকাবুত, আয়াত : ১৭

[২৩] সূরা আল মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০

"তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন।"[২৪] যাকাত সাধারণ দানের মত যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করা যাবে না। বরং নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হবে। সে খাতগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ হলো আল্লাহর বিধান।[২৫]

যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সম্পদ যেন শুধু ধনীদের হাতে পুঞ্জিভুত না থাকে বরং তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর এর মাধ্যমে সমাজের অভাবী, দারিদ্র, অসহায় মানুষগুলো যেন আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করে আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

যে ধন-সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিলেন তা আল্লাহর জন্য তাঁর রাসূলের জন্য আর রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[২৬]

তাই সময়মতো যাকাত আদায় করে দেওয়া কর্তব্য। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা যায় না। এক্ষেত্রে করণীয় হল, নিসাবের মালিক হওয়ার সময়টি সামনে রাখা এবং ঠিক তার এক বছর পর ঠিক সময়েই যাকাত আদায় করা। নির্দিষ্ট সময়টি জানা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো মাসের অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়।

৫.১.৫. নিকটাত্মীয়দেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য যাকাত দেওয়ার বিধান

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেউ অসহায়, বেকার, দরিদ্র হলে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দিয়ে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে এমন পরিমান যাকাত দেওয়া উচিৎ যা দিয়ে সে কিছু করে জীবনযাপন করতে পারে। এরা যাকাতের নির্ধারিত খাতে পড়লে যাকাতের অংশ দিয়ে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সহযোগিতা করা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু বৈধই নয় বরং উত্তম কাজ। তারা হতে পারে সহোদর ভাই-বোন, ফুফু-ফুফা, খালা-খালু, মামা-মামি যেহেতু উসুল বা ফুরু অর্থাৎ যাকাত দাতার মূল বা শাখা নয়, তাই তাদের যাকাত দেওয়া যাবে, যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযোগী হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে দেয়াটাই উত্তম। কারণ, তাদেরকে দিলে দুটি উপকারিতা রয়েছে-

১। আত্মীয়তার হক আদায় করা হলো।
২। অসহায় দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া হলো।[২৭]

---

[২৪] সূরা আল বাক্বারা, আয়াত : ১১০

[২৫] সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৬০

[২৬] সূরা আল-হাশর, আয়াত : ০৭

তবে যদি যাকাত দাতা তার ভাই বোনের বা যাকাত দাতা বোন ভাইয়ের ভরণ পোষণ বহন করে, তাহলে উক্ত ভাইয়ের বা বোনের লালন পালন বাবদ যাকাতের টাকা প্রদান করা জায়েজ হবে না। দিলে যাকাত আদায় হবে না। হ্যাঁ তবে যদি লালন পালনের খরচ বাদে অতিরিক্ত হিসেবে যাকাতের টাকা ভাইকে মালিক বানিয়ে প্রদান করে, তাহলে লালন পালনে থাকা অবস্থায়ও আপন ভাই বোনকে যাকাত দেয়া জায়েজ হবে। যাকাত ও আদায় হয়ে যাবে। হযরত সালমান বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"মিসকিনকে যাকাত দেয়া সদকা। আর আত্মীয়কে দেয়া সদকা ও আত্মীয়তার হক আদায়"।[২৮]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

لا بأس أن تجعل زكاتك فى ذوى قرابتك ما لم يكونوا فى عيالك

"তোমার যাকাত নিকট আত্মীয়দের দিতে কোনো সমস্যা নেই যদি তারা তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত না হয়।"[২৯]

বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব রদ্দুল মুহতারে এসেছে,

وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقَارِبِ جَازَ إِذَا لَمْ يَحْسِبْهَا مِنَ النَّفَقَةِ بَحْرٌ وَقَدَّمْنَاهُ مُوَضِّحًا أَوَّلَ الزَّكَاةِ.

"যদি কেউ তার যাকাত (সম্পদ, টাকা পয়সা) এমন নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়কে দেয় যার ভরণ পোষণ তার উপর আবশ্যক। তাহলে যাকাত আদায় হবে। যদি প্রদত্ত টাকা পয়সা ভরণ পোষণ বাবদ হিসাব না করে।"[৩০]

ফতোয়ায় হিনদিয়ায় এসেছে,

والأفضل فى الزكاة والفطر والنذور الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخلات ثم إلى أولادهم

"যাকাত, ফিতরা, মান্নত (এর টাকা-পয়সা বা সম্পদ) দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হলো- নিজের ভাই ও বোন। অতপর ভাতিজা-ভাতিজী। অতপর চাচা-চাচি। অতপর চাচাতো ভাই, বোন। অতপর ফুফু-ফুফা। অতপর ফুফাতো ভাই-বোন অতপর মামা-মামি অতপর মামাতো ভাই-বোনকে দেয়া উত্তম।"[৩১]

---

২৭ বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর আল-মারগীনানী, *হেদায়া শরহে বেদায়াতুল মুবতাদি*, করাচি : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, তা.বি., কিতাবুয যাকাত, খ. ২, পৃ. ২২৪

২৮ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ [অনু. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী], *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., খ. ৩, হাদীস নং- ২৫৮৩, পৃ. ৮৩

২৯ আবি বকর আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবি শায়বা, *মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯হি., খ. ২, হাদীস নং- ১০৫৩১, পৃ. ৪১২

৩০ ইবনে আবেদীন, *রদ্দুল মুহতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৩৪৬

৩১ মাওলানা শায়েখ নিজাম, *ফতোয়ায় হিনদিয়া*, বৈরুত : দারুল ফিকার, তা.বি., খ. ১, পৃ: ১৯০

তাই দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে আাত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। যাকাত আদায়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো যাকে যাকাত দেবে, তার মৌলিক অভাব পূরণ করে দিতে চেষ্টা করবে। তাকে যেন আর কারো কাছে হাত বাড়াতে না হয়।

৫.১.৬. সুফল পেতে প্রয়োজন যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ যাকাত প্রদানের সামর্থ্য রাখে এবং তাদের থেকে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে তার খুব সামান্য অংশই আদায় হয়। গত ৪ মে ২০১৯ ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত এক সেমিনারে দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা এসব তথ্য তুলে ধরেন। তাঁরা আরো বলেছেন, ব্যক্তি ও করপোরেট অফিসগুলো নিজস্ব উদ্যোগে যাকাত দেওয়ায় দরিদ্র ব্যক্তি সাময়িকভাবে উপকৃত হলেও যাকাতের দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের কাঙ্খিত সুফলও আসছে না। সেমিনারে আলোচকরা যাকাত ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেন।[৩২]

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় যাকাত দেওয়া ফরজ এমন বহু সংখ্যক মানুষ যাকাত দিচ্ছে না। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থা যাকাতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় যাকাত বোঝায় পরিণত হচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর। একইভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সংগৃহীত যাকাতের অর্থের পরিমাণ ও তা ব্যয়ের খাত সম্পর্কেও মানুষের স্বচ্ছ ধারণা নেই। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থাশীল হতে পারছে না। অথচ সঠিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে ৩০ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র বিমোচনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারত। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। গবেষকদের দাবি, সঠিক ব্যবস্থাপনায় যাকাতের অর্থ বণ্টন করা হলে মাত্র ১০ বছরে দারিদ্র শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব।

১৯৮২ সালের ৫ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে যাকাত ফান্ড গঠন করেন এবং এ ফান্ড পরিচালনার জন্য উক্ত অধ্যাদেশে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্ত সমূহ সদস্য-সচিব তথা ইসলামীক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক যথা নিয়মে বাস্তবায়ন করে থাকেন। যাকাত ফান্ড অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৯৮২ সাল থেকে ৬৪ জেলায় বিত্তবানদের নিকট হতে সংগৃহীত মেট অর্থের অর্ধেক পরিমাণ অর্থাৎ ৫০% অর্থ জেলা যাকাত কমিটির মাধ্যমে গরীব ও অসহায়দের মাধ্যে বিতরণ করা হয়। যাকাত ফান্ডের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল

২. সেলাই প্রশিক্ষণার্থী দুঃস্থ মহিলাদের যাকাত ভাতা

৩. সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (২৪টি কেন্দ্রে)

৪. সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী দুঃস্থ মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদান

৫. প্রতিবন্ধি পুনর্বাসন

৬. দুঃস্থ পুরুষদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম

৭. যাকাত ভাতা

---

[৩২] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৫ মে ২০১৯

৮. শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

৯. নও-মুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম

১০. দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

১১. তিনটি পার্বত্য জেলায় নও-মুসলিমদের আর্থিক সাহায্য

১২. মঙ্গা/প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পূনর্বাসন

১৩. বৃক্ষরোপন/নার্সারী সহায়তা কার্যক্রম।

এছাড়াও ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ যাবৎ সংগ্রহীত টাকার ৫০% টাকা প্রতিবন্ধী পূর্ণবাসন, দুঃস্থ পুরুষদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম, যাকাত ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, নও-মুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম এবং দুঃস্থ গরীব রোগীদের চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম খাতে জেলা কার্যলয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।[৩৩] আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি যাকাত ফান্ড থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই যাকাত ফান্ডের কার্যক্রম আরো গতিশীল করে যাকাত সংগ্রহ করে তা যাকাত গ্রহিতাদের মধ্যে বন্টন করতে পারলে সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, অভাব অনটন দুর করে বাংলাদেশের মানুষকে স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল জাতিতে রুপান্তর করা সম্ভব হবে।

৫.১.৭. ইসলামী দৃষ্টিকোণে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য যাকাতের গুরুত্ব

জাতিকে আত্মনিভরশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম যাকাতের বিধান ফরজ করেছে। সমাজের নিঃস্ব, অসহায়, গরীব ও সম্বলহীন মানুষদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা, আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম আয়ের উৎস হল যাকাত। যা মুসলিম জনগনের কাছ থেকে আদায় করে কুরআন পাকে বর্ণিত নির্দিষ্ট খাত সমূহে ব্যয় করে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করতে পারে। তাই যাকাতের অর্থ সম্পদ ব্যয় করার খাতও কুরআন মাজীদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

> যাকাতের সম্পদ কেবল কেবল ফকির ও মিসকিনদের জন্য, তাদের জন্য যারা তা সংগ্রহ করার কাজে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আছে। তাদের জন্য যাদের মন আকৃষ্ট করার জন্য সাহায্য দান করা প্রয়োজন বোধ হয়। ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে এবং ঋণগ্রস্থ কে জগদ্দল ঋণভার হতে মুক্ত করার জন্য উহা ব্যয় করা হবে। আর তা আল্লাহর পথেও ব্যয় হবে, নিঃস্ব পথিকদেরও তা হতে দান করা যাইবে যাবে। বস্তুত এটা আল্লাহ তা'লার ধার্যকৃত ফরজ; আল্লাহ সব কিছু জানেন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।[৩৪]

৫.১.৭.১. বেকার শ্রমজীবী ও রুজিহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা

আল কুরআনের পরিভাষায় ফকির এমন মজুর ও শ্রমজীবী কে বলা হয়, শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়ে যে খুব মজবুত এবং কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে সে বেকার এবং ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে। কুরআন শরীফে ঠিক এই অর্থেই এটা ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক দিয়ে সেসব অভাবগ্রস্ত মেহনতী লোককেও ফকির বলা যেতে পারে, যারা কোনো জুলুম হতে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে আসছে। কোন সামরিক এলাকা হতে বিতাড়িত লোকদেরও ফকির বলা যেতে পারে। কুরাইশদের অত্যাচারে যেসব মুসলমান হিযরত করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং রুজি-রোজগারের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। কুরআন মাজীদে তাদেরকে ফকির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

৩৩ http://islamicfoundation.gov.bd › site › page › যাকা...

৩৪ সূরা আত তাওবা, আয়াত : ৬০

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا

"যাকাতের সম্পদ সেসব ফকির মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধান করতেছে।"[৩৫]

৫.১.৭.২. মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা

মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য যাকাত বাবদ সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গরিবদের সাহায্য দান এবং সকল প্রকার দুঃখ-দুর্ভোগ ও অভাব-অনটন হতে মুক্তি দানই এই বিভাগের উদ্দেশ্য, যেন সমাজের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতায় তারা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়ে তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা যায়। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের জন্য এটা এক চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ। এর আরো একটি দিক এই যে, এরূপ ব্যবস্থা থাকার কারণে ইসলামী সমাজে পুঁজি ও কারখানার মালিকগন শ্রমিক মজুরদের শোষণ করতে পারবে না। তারা উপযুক্ত বেতন দিয়া মজুর রাখতে বাধ্য হবে এবং মজুর রেখে যথাসময়ে ও যথেষ্ট পরিমাণে তাদের বেতন আদায় করতেও বাধ্য থাকবে। আর তারা যদি শ্রমিকদের বিপদগ্রস্থ করার জন্য সহসা কারখানা বন্ধ করে দেয় বা সহসা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় শ্রমিকগণ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তবে তাতেও মালিক শ্রেণির পরাজয় হবে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের এই বিভাগ এইসব শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের জন্য পূর্ব হতেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

মজুর-শ্রমিকদের সকল প্রকার বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ দায়ী। সেখানে কোন ট্রেড ইউনিয়নের বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা নাই। বস্তুত যাকাতের এই ব্যবস্থা পুঁজিদার ও মালিকদের শোষণ ক্ষমতার বিষদাঁত একেবারে চূর্ণ করে দেয়। পুঁজিপতি যদি নিজের মূলধন কোন অর্থকরী কাজে নিযুক্ত না করে, তবুও তাদের সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত অর্থে যাকাত ধার্য হবে। ফলে তারা মজুর শ্রমিকদেরকে ঠিক সেই পরিমাণ মজুরি দিতে বাধ্য হবে, যতখানি তারা পণ্য উৎপাদনের মূল ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

৫.১.৭.৩. অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা

ফকিরদের ন্যায় মিসকীনদের জন্যও যাকাতের অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 'মিসকিন' তাকেই বলা হয়, দৈহিক অক্ষমতা যাকে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জনহীন করে দিয়েছে; বার্ধক্য, রোগ, অক্ষমতা ও পঙ্গুতা যাকে উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করে দিয়েছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে বটে কিন্তু যা উপার্জন করে তা দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ হয় না; অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু ইত্যাদি সকল লোককেই মিসকিন বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, মিসকিনের অবস্থা ফকির অপেক্ষাও বেশি বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। কারণ অর্থনৈতিক অসমার্থ্যই তাকে দারিদ্র ও অকর্মণ্য করে দিয়েছে। অতএব তাদেরকে এমন পরিমান অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে এবং দারিদ্র্যের দুঃখময় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেয়ে স্বাচ্ছন্দ লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে। ইসলাম একদিকে যেমন লোকদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত করেছে, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বেকার, পঙ্গু, অক্ষম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও উপার্জন ক্ষমতাহীন লোকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দানেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে। ইসলামের অর্থনীতি যে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ তা এতে প্রমাণিত হয়।

---

[৩৫] সূরা আল হাশর, আয়াত : ৮

৫.১.৭.৪. যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

যাকাত বিভাগের কর্মচারীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত থাকবে আর অপর ভাগ তা সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় বন্টন করার কাজ সম্পন্ন করবে। এই উভয় কাজে যত কর্মচারী নিযুক্ত থাকবে, তাদের সকলের প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেওয়া এবং গোটা বিভাগের যা কিছু ব্যয় হবে তা যাকাতের আমদানি হতেই খরচ করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। এই বেতন প্রত্যেক কর্মচারী যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার অনুপাতে দিতে হবে। কিন্তু এর নিম্নতম হার হইতেছে নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ।

৫.১.৭.৫. নবমুসলিমদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা

যাকাতের পঞ্চমাংশ ব্যয় করা হবে মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্য। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের মূল হচ্ছে 'তালীফে কুলুব' অর্থ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম প্রচারের কাজ কোথাও প্রতিরুদ্ধ ও প্রতিহত হলে, কিংবা মুসলমানদের উপর কোথাও অত্যাচার হলে এবং তা টাকা দ্বারা দূর করা সম্ভব হলে সেই ক্ষেত্রে যাকাতের এই অংশের অর্থ ব্যয় করা হবে। যেন ফিতনা ও ফাসাদ, অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি না হতে পারে। অত্যাচারীও অনেক সময় টাকা পেলে অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ করে, এমনকি কখনো কখনো এরূপ ব্যবহার দেখে মুগ্ধ-বিস্মিত হয়ে শুধু জুলুমই বন্ধ করে না, অনেক সময় ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। অনুরূপভাবে সঙ্গতিহীন নওমুসলিমকেও এর দ্বারা নিজ পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করা।[৩৬]

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও জনতা যদি কখনো সামগ্রিকভাবে সমধিক ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে এবং তখন নিজ দেশে এইরূপ অর্থদানের আর কোন প্রয়োজনই না থাকে, তবে এই খাতের অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় তথা মিত্র রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে ব্যয় করা যেতে পারে।

৫.১.৭.৬. ক্রীতদাসদের মুক্তি বিধান

যাকাতের ষষ্ঠ অংশ ব্যয় করতে হবে দাসত্বের বন্ধন গ্রস্ত লোকদের মুক্ত ও স্বাধীন করার কাজে। এই অর্থ দ্বারা ক্রীতদাস খরিদ করে তাদেরকে মুক্তি করা হবে; ক্রীতদাস নিজে এই অর্থলাভ করে এর বিনিময়ে নিজেকে গোলামীর বন্ধন হতে মুক্ত করতে পারবে। ফলে সে একটি স্বাধীন জীবন লাভ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে বাঁচার সুযোগ লাভ করবে।

৫.১.৭.৭. ঋণ মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা

যাকাতের সপ্তমাংশ নির্দিষ্ট হয়েছে ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে। ঋণগ্রস্ত সাধারণত দুই প্রকার:

১. যারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণগ্রস্ত লোক যদি নিজে ধনী না হয়, তবে তাদেরকে যাকাতের এই অংশ হতে সাহায্য করা যাবে।

২. সেইসব লোক, যারা মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। এরা ধনী হোক গরীব হোক ঋণ শোধ করার পরিমাণ অর্থ যাকাতের এই অংশ হতে তাদেরকে দেওয়া যাইতে পারে।[৩৭]

---

৩৬ কাজী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী, *তাফসীরে বায়যাবী*, বৈরুত : দারু এহইয়াউত তুরাস আল আরাবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৮৬

৩৭ ইউসুব বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার আল-কুতুবী, *আল-কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাহ্*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদুল হাদীস, ১৪০০হি./ ১৯৮০খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৮৭

'গা-রিমীন' তাদেরকে বলা হয়, যারা নিজেদের ঋণ শোধ করতে অসমর্থ। 'হিদায়া' নামক প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, 'গারীম' তাকে বলে যাদের নিজেদের ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন অর্থ-সম্পদ নাই।[৩৮] তাফসীরে তাবারী গ্রন্থে 'গারীম' শব্দ হতে সেই সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ঋণের দুর্বহ ভারে বন্দি ও অবনত মস্তক; কিন্তু তাদের এই ঋণ অপচয়, অপব্যয়, অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি কিংবা দারিদ্র প্রভৃতি কারণে হয় নাই। যার বাড়িঘর জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, কিংবা বন্যা প্লাবনে মাল-আসবাব ভেসে গেছে, এই জন্য সে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করতে সমর্থ হইতেছে না; তাকেও 'গারিম' বলা হয়।[৩৯] এ সকল ব্যক্তির পক্ষ হতেই ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে এসব লোকের ঋণ আদায় করে দেওয়া রাষ্ট্রীয় প্রধানের কর্তব্য। নবী কারীম (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন, "আমি মু'মিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের তুলনায়ও ঘনিষ্টতর। সুতরাং মু'মিনদের কেউ মারা গেলে সে যদি ঋণ রেখে যায় (তার পরিত্যক্ত সম্পতি হতে যদি তা আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে) তা আদায় করা আমার দায়িত্ব। আর কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের।"[৪০]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বভার রেখে যাবে তা বহন করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি ধন-মাল রেখে মারা যাবে তা তাহার উত্তরাধিকারীদের হবে। আর যার কেহই উত্তরাধিকারী থাকবে না, আমি তার উত্তরাধিকারী হব। আমি তার ওসিয়ত পূরণ করব।[৪১] নবী কারীম (সা.) এর এই ঘোষণায় নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করার এবং তাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা ব্যবস্থার ভার সরাসরিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে, আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা কোন বাহ্যিক প্রতিকূলতার কারণে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে, যাকাতের এই অংশ হতে তাকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সাহায্য করতে হবে।

৫.১.৭.৮. বিনা সুদে ঋণ দান

রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত লোকদিগকে কেবল ঋণভার হতে মুক্ত করবে তাই নয়। আত্মনির্ভর করার জন্য ইতিবাচক ভাবে জনগণকে উৎপাদন মূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা সুদের ভিত্তিতে হবে না। উপরন্তু যাকাতের যে অংশ ঋণ শোধ করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, তাহতে লোকদেরকে পূর্বাহ্নেই ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদী কারবার ও সুদের লেনদেন একেবারেই জায়েজ নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।"[৪২] কাজে কেউ কাউকে টাকা ঋণ দিলে তাতে কোনক্রমেই সুদ নেওয়া বা দেওয়া যেতে পারে না। কোন নাগরিকই যাতে সুদের বিনিময় গ্রহণ করতে না পারে বা ঋণ নিয়ে সুদ দিতে বাধ্য না হয় ইসলামী রাষ্ট্র তার পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে এই সুদ দেওয়া ও নেওয়ার পাপ-অভিশাপ হতে চিরতরে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয়

---

৩৮ ইমাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবি বকর আল মারগিনানী, *হিদায়া শরহে বিদায়াতুল মুবতাদী*, করাচি: ইদারাতুল কুরআন ওয়ার উলুমুল ইসলামিয়া, কিতাবুয যাকাত, খ. ১, পৃ. ২২১

৩৯ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, কায়রো : মাকতাবাতে ইবনে তাইমিয়া, তা.বি., সূরা আত তাওবাহ, আয়াত-৬০, পৃ. ৩১৭-৩১৯

৪০ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র.) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *সুনান তিরমিযী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬খ্রি. খ. ৩, হাদীস নং- ১০৭০, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

৪১ *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারাঈদ, বাবু ফি মিরাসে জাউইল আরহাম, হাদীস নং- ২৮৮৯

৪২ সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২৭৫

কোষাগার হতে একটি বিভাগ স্থায়ীভাবে কাজ করবে। দেশের জনগণ এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও এই ফান্ড হতে প্রয়োজন অনুসারে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল বলে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমূহ এ জন্য তৎপর থাকতো বলে সেকালে সুদী কারবার এর অস্তিত্ব পর্যন্ত কোথাও ছিল না।

ইসলাম যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য ইসলামী জনতাকে উৎসাহিত করেছে, ঠিক সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব দিয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণ প্রদান করবে? উত্তম ঋণ ; যাতে আল্লাহ তার জন্য তা দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন।[৪৩]

এখানে উত্তম ঋণের অর্থ বিনা সুদে ঋণ দান এবং আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার অর্থ অভাবগ্রস্ত লোককে কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কাজে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে ঋণ দান করা। কৃষিজীবীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিনা সুদে কৃষি ঋণ দেওয়া রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে ফিকাহবিদদের ফায়সালা হল,

أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ إِذَا عجز عن زِرَاعَةِ ارضه لفقره دفع إليه كفايته من بيت المال قرضا ليعمل ويستغل أرضه

"জমির মালিক যদি দারিদ্র্যের কারণে তার জমি চাষ করতে অক্ষম হয় তাহলে প্রয়োজন মতো তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বিনা সুদে ঋণ দিতে হবে, যেন সে কৃষি কাজ করতে ও তার জমিতে ফসল ফলাতে সক্ষম হয়।"[৪৪]

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণও একথা স্বীকার করেছেন যে, যে সমাজে সুদের হার একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে এবং বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে, বস্তুত তাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সুসভ্য সমাজ। নীতিগতভাবে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু তা কার্যকর রূপে চালু করার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তারা পেশ করতে পারেন নাই। তারা যে সমবায় ঋণদান সমিতি বা ব্যাংকের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তা মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের পরিবর্তে সুদের অক্টোপাশে সমগ্র দেশকে দুশ্ছেদ্যভাবে বেঁধে ফেলেছে।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি সুদকে হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় নাই, নাগরিকগণ যাতে বিনা সুদে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ লাভ করতে পারে তার সুষ্ঠু ও স্থায়ী ব্যবস্থাও করেছে রাষ্ট্রের কোষাগার হতে। ইসলাম নাগরিকদিগকে শুধু অবাধ স্বাধীনতা দান করে না, স্বেচ্ছাচারিতার সহিত ধন লুণ্ঠন ও শোষণ পীড়ন চালানোর কোন অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র কাউকে দেয় নাই।

---

৪৩ সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৫

৪৪ আল্লামা আমিনুর রশীদ ইবনে আবেদীন শামী (রহ.), *রদ্দুল মুহতার*, রিয়াদ : দারু আলেমুল কুতুব, খ. ৩, পৃ. ৩৬৪

৫.১.৭.৯. ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

যাকাতের নবম অংশ ব্যয় হবে আল্লাহর পথে। 'আল্লাহর পথে' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রত্যেক জনকল্যাণকর কাজে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেই এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

৫.১.৭.১০. নিঃস্ব পথিকদের পাথেয় সংস্থান

যাকাতের দশমাংশ ব্যয় করা হবে 'ইবনুস সাবীল' বা নিঃস্ব পথিকদের জন্য। যেসব লোক কোন পাপের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বের হয় নাই, বের হয়েছে কোন সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এবং এইরূপ দেশ ভ্রমণ ব্যাপদেশে তারা একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের এই অংশের টাকা হতে এমন পরিমাণ দান করা যাবে যেন তারা তাদের তাৎক্ষণিক অনিবার্য প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে এবং নিজ ঠিকানায় ফিরে যেতে পারে। এমনকি যেসব মেহনতী ও শ্রমজীবী লোক কাজের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাইতে চায়; কিন্তু তাদের পথ খরচের সংস্থান নাই বলে যেতে পারে না, এইরূপ লোকদেরকেও রাষ্ট্রের এই অংশের অর্থ হতে যাতায়াতের খরচ দান করতে পারবে। কোন গ্রামবাসী শ্রমিক শহরে এসে উপার্জন করতে থাকাকালে আকস্মিক অনিবার্য কারণে যদি তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়, এবং তার পথ খরচ কিছুই না থাকে, তবে তাকে লোকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত দরাজ করতে বাধ্য না করে রাষ্ট্র তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবে। এসব আকস্মিক প্রয়োজনশীল লোকের নিজ নিজ ঘরে যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদও থাকে, তবুও তাকে এ সময় যাকাতের অর্থ হতে সাহায্য দান করা শরীয়ত বিরোধী কাজ হবে না।

যাকাতের এই অর্থ যে পরিমাণই আদায় হোক না কেন, তা যে সব সময় বাধ্যতামূলকভাবে আটটি খাতের প্রত্যেকটিতে ব্যয় করতে হবে ইসলামী অর্থনীতি এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নাই। প্রয়োজন হলে এর বিশেষ একটি খাতেও যাকাতের যাবতীয় অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যাকাত বাবদ আদায় কৃত অর্থ আঞ্চলিকভাবে বন্টন করা আবশ্যক। স্থানীয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে উক্ত অর্থ জমা করা এবং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তা বন্টন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী করীম (সা.) একস্থানে আদায়কৃত যাকাত ও সাদাকা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া কে সমর্থন করেন নাই। এ সম্পর্কে হাদিস অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। তবে নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তখনকার কথা স্বতন্ত্র। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, আটটি খাতের বাইরে অন্য কোন খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা কিছুতেই জায়েজ হবে না। নবী করীম (সা.) বলেছেন,

إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء

"আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যয়খাত নির্ধারণে কোন নবী বা অপর কারো ফয়সালার অপেক্ষায় থাকতে রাজি হন নাই। তিনি নিজেই এই খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তিনি এর ব্যয় খাতকে ৮ টি ভাগে ভাগ করেছেন।"[৪৫]

বস্তুত যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া নিখিল মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করার আর কোন পন্থাই নাই, থাকতে পারে না। আর এ নীতির বাস্তবায়নই পারে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করতে।

---

৪৫ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী [অনু. ড. আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক], *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., খ. ২, হাদীস নং- ১৬৩০, পৃ. ৪১৮-৪১৯

৫.২. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সুপারিশমালা

অত্র গবেষণার প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বালাদেশের স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনের সমস্যাগুলো পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বর্তমান না থাকা, রাষ্ট্রীয় সহায়তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোচনা এবং জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের প্রতি উৎসাহহীনতা এবং সর্বপরি ইসলামের যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন না থাকা এবং তা সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত থাকলে কী কী সুবিধা রাষ্ট্র পেত এবং এর মাধ্যমে কিভাবে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা যেত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বক্ষমান অনুচ্ছেদে আমি উক্ত আলোচনা ও অভিসন্দর্ভের আলোচনায় প্রাপ্ত সার্বিক তথ্য বিবেচনা করে কিছু সুপরিশমালা পেশ করছি। আশা করছি এগুলো বাস্তবায়ন করা হলে সমাজে পরনির্ভরশীলতা দূর হবে এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে বাংলাদেশ সম্মানের সাথে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারবে।

৫.২.১. জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান

ইসলামে জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম শিক্ষাদান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"আর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেন। তারপর সেসমস্ত বস্তু ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"[৪৬]

জ্ঞানই সব কিছুর ভিত্তিমূল। জ্ঞানের আলোকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। জ্ঞান তথা শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতিসত্তা। কোন জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হল শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণও শিক্ষা। কোন জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে সেই জাতির লোকদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। যখন তারা সেই আদর্শ অনুযায়ী তৈরি হবে তখনই একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সাধন সম্ভব। মহানবী রাসূলে আকরাম (সা.) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্বজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে। আর এজন্য তিনি হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে আসা ইসলামের সর্ব প্রথম বাণী ইক্বরার পথ ধরেই সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহাসম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"[৪৭]

---

৪৬ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত : ৩১

৪৭ সূরা আলাক্ব, আয়াত : ১-৫

হেরা পর্বতের নির্জন স্থানে নবী করীম (সা.) যখন স্রষ্টার ধ্যানে গভীরভাবে নিমগ্ন, ইসলামের সেই ঊষালগ্নে মহান আল্লাহ উপরোক্ত ৫টি আয়াত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করে ওহীর শুভ সূচনা করেন। এ ৫টি আয়াত মূলতঃ তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞান বিকাশের আহ্বান। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য ছাফা-মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, কাবা ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, উকাযের মেলা ঘুরে ঘুরে ইক্বরা তথা পড়ার সবক দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী হিসাবে তিনি ভাল করেই জানতেন সমাজের মানুষকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে, তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি বিধান করতে না পারলে সমাজের মধ্যে বন্যার স্রোতের ন্যায় সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হলেও তাতে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। সঠিক বিদ্যার্জন না করলে জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও পরিপক্কতা আসবে না। তাই তো কুরআন ও হাদীসে জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?"[৪৮]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে জ্ঞানার্জনের তাকীদ। হযরত রাসূল (সা.) এ তাকীদের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের উপর। মহানবী (সা.) বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"[৪৯]

আল্লাহকে জানা বা চেনার এটিই একমাত্র পথ। ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা অনুশীলন কোনটিই জ্ঞান ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্ভব নয়। আল্লাহ এবং ঈমানের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে এ সকল বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ কোন বিশ্বাসই অজ্ঞতার উপর স্থাপিত হতে পারে না, হলেও তা হয় ভঙ্গুর। তাই ধর্মের গভীরতা, ব্যাপকতা, বিস্তৃতি, আত্মনির্ভরশীলতার সাথে জীবনোপকরণের জন্য জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রয়োজন রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

"নিশ্চয়ই এ জ্ঞান ধর্ম স্বরূপ। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখবে কার নিকট হতে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করছ।"[৫০]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জ্ঞান কার নিকট হতে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা জ্ঞানের যুক্তির সাহায্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা অধিকতর সহজ। তবে পার্থিব জীবনে দেশ ও জাতির উন্নয়নমূলক জ্ঞান যার সাথে ঈমান ও আক্বীদার কোন বিরোধ নেই, তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের নিকট হতে গ্রহণ করা যায়। জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

---

৪৮ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ১২২

৪৯ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ২২৪, পৃ.১২০-১২১

৫০ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী [অনু. মাওলানা এ, বি, এম, এ, খালেক মজুমদার], *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২, হাদীস নং- ২৫৫, পৃ. ২৩৭

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে, সে কি সমান, যে এরূপ করে না। বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।[৫১]

প্রকৃত জ্ঞানই মানব সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে। জ্ঞান চর্চা প্রতিটি মানুষকে অপার মহিমায় আলোকিত করে তোলে। পবিত্র কুরআনে জ্ঞানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ

"বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?"[৫২]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক তফাৎ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

"আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সাধারণের উপরে যেমন আমার মর্যাদা।"[৫৩] তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, তাদের উপর আল্লাহর প্রশান্তি নেমে আসে, তাদেরকে আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তার ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন।[৫৪]

জ্ঞানার্জন ও বিতরণের মধ্যেই জাতির কল্যাণ নিহিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

---

৫১ সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৯

৫২ সূরা আর-রাদ, আয়াত : ১৬

৫৩ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ২০০৭, খ. ৫, হাদীস নং- ২৬৮৫, পৃ.১৩২

৫৪ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৬০৮, পৃ. ২০৫-২০৬

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"[৫৫]

কুরআন শিক্ষা করা শুধু ধর্মীয় জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে নয় বরং তা হলো দুনিয়াবি জীবনে সুন্দরভাবে চলার জন্য সব জ্ঞানের এক অনন্য ভান্ডার। তাই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কুরআনিক জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, পরিপূর্ণরূপে জীবনধারণের জন্য আল কুরআন হল একমাত্র গ্রন্থ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

"কোন ব্যক্তির কাছে ইলম তথা জ্ঞান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে অতঃপর সে তা গোপন করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।"[৫৬]

জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকতে হবে। অধিক জানার ভান না দেখিয়ে প্রয়োজনবোধে জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। নবী-রাসূলদের জীবনী থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল কুরআনে বর্ণিত সুরা কাহাফের বর্ণনা মতে হযরত মুসা (আ.) হযরত খিজির (আ.) এর কাছ থেকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করেছিল।

৫.২.২. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

দারিদ্রতা, অভাব, অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি পাওয়া, কর্মসংস্থানের জন্য ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে তার মহান দরবারে প্রার্থনা করা। হযরত ইবরাহিম (আ.) তার স্ত্রী ও সন্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে অসহায় অবস্থায় রেখে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের বেঁচে থাকা, জীবিকা, বংশধরদের জন্য নিরাপত্তা ও রিয্ক চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার সে প্রার্থনা হুবহু তুলে ধরেছেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

স্মরণ করুন যখন ইব্রাহীম (আ.) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! মক্কা শহরকে নিরাপদ শহরে পরিণত করুন। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদেরকে বিভিন্নভাবে ফলের দ্বারা রিয্ক দান করুন। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.) এর প্রার্থনার জবাবে বললেন, কাফেরদেরকেও আমি কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগের সুযোগ দেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম![৫৭]

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কাবাঘর প্রতিষ্ঠার পর সেটি ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করলেন এবং একই সঙ্গে মক্কা শরীফের অধিবাসীদের জন্যে আল্লাহর কাছে দুটি জিনিসের আবেদন জানালেন। একটি নিরাপত্তা ও শান্তি আর অপরটি হলো জীবন ধারণের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা। যদিও ইব্রাহীম (আ.) কেবল মুমিনদের জন্য দোয়া করেছেন, কিন্তু তারপরও আল্লাহপাক জবাবে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে

---

[৫৫] আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) [অনু. সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৩, হাদীস নং- ১৩৮৯, পৃ. ৪৬

[৫৬] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৫০, পৃ. ১১০

[৫৭] সূরা আল বাক্বারা, আয়াত :১২৬

সবার জন্যে বস্তুগত রিয্ক দান করবেন। তিনি কাফেরদেরকে তাদের অবিশ্বাসের জন্য দুনিয়ার ধন-সম্পদ বা ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেন না। যদিও তারা তাদের কাজের জন্য পরকালে দোযখে প্রবেশ করবে।

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)ও তার পরিবার-পরিজনের রিয্কের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন,

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের রিয্ক (পানাহারের ব্যবস্থা) ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমান রাখুন।[৫৮]

৫.২.৩. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আমল

আত্মনির্ভরশীলতার জন্য দরকার কোন কর্মক্ষেত্র, চাকরি বা কাজ। কিন্তু তা যখন তখন পাওয়া সব সময়ই কঠিন। ভালো মান-সম্মত চাকরি বা কাজ পাওয়াতো আরও বেশি কঠিন। তা পেতে অনেক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। আর বর্তমান সময়ে চাকরি তো এক দুঃস্বপ্নের নাম। কেননা কর্মক্ষেত্রের তুলনায় চাকরি প্রত্যাশীর সংখ্যা বেশি। তা দিন দিন বেড়েই চলছে। তাই ভালো চাকরি বা কাজ পেতে যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি কুরআনি আমলও করা যেতে পারে। এর জন্য রয়েছে একটি দোয়া ও তাসবিহ। আর তাহলো দোয়া-

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ নাজিল করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।"[৫৯]

আল্লাহ রিযিকদাতা তাই তার কাছে সব সময় আত্মনির্ভরতার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"[৬০]

৫.২.৩.১. তাসবিহ

ভালো চাকরির নিয়তে দিনে যতবার খুশি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের আমল করা এবং বেশি বেশি পাঠ করা।

يَا وَهَّابُ কোনোরূপ প্রতিদান ব্যতীত অধিক দানকারী। হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রিজিকের প্রশস্ততার জন্য (ভালো কাজ বা চাকরির প্রত্যাশায়) চাশতের নামাজের সময় ১২ রাকাআত নামাজ পড়ে সিজদায় গিয়ে (يَا وَهَّابُ) পবিত্র গুণবাচক নামের জিকির ১০০ বার অথবা ৫০ বার পাঠ করে। তবে অবশ্যই তার রিজিকের অভাব থাকবে না।

৫.২.৩.২. দোয়ার উৎস

কুরআনুল কারীমে হযরত মুসা (আ.) একটি আকুতি ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় লাভ ও কাজ অনুসন্ধানের আহ্বান উঠে এসেছে। কুরআনে সে ঘটনাটি এভাবে এসেছে-

---

[৫৮] *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, অধ্যায় : যাকাত, বাব : ৫৩, হাদীস নং- ২৪২৭

[৫৯] সুরা আল কাসাস, আয়াত : ২৪

[৬০] সুরা মু'মিন, আয়াত : ৬০

> হযরত মুসা (আ.) ফেরাউনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর তার কোথাও যাওয়ার, আশ্রয়ের কিংবা জীবিকার কোনো সংস্থান ছিল না। সে সময় তিনি ফেরাউনের ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেছেন-যখন সে মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছল। সেখানে দেখলো একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দুজন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলে আছে। হযরত মুসা (আ.) বললেন, তোমাদের কি হলো? (দাঁড়িয়ে আছ কেন?) ওরা (নারী) বলল, রাখালরা ওদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ।[৬১]

এর পরের আয়াতেই হযরত মুসা (আ.)-এর কাজ চেয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়ার আবেদন এসেছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর সে আহ্বান এভাবে তুলে ধরেন-

> মুসা (আ.) তখন ওদের (দুই নারীর) পশুগুলোকে পানি পান করালো। তারপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল-হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ আমার কাজ বা চাকরি দরকার, তুমি আমার জন্য যে কাজ বা জীবিকার ব্যবস্থা করবে। আমি তোমার ব্যবস্থা করা সে কাজের বা জীবিকার মুখাপেক্ষী।[৬২]

ভালো চাকরি পেতে যে এ দোয়া কার্যকরী তা পরের ঘটনাতেই প্রমাণিত। আল্লাহ বলেছেন-

> তখন (ওই) দুই নারীর একজন লজ্জাজড়িত পদে তার কাছে এসে বললো, আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন, তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। অতঃপর মুসা (আ.) তার কাছে এসে সব ঘটনা বর্ণনা করলে সে বলল, ভয় করো না। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ। ওদের (দুই নারীর) একজন বলল, হে আব্বা! আপনি একে মজুর হিসেবে নিযুক্ত করুন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে নিশ্চয় সে (মুসা) উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।[৬৩]

এভাবে হযরত মুসা (আ.) এ আহ্বানের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম কর্মক্ষেত্র ও জীবিকা লাভ করেছিলেন এবং নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

৫.২.৪. সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার বাস্তবায়ন

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্যে হিকমা প্রয়োগ অপরিহার্য। হিকমা মানে- যথার্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো। মূলত টিকে থাকা, উন্নয়ন, সাফল্য অর্জনের কৌশল ও সঠিক পদক্ষেপকে হিকমা বলা হয়। কুরআন বলছে, হযরত রাসূল (সা.) তাঁর সাথীদের মানবীক ও নৈতিক সত্তার উন্নয়ন এবং কিতাব শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে হিকমাও শিক্ষা দিতেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়ে, যিনি তাদের প্রতি আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের তাযকিয়া (মানবীক ও নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন) করেন, তাদের আল কিতাব (কুরআন) এবং হিকমা শিক্ষা দান করেন।"[৬৪] মূলত

---

৬১ সুরা কাসাস, আয়াত : ২৩

৬২ সুরা কাসাস : আয়াত ২৫-২৬

৬৩ সুরা কাসাস : আয়াত ২৫-২৬

৬৪ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সমাজের গোটা অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য হিকমা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।

৫.২.৫. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সরকারের জবাবদিহিমূলক জনসেবা প্রয়োজন

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বেসরকারি খাতে অধিক হারে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আর বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো সমস্যা দূর করতে হবে। বাংলাদেশে যুবকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো হলো- তথ্য প্রযুক্তি, কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ নির্মাণ, পোশাক শিল্প, পর্যটন ও হালকা কারিগরি নির্মাণ খাত। বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের জন্যই প্রয়োজন। অঞ্চলভিত্তিক ইকোনমিক জোন প্রতিটি অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের পথ প্রশান্ত করতে সহায়ক হবে। শিল্প কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশে যে পরিমাণ বেকার ছেলে-মেয়ে রয়েছে, সে পরিমাণ কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। এটি আমাদের জন্য বড় একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেকারত্ব দূর করে আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করতে হলে সর্বপ্রথম পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার দায়িত্ব শুধু সরকারের উপর চাপালে চলবেনা। বেসরকারি খাতগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে সরকারকে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিক যাতে সহজে সরকারি সেবাখাত থেকে তাদের সেবা নিশ্চিত করতে পারে সেজন্য সকল খাতকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। তাহলে আশাকরা যায় আত্মনির্ভরশীলতার পথ সুগম হবে।

৫.২.৬. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য সহায়তা প্রকল্প চালু করা। এ কাজটি আমাদের দেশে চালু থাকলেও পর্যাপ্ত নয়। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পুষ্টি সমস্যা বা পুষ্টি ঘাটতি দূরীভূত করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিরাপদ ও পুষ্টিমান খাবার নিশ্চিতে বর্তমানে ৪৬৩টি সংস্থা কাজ করছে। এ ছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সমস্যা দূর করতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য।[৬৫] হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যার একটি অংশ আপর অংশকে শক্তিশালী করে।"[৬৬] অর্থাৎ একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের বিপদ-আপদে সব রকমের সাহায্য নিয়ে তার পাশে দাড়াবে এটা তার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন,

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

---

৬৫ দৈনিক যুগান্তর, ১২ এপ্রিল ২০১৯

৬৬ *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৩৪৯, পৃ. ১১৬

"যে ব্যক্তি তার ভাই এর অভাব-অনটন পূরণ করবে আল্লাহ তার অভাব-অনটন দূরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদানে কিয়ামত দিবসে তাকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিবেন।"[৬৭]

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন,

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

"সমস্ত মুসলিম এক ব্যক্তির মত। যদি তার চক্ষু পীড়িত হয় তবে তার সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি তার মাথা অসুস্থ হয় তাহলে সমগ্র শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে।"[৬৮] আল্লাহ আল কুরআনে আরও এরশাদ করেছেন, "তাদের (বিত্তশালী) ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৬৯]

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে অন্যত্র এরশাদ করেছেন, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দরিদ্র, এতিম ও বন্দিদের খাদ্য দান করে।[৭০] মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সমাজে সেই মানুষেরই একটা অংশ গরীব-দুস্থ। তারা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গরীব-দুস্থসহ সমাজের আশ্রয়হীন, দুর্বল ও অসহায় মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামে অন্যতম ইবাদত। অসচ্ছল, বিপদগ্রস্ত এবং অভাবী মানুষের সাহায্যে কেউ এগিয়ে এলে আল্লাহ খুব খুশি হন। আল্লাহর কোন বান্দাকে খাদ্য, পানি বা চিকিৎসার কাজে সহযোগিতা করার অর্থ হলো সরাসরি আল্লাহ তা'আলাকেই সহযোগিতা করা। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বান্দাহদের উদ্দেশ্যে বলবেন,

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়োছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কি করে তোমাকে আহার করাতে পারি! তুমি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে পান করাব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেতে।[৭১]

---

৬৭ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৩৪২, পৃ. ১১৩

৬৮ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৩৫২, পৃ. ১১৭

৬৯ সূরা আয জারিয়াত, আয়াত : ১৯

৭০ সূরা আদ-দাহর, আয়াত : ৮

৭১ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৩২২, পৃ. ১০৫-১০৬

তাই গরীব-অসহায়, দুস্থের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা প্রদর্শন, সহানুভূতিশীল হওয়া ও তাদেরকে সব রকমের সহযোগিতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। সমাজের কেউ যেন দারিদ্রতা, অভাবের তাড়নায় অসহায়ভাবে জীবনযাপন না করে সে জন্য ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫.২.৭. জীবনযাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

অর্থ উপার্জন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম জোর তাকিদ প্রদান করেছে। কেননা ইসলামে বৈরাগ্যবাদ ও ভিক্ষাবৃত্তির কোন সুযোগ নেই। কেননা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরজ।"[৭২] আর ব্যক্তির উপার্জিত সম্পদ তার ইচ্ছামত ব্যয় করার কোন সুযোগ নেই। বরং ইসলাম প্রদর্শিত পন্থায় ব্যয় করাই হল ইসলামের সুমহান আদর্শ। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে চলতে উৎসাহিত করেছে। ইসলাম কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি যেমন পছন্দ করে না; তেমনি ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে আবার ছাড়াছাড়িও সমর্থন করে না। সর্বক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাকে পছন্দ করে। ইসলামে এ বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াড়িকে বলে ইফরাত ও তাফরিত। ইসলামে উভয়টাই পরিত্যাগ করার ব্যাপারে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। এক কথায় সব কাজ-কর্মে মধ্যমপন্থার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি বলতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনকারীদেরকে বোঝায়। একজন মুসলিমের সৌন্দর্যই হলো তার ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা ও উদারতা। মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিরা সব কিছুতে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ রয়েছে। আমাদের রাসূল (সা.) সব পরিবেশ পরিস্থিতি সবরের সাথে মোকাবেলা করতেন। যার ফলে হযরত রাসূল (সা.)-এর জমানায় মুসলমানেরা সব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করত।

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হল মিতব্যয়িতা ও অর্থ ব্যয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করলে ব্যক্তি তার আর্থিক উপায়-উপাদান ব্যবহার করার ব্যাপারে সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ি, কৃপণতা বা অপচয় করে ধন সম্পদের ভারসাম্য নষ্ট করবে না। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের ব্যাপক শিক্ষা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।"[৭৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী (মিতব্যয়ী)।"[৭৪] কুরআনের এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তি যেন উপায়-উপার্জনের অর্থ ব্যয় করে। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সে কখনও সীমালঙ্ঘন করবে না। আর আয় অপেক্ষা অধিক পরিমানে ব্যয়ও করবে না। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত অযথা ব্যয়ের জন্য অপরের কাছে হাত বাড়াতে বাধ্য

---

৭২ আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী [সম্পাদনায়: আব্দুল কাদির আতা], *সুনান আল-বায়হাকী*, মক্কা আল-মুকাররমা: মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি/১৯৯৪ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ১২৮

৭৩ সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৯

৭৪ সুরা আল ফুরকান, আয়াত : ৬৭

হবে। অপরের রুজি-রোযগার কেড়ে নিবে ও প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কাছ থেকে অথবা কোন ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহন করবে। অথবা পরের টাকা ঋণ নিয়ে তা আদায় করবে না, কিংবা এতদুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তা আদায়-উসুল করার জন্য নিজের সমস্ত আর্থিক উপায় উপাদান ব্যয় করে নিজেরেই কর্মফল হিসেবে নিজেকে গরীব মিসকিনদের পর্যায়ে শামিল করে দিবে, এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে জীবনযাপনে অত্যন্ত কৃপণ হওয়াও উচিত নয়। কারো আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী যতটা ব্যয় করার অনুমতি ইসলাম প্রদান করেছে সে অনুযায়ী ব্যয় করা উচিৎ। নিজের আয়ের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এটা নয় যে, ভাল আয় করতে পারলে তার সমস্ত উপার্জনকে নিজের আরাম-আয়েশ ও জাকজমকের জন্য ব্যয় করবে। কেননা তার নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী লোকজন চরম বিপদ-আপদের মধ্যে বসবাস করবে; আর সে এরূপ বিলাস-বাসনে লিপ্ত থাকবে, এরূপ স্বার্থপরতাপূর্ণ ব্যয় ইসলামের দৃষ্টিতে চরম অপব্যয় হিসেবে গন্য করা হয়। বরং নিজের আত্মীয়-স্বজন, সমাজের অভাবী ও দুর্বল মানুয়ের জন্য আল্লাহ তার উপার্জিত সম্পদে অধিকার প্রদান করেছেন। সে বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেলে চলবে না। কেননা আল্লাহর পথে খরচ করাও আর্থিক ইবাদত। আবার প্রয়োজনের কম কোনো কাজ করাও ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং সব কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। এভাবে বিশ্বনবীর আদর্শ অনুসরণে হাদিসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

> হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তিনজন লোক হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের ঘরে আসল। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর ইবাদত-বন্দেগি সম্পর্কে জানতে চাইল। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হল, তখন তারা যেন এটাকে অপ্রতুল মনে করল। আর বলল, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর আগের পরের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি সারা রাত নামাজ পড়তে থাকব। আরেকজন বলল, আমি সারা জীবন রোজা রাখব। কখনো রোজা ছাড়ব না। আরেকজন বলল, আমি মেয়েদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখব, কখনো বিয়ে করব না। ইতিমধ্যে হযরত রাসূল (সা.) তাদের কাছে আসলেন। আর বললেন, তোমরা তো এ কথাগুলো বলেছ। আল্লাহর কসম! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি। তাঁর সম্পর্কে বেশি তাকওয়া (পরহেজগারি) অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি আবার রোজা ছেড়ে দেই। আমি নামাজ পড়ি আবার নিদ্রা যাই। আর বিয়ে-শাদীও করি। যে আমার আদর্শের (সুন্নাত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত (উম্মত) নয়।"[৭৫]

হাদিসের ভাষ্যে বোঝা যায় জীবনযাপন, ইবাদাত সহ কোন কাজে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি বাদ দিয়ে বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ।

৫.২.৮. রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা

যখনই কোন রাষ্ট্রে অভাব, দুর্যোগ ও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে তখন সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের দূর্ভোগ লাঘব করে আত্মনির্ভরশীল হতে সহযোগিতা করা যায়। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু নজীর বিদ্যমান আছে। ইসলামী রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করত না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, "একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণের মালিক। তিনিই স্বচ্ছলতার সৃষ্টি করেন। তিনিই হচ্ছেন রিযিকদাতা; মূল্য নির্ধারণের বিষয়টিও তারই হাতে রয়েছে।"[৭৬] কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় (যেমন, যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষের সময়) খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে

---

[৭৫] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, হাদীস নং- ৪৬৯৩, পৃ. ৩৮১-৩৮২

[৭৬] *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৪১৫, পৃ. ৩৯৬

হস্তক্ষেপ করার পুরোপুরি অধিকার সরকারের রয়েছে। এই অধিকারের বলে সরকার রেশনিং ব্যাবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবারহের এমন ব্যবস্থা করবে যাতে প্রত্যেক লোকের কাছেই খাদ্য পৌছে যায়। ক্বুরআনুল কারীমে হযরত ইউসুফ (আ.) এর যুগে দুর্ভিক্ষের সময় সাত বছর ধরে রেশনিং ব্যাবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে যখন মিসরে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন ইউসুফ (আ.) সেখানে রেশনিং প্রথার প্রবর্তন করেন। তখনকার মিশর সম্রাটের একটি স্বপ্নের তা'বীর (ফলাফল বর্ণনা) করতে গিয়ে ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন,

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلاً مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلاً مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ

ইউসুফ বললো, তোমরা একাধারে সাত বছর খুব ভালভাবে চাষ করবে। তখন যে ফসল উঠবে তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার রেখে বাকি ফসল শীষসহ রেখে দিবে (যাতে সেগুলো নষ্ট না হয়)। অত:পর আসবে অতি কঠিন সাতটি বছর, তোমরা এই সময়ের জন্য যে শস্য সঞ্চয় করছিলে-এই সাত বছর সেগুলো খেয়ে (শেষ করে) ফেলবে, সামান্য যা তোমরা (বীজ প্রভৃতির জন্য) হেফাজত করে রাখবে তা বাদে।[৭৭]

সম্রাটের স্বপ্নের সঠিক তা'বীর বলতে পারায় সম্রাট তাকে অর্থ ও খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। কুরআন এবং তাওরাতের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে একজন দুরদর্শী অর্থনীতিবিদ রূপে পেশ করা হয়েছে। তাওরাতের বর্ণনামতে মিসরবাসী দুর্ভিক্ষের কারণে এক পর্যায়ে যখন তাদের সমস্ত জমিজমা ও নগদ অর্থ শেষ হয়ে গেল তখন হযরত ইউসুফ (আ.) লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখ, আমি আজ তোমাদের এবং তোমাদের জমিজমাকে ফেরাউনের জন্য কিনে নিলাম। এখন এই বীজগুলো নিয়ে গিয়ে তোমরা জমিতে বপন কর এবং যখন শস্য বেশি হবে তখন ফেরাউন এর এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী হবেন এবং চার-পঞ্চমাংশ ক্ষেতের বীজ রাখার জন্য এবং তোমাদের ও তোমাদের পরিবার বর্গের খাবার জন্য থাকবে।' তারা বললো, 'আপনি আামাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন আমরা আমাদের প্রভূর করুনা পাওয়ার যোগ্য। আমরা ফেরাউনের দাস হয়েই থাকব।' আর ইউসুফ (আ.) মিসরে এই আইন জারি করেন যে, "ফেরাউন শুধু এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবেন এবং শুধু পূজারীদের জমির অধিকারী তিনি হবেন না।"[৭৮] হযরত ইউসুফ (আ.) এর গৃহীত পদক্ষেপে সাত বছরের দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মিসরবাসীকে রক্ষা করার কৌশল তারপর রিক্ত হস্ত মিসরবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য তার গৃহীত পদক্ষেপ যা ক্বুরআন ও তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে তা কিয়ামত বর্তমান ও অনাগত জাতির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

রেশনিং ব্যবস্থা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেও ছিল। মদিনায় হিযরতের পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার কুরাইশদের অর্থনীতিকে বিকল করে দেওয়ার জন্য তাদেও বানিজ্য কাফেলাগুলোকে বাধা দিতে মনস্থ করেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, "একবার হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) একদল সেনাবাহিনীকে সমুদ্রপকূলে প্রেরণ করেন। আবু উবায়দা বিন আল জাররাহকে ঐ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনশত সৈন্যের সেই বাহিনীতে আমিও ছিলাম। যা হোক আমরা রওয়ানা হলাম এবং চলতে চলতে পথিমধ্যে কোন এক স্থানে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেল। আবু ওবায়দা সমস্ত খাদ্য একত্র করার নির্দেশ দিলেন। অত:পর দেখা গেল, সমগ্র বাহিনীর কাছে মোট দু'বস্তা খেজুর ছাড়া আর কিছুই নেই। এবার আবু উবায়দা তা থেকে কিছু কিছু করে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাও ফুরিয়ে গেল। দৈনিক একটি করে খেজুর আমাদের ভাগে পড়ত। আমি বলতাম, "একজন লোকের জন্য কি

---

৭৭ সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৭-৪৮

৭৮ *তাওরাত*, পয়দায়িশ : ৪৭ তম অধ্যায় : নং ১৪-২৬

একটি খেজুর যথেষ্ট হবে?" জাবির বলেছেন, আমরা এই একটি খেজুরের মূল্যও হাড়ে হাড়ে উপলব্দি করতে পারছিলাম যখন ঐ একটি মাত্র আমাদের ভাগ্যে জুটত না।"[৭৯]

এ ছাড়াও হুদায়বিয়া এবং তাবুক যুদ্ধকালীন সময়ে এমন বহু ঘটনা হাদিস ও ইসলামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধকালীন সময়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও কোন কোন সময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন যে, তাকেও রেশনিং প্রথা চালু করতে হত। সালমা বিন আকওয়া বলেছেন, "একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে যুদ্ধে বেরিয়ে ছিলাম। সেখানে আমরা খাদ্য কষ্টের সম্মুখীন হই এবং আমাদের কিছু উট জবেহ করতে মনস্থ করি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিলেন, 'যেন আমরা আমাদের সমস্ত পাথেয় তার সামনে উপস্থিত করি'। একটি চামড়া বিছিয়ে তার উপর সেনাবাহিনীর সমস্ত পাথেয় জড়ো করা হলো। আমরা মোট চৌদ্দশত লোক ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সবাই খুব পেট ভরে খেল এবং নিজেদের থলে গুলোও ভর্তি করে নিল।[৮০]

৫.২.৯. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি

একজন ব্যক্তি যখন নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কোন চাকরি বা কারো অধিনস্ত না থেকে নিজে থেকেই কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থল স্থাপন করার চেষ্টা করেন বা পরিকল্পনা শুরু করেন তখন তাকে উদ্যোক্তা বলা হয়। ব্যবসায় উদ্যোক্তার উদ্যোগ যখন সফল কিংবা স্বনির্ভর হয় তখন তাকে বলা হয় ব্যবসায়ি। সকল ব্যবসায়ি একজন উদ্যোক্তা কিন্তু সকল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ি নন, একজন ব্যবসায়ি তার ব্যবসায়িক জীবনের সবচেয়ে কঠিন এবং গুরত্বপূর্ণ সময় একজন উদ্যোক্তা হিসাবে কঠোর মনোবল, উদ্যম প্রাণশক্তি ও আত্মবিশ্বাস কে সঙ্গী করে শত বাঁধা পেরিয়ে একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যবসায়ি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যান।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হবেন, যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজে অন্যদের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন, ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান এবং একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সে ক্ষেত্রে সকল ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে আত্মকর্মসংস্থানকারী বলা গেলেও সকল আত্মকর্মসংস্থানকারীকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা যায় না ।

দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায় উদ্যোক্তার জীবনী পাঠ করে দেখা যায় যে, তাদের বেশির ভাগই প্রথম জীবনে ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। দৃঢ় মনোবল, কঠোর অধ্যবসায় ও কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তারা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন। উদ্যোগ যে কেনো বিষয়ের ব্যাপারেই হতে পারে কিন্তু লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ । আর যে ব্যক্তি এই ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহন করেন তিনিই উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা এমন ব্যবসায়ি যিনি নতুন কোনো ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করেন, যা আগে কেউ করেননি অথবা পুরনো কোনো ব্যবসাকে নতুনরূপে নিয়ে আসেন। তিনি নতুন ব্যবসা কিভাবে শুরু করবেন, চালাবেন এবং কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করবেন, সেখান থেকে কতটুকু লাভ করবেন তার পরিকল্পনা করেন। একজন সফল উদ্যোক্তার প্রধান গুণাবলি হলো, তিনি অত্যন্ত সৎ ও সত্যবাদী হবেন। তিনি দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করতে পারবে।

ব্যবসার মধ্যে মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের একটি শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা পেশাকে অন্য পেশার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তবে শর্ত হলো, সেটা শরিয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হতে হবে। ব্যবসায় মগ্ন হয়ে কিছুতেই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া যাবে না। পবিত্র

---

৭৯ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, হাদীস নং- ৪০২১, পৃ. ১৮৯-১৯০

৮০ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৪৩৬৯, পৃ. ২৫৮-২৫৯

কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়"।[৮১]

উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)। পবিত্র হাদিসে এরশাদ হয়েছে, তোমরা ব্যবসার প্রতি মনোযোগী হও, কেননা ৯০ শতাংশ রিজিক এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক হাদিস থেকেই ব্যবসার মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিভাত হয়। বেশির ভাগ সাহাবী, তাবেয়ী, আলেম ও ফকীহ এ পেশাই অবলম্বন করছেন। মুসলমানরাও এ অঙ্গনে বিশেষ উন্নতির মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

হালাল পথে ব্যবসা পরিচালনাকারীদের কিয়ামতের দিন সর্বোচ্চ সম্মাননা দেওয়া হবে। হযরত রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, " বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সঙ্গী হবেন।"[৮২]

মহানবী (সা.) নিজেও একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করে কুরাইশের অন্য যুবকদের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁর হাতেখড়ি। চাচার সঙ্গীরূপে ইয়েমেন ও শামে বাণিজ্য সফরেও আসা-যাওয়া হতে লাগল। ইবনে সাদ (র.)-এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হযরত রাসূল (সা.) চাচা আবু তালেব কিংবা অন্য ব্যবসায়ী সঙ্গীদের সঙ্গে বাজারে কর্মতৎপর ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে হযরত রাসূল (সা.) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাথমিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। খাদিজা (রা.)-এর বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সিরিয়া সফরের আগে ২৫ বছর ধরে তিনি কমবেশি ব্যবসা করেছেন এবং সফলভাবেই করেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। এমনকি আরবের আনাচে-কানাচে তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতার সুখ্যাতির সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে ইসলাম এসেছে উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে। এই ভূখন্ডে সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁরা মুজাহিদ ছিলেন না। এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারকারী ছিলেন কিছুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী উদ্যোক্তা, যাঁরা ব্যবসায়ীর বেশে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁরা নিজেদের ব্যবসার মাধ্যমে এমন সুমহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যে, এ অঞ্চলের মানুষের অন্তরে তাঁদের প্রতি সীমাহীন অনুরাগ জন্ম নেয়। ফলে ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে এবং ইসলামকে তারা একটি শ্রেষ্ঠ দ্বীনরূপে গ্রহণ করে নেয়।

তাই আমাদের উচিত বেকারত্বের শিকল ছিঁড়ে ফেলে একজন সৎ উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার চেষ্টা করা। হযরত রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত মোতাবেক ব্যবসা করে পৃথিবীকে ইসলামের সৌন্দর্য জানান দেওয়া। মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা।

৫.২.১০. জীবিকা উপার্জনে সতর্কতা অবলম্বন করা

জীবিকা উপার্জন ভাল ভাবে বুঝে শুনে করা উচিৎ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক আনসার সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দিলেন। পুনরায় তারা চাইলে তিনি তাদের দিলেন। এমনকি তার নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন,

---

[৮১] সুরা আল মুনাফিকুন, আয়াত : ৯

[৮২] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১২১২, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

আমার নিকট যে সম্পদ থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে যাচনা করা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে পরমুখাপেক্ষী হয় না, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ছবর দান করেন। ছবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।[৮৩]

সুতরাং মনের দিক থেকে অল্পে তুষ্ট থাকা, কারো নিকটে হাত না পাতা, ধৈর্যধারণ করা কাম্য। আর শারীরিক দিক থেকে কাম্য হল কাজ করে হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ.

"তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে বাজারে যায়, তারপর সেখানে তা বিক্রি করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে আত্মনির্ভর করবেন, এটা মানুষের কাছে তার হাত পাতার চেয়ে উত্তম। কারণ মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।"[৮৪]

এজন্যই মক্কার লোকেরা ব্যবসা করত, আর মদীনার লোকেরা চাষাবাদ করত। তাই কারো উপর নির্ভর না করে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে বৈধ উপার্জনের জন্য যে কোন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিৎ। তাহলে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ হবে।

৫.২.১১. নিজস্ব আয়ের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ করা

ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে হলে নিজস্ব আয়ের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃত ঈমানদারগন শুধু নিজ প্রয়োজন মাফিক খরচ করেন। তারা কৃপণতাও করেন না। আবার অপচয়ও করেন না। তারা মিতব্যয়ী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন। তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। তাদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর তারা যখন ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।"[৮৫] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إن من فقه الرجل رفقه في معيشته

"ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।"[৮৬]

হযরত রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

---

৮৩ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৩৮৪, পৃ. ৪৪

৮৪ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৩৮৬, পৃ. ৪৫

৮৫ সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ৬৭

৮৬ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.), *মুসনাদে আহমাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি., খ. ৫, হাদীস নং- ২১৭৫৪, পৃ. ১০৬

"একটি বিছানা স্বামীর জন্য, আরেকটি স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।"[৮৭]

এর উদ্দেশ্য হল খরচ কম করা, যাতে করে ঋণ করতে অন্যের দারস্থ হতে না হয়। নিজের সম্পদ দ্বারাই যেন নিজের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তা'আলা নিজ উপার্জনকে অপচয় ও অপব্যায় করতে নিষেধ করে ঘোষণা করেছেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"তোমার হাতকে তোমার গলার সাথে বেঁধে দিও না, আর তা একেবারে প্রসারিত করেও দিওনা, তা করলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।"[৮৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে।"[৮৯]

অর্থাৎ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে নিজ উপার্জন হতেই জীবনযাপন করে। আর এভাবে জীবনযাপন করতে পারলে তার জন্য আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা সহজ হয়ে যায়।

৫.২.১২. রিযিকের অভাব মনে করে সন্তান হত্যা না করা

অনেকে মনে করে থাকেন তার যে আয় তাতে যদি একাধিক সন্তান গ্রহন করেন তাহলে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। চিকিৎসা, লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারবেন না। তাই একজন বা দু'জন সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। এরপর বিভন্ন পদ্ধতি গ্রহন করে সন্তান জন্ম দানে বিরত থাকেন। কোন কারণে স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে ভ্রুনেই হত্যা করে ফেলেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছে রিয্ক প্রশস্ত করে দেন, যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন, তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, প্রত্যক্ষদর্শী। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিয্ক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা মহাপাপ।"[৯০] যদি এই রিযিকের ভয়ে বা খরচের ভয়ে এভাবে সন্তান হত্যা করা হয় তবে তা হারাম ও কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরো বলেছেন,

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

---

৮৭ *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, জুন ২০০৮, হাদীস নং- ৩৩৮৬, পৃ. ৪০৯-৪১০

৮৮ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৯

৮৯ সূরা আর ফুরকান, আয়াত : ৬৭

৯০ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৯-৩০

"যমীনে বিচরণশীল সমস্ত জীবের জীবিকার ব্যাবস্থা আল্লাহর করেন, তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।"[৯১] তাই সন্তানকে বোঝা মনে না করে যদি সত্যিকার মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায় তাহলে উৎপাদন বাড়বে, উন্নয়ন তরান্বিত হবে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের দু:খ দুর্দশা দুর হবে। সবাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাবে। আল্লাহর রহমতে সমাজ সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে।

৫.২.১৩. দানের অভ্যাস তৈরি করা

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

"নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে দাতা আর নিচের হাত হচ্ছে গ্রহীতা।"[৯২]

হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সামাজ থেকে দারিদ্র দূর করা, যাতে দানকারীর সংখ্যা বেশী হয় এবং গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পায়। এছাড়া পরকালে হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করা, হযরত রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের জীবন পরচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, অপচয়কারীদের সাহচর্য পরিহার করা এবং মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অপব্যয় ও অপচয় থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

৫.২.১৪. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে মালিকানার ধারণার পরিবর্তন করা

সম্পদের উপর একচ্ছত্র মালিকানা মানুষের ভেতর সেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম দেয়। এ সেচ্ছাচারী মানসিকতাই হচ্ছে শোষণের মূল, যা সমাজের একাংশকে পরনির্ভরশীল করে দেয়। মহানবী (সা.) সম্পদের উপর মানুষের নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে শুরুতেই শোষণবাদী মানসিকতার মুলোৎপাটন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দুটি যুগান্তকারী মূলনীতি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দেন। প্রথমতঃ সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টি জগতের কোন বস্তু তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেনো মানুষ তার আসল মালিক নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ

"আকাশ মণ্ডলী ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।"৯৩

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন,

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহরই।"৯৪

দ্বিতীয়তঃ মালিকানার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহর বিধান পুরাপুরি মেনে চলবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে সে একটি কর্পদকও আয় ব্যয় করবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

---

৯১ সূরা হুদ, আয়াত : ৬

৯২ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৩৪৪, পৃ. ২২

৯৩ সূরা আশ-শূরা আয়াত : ৪৯

৯৪ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত : ২৮৪

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَٰرَ

তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দারা জীবিকার জন্য ফল-মুল উৎপাদন করেন। নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।[৯৫]

আরও এরশাদ হচ্ছে-

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডডলী ও ভূমন্ডডলীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নির্দশন।"৯৬

অতএব আকাশমন্ডডলী ও ভূমন্ডডলের সমস্ত কল্যাণ লাভ করার ও ভোগ ব্যবহারে সমস্ত মানুষ অভিন্ন ও সমান অধিকার সম্পন্ন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব কিছুকে সকল মানুষের আয়ত্তাধীন হওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।[৯৭] এতে বিশেষ কোন ব্যক্তি বংশ বা শ্রেণি বা বর্ণের লোকদের সম্বোধন করা হয়নি। এগুলোর উপর কারো একক কর্তৃত্বের অধিকার দেয়া হয়নি। অতএব যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জনে চেষ্টা করবে সম্পদ তার অধীনে যাবে। সুতারং নিজেকে প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে।

৫.২.১৫. জীবিকা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ

সম্মানজনক ও আত্মতৃপ্তিমূলক জীবিকার জন্য স্বহস্তে উপার্জিত সম্পদের বিকল্প নেই। তাই ইসলাম জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে কর্মে উৎসাহিত করেছে। হযরত রাসূল (সা.) নিজে সব সময় কর্ম ব্যস্ত থাকতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে কর্মে উৎসাহ প্রদান করতেন। হযরত রাসূল (সা.) নিজে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি কাজ করার কারণে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। সে হাত দেখিয়ে তিনি বলতেন। আল্লাহ ও তাঁর হযরত রাসূল এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।

তিনি আরও এরশাদ করেন-

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

"স্বহস্তে উর্পাজিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই।"[৯৮]

রাসূল (সা.) আরও এরশাদ করেন-

ٱلْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءًا أَفْضَلُهَا طَلَبُ ٱلْحَلَالِ

"ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে তম্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল জীবিকা সন্ধান।"[৯৯]

---

৯৫ সূরা ইব্রাহীম, আয়াত : ৩২

৯৬ সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত : ১৩

97 Professor Raihan Sharif, *Islamic Economics : Principles and Applications,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985AD., P. 226

৯৮ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ [অনু. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী], *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., খ. ৪. হাদীস নং- ৪৪৫০, পৃ. ২৮১

৯৯ আহমাদ শালাবী, আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো: দারুল আরব, তা.বি., পৃ. ৫৩৫

রাসূল আরও এরশাদ করেন,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"সাহাবীগণ একদা হযরত রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম। হযরত রাসূল (সা.) বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতে কাজের বিনিময় বা সুষ্ট ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা।"[১০০]

শ্রম বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে হযরত রাসূল (সা.) এরশাদ করেন-

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসল আল্লাহ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তিহতে রক্ষা করবেন যাতে কিছু পাওয়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।[১০১] হযরত রাসূল (সা.) আরও এরশাদ করেন,

إذا صليتم الفجر فلا تنوموا عن طلب أرزقكم

"ফজরের নামাজ আদায় করার পর জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না।"[১০২]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ব্যবসা করতেন ও বকরি চরাতেন। বস্তুত শুধু মহানবী (সা.) নন হযরত আদম (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত নূহ (আ.) সহ সকল নবী রাসূলই কাজ করেছেন। হযরত রাসূল (সা.) অলস বসে না থেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মনির্ভলশীলতা অর্জনের বাস্তব দীক্ষা প্রদান করেছেন।

৫.২.১৬. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামে নারীর অধিকার বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত প্রাপ্য অধিকারকে বুঝায়। আর কর্মে অধিকার অর্থ কাজ করার প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারীর কর্মে অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর কাজের যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়।

অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহলে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে উন্নত দেশের নারী সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও সমান দায়িত্ব বহন করে। আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন,

---

১০০ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, তা.বি., খ. ১, হাদীস নং- ১৭২৬৫, পৃ. ৫০২

১০১ আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ, ২০০৩, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : যাচনা থেকে বিরত থাকা, খ.৩, পৃ. ৪৪, হাদীস নং- ১৩৮৫

১০২ আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতি, *জামেউস সাগীর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ১, হাদীস নং- ৭৩২, পৃ. ১১৩

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।"[১০৩]

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"[১০৪]

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। তাই নারীকে তার কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে হবে তাকে এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না যা তার সামর্থের বাহিরে। তাকে এমন কাজ দিতে হবে যা তার জন্য অত্যাধিক কষ্টের কারণ না হয়। আর জোর করে কোন কাজ কারো উপর চাপিয়ে দিলে সে কাজের ফল ভালো হয় না। আর সেটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে বলা হয় জুলুম বা অত্যাচার। একজন নারী যে কাজ করতে পছন্দ করে সে ধরনের কাজ করার সূযোগ করে দিলে সেও কর্মের মাধ্যমে উপার্জন করে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী করে তুলতে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৫.২.১৬.১. ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা

একটি সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী। তাদেরও অর্থনৈতিক চাহিদা রয়েছে কিন্তু সে বিষয়ে অনেকেই সচেতন নয়। তাই এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নারীর অর্থোপার্জন এবং খরচের বিষয়টিও আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। কারণ, তাদেরকে আত্মনির্ভশীল করতে না পারলে জাতির আত্মনির্ভরশীল হওয়া সহজ হবে না। ইসলাম পুরুষের মতো নারীর অর্জিত সম্পদের মালিকানা নারীকেই দিয়েছে। পুরুষের মতোই শরিয়া অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় নারীর অর্জিত ও উপার্জিত নিজের অর্থ সম্পদের বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যবহারের অধিকার তার নিজের জন্যে সংরক্ষিত। তবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে এবং পরিবার পরিচালনায় অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব পুরুষের। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ছাড়া নারীর অর্থ ব্যয় হয় না। নারীর আয়ের উৎস অধিক, ব্যয়ের বাধ্যতামূলক খাত একেবারেই সীমিত। তার ব্যয়ের খাত স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক। কোন নারীর সম্পদে পরিবারের কর্তা বা স্বামীর কোন অধিকার নাই। তবে নারী যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে বা খরচ করে সেটা তার ইচ্ছা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ

"পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও।"[১০৫]

নারীকে আত্মনির্ভরশীল করতে পারলে সেটা ঐ পরিবারের জন্যই মঙ্গলজনক। কারণ বিপদ আপদে সে সহয়োগিতা করতে পারে। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) তার বিশাল সম্পদ হযরত রাসূল (সা.) এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ইসলাম প্রচার প্রসারের জন্য হযরত রাসূল (সা.) এ সম্পদ ব্যয় করার সুয়োগ পেয়েছিলেন। এমনকি তিনি নিজে এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

---

[১০৩] সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ১৮৭

[১০৪] সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত : ২২৮

[১০৫] সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩২

৫.২.১৭. ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করা

ভিক্ষা একটি সামাজিক সমস্যা ও অপরাধ। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। ভিক্ষাবৃত্তি ইসলামে জায়েজ নেই। ভিক্ষামুক্ত শ্রমনির্ভর ও স্বনির্ভর জাতি গঠনে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, "তোমাদের কেউ দড়ি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে এবং লাকড়ি জমা করে পিঠে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করবে আর এমনিভাবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন তা তার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, করুণা ও লাঞ্ছনা পাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো।"[১০৬]

অন্য একটি হাদিসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্থ, সবল, শক্তিশালীদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করে ঘোষণা করেছেন,

> হে ক্বাবীস্বাহ! ভিক্ষা শুধুমাত্র তিন ব্যক্তির জন্যই জায়িয। তার মধ্যে একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্য কারোর পক্ষ থেকে জরিমানা বা দিয়াত জাতীয় কোন কিছুর যামানত কিংবা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে তখন তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয যতক্ষণ না সে তা সংগ্রহ করতে পারে। তবে তা সংগ্রহ হয়ে গেলে সে আর ভিক্ষা করবে না। অপরজন হচ্ছে, যাকে প্রাকৃতিক কোন বড় দুর্যোগ পেয়ে বসেছে যার দরুন তার সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে তখনও তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে। আরেকজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি অভাবের কষাঘাতে একেবারেই জর্জরিত এমনকি তার বংশের তিনজন বুদ্ধিমানও এ ব্যাপারে তাকে সার্টিফাই করেছে যে, সে সত্যিই অভাবগ্রস্ত তখনও তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে। তবে তা সংগ্রহ হয়ে গেলে সে আর ভিক্ষা করবে না। হে ক্বাবীস্বাহ! এ ছাড়া আর সকল ভিক্ষাবৃত্তি হারাম। ভিক্ষুক যা হারাম হিসেবেই ভক্ষণ করবে।[১০৭]

সামাজিক জীবনে আমরা দেখতে পাই যারা ভিক্ষা করে, তারা অসম্মানজনক, অবহেলিত ও তুচ্ছ জীবনযাপন করে। কোনো মুসলমান অপর কারো কাছে হাত প্রসারিত করলে তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিলীন হয়ে যাবে এবং স্বীয় মনুষ্যত্বের মান-মর্যাদা অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা চায়, সে নিজ হস্তে অঙ্গার একত্রিত করার মতো ভয়াবহ কাজ করে।"[১০৮]

ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন,

> مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ، أَوْ خُدُوْشٌ، أَوْ كُدُوْحٌ فِيْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ
>
> যে ব্যক্তি কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাইলো; অথচ তার নিকট যা আছে তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন স্বীয় চেহারায় অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ক্ষত সহ আগমন করবে। জনৈক সাহাবী বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! ধনী কে ? হযরত রাসূল (সা.) বললেন: পঞ্চাশ দিরহাম অথবা উহার সমপরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবেনা।[১০৯]

---

১০৬ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৯৪৪, পৃ. ১৭

১০৭ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ১৬৪০, পৃ. ৪২৩-৪২৪

১০৮ *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৬২৯, পৃ. ৪১৭-৪১৮

১০৯ *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৬২৬, পৃ. ৪১৫

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ (আ.) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতেন, সেখানে কেন আমরা অপরের গলগ্রহ বা অকর্মা, নিষ্কর্মা পরজীবী হয়ে জীবনযাপন করব? কোনো বিবেকবান মানুষ অকর্মা হয়ে বসে থাকতে পারে না। পরগাছা, পরজীবীরা সমাজে অসম্মানিত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত, অবহেলিত। সুস্থ, সবল শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোনো লোক পরজীবী বা পরগাছা হয়ে জীবনযাপন করতে পারে না। ইসলাম কর্মে বিশ্বাসী তাই নামাজ শেষেই কাজে বের হবার নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজে যারা ভিক্ষাবৃত্তি করছে তাদেরকে বাদ দিয়ে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব নয়। তাই তাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা নিরুপন করে উপযোগি কাজের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে কাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরীল হওয়ার সুযোগ পাবে।

৫.২.১৮. অভাবগ্রস্থদের কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদান

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায়, সওয়াবের নিয়তে বিনা শর্তে কাউকে কোনো কিছু ঋণ দিলে তাকে কর্য-ই-হাসানাহ্ বা উত্তম ঋণ বলে। কর্য-ই-হাসানাহ্ হচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সাংসারিক, পারিবারিক, স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক তথ্য বিভিন্ন স্তরে সামাজিক নিরাপত্তার সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি উপাদান। পরিবারে সদস্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, পরিবারে সদস্যদেরকে কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদান করা। যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে তাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে, এ ধরনের অভাবীদের কে এই প্রকারের ঋণ দান করা। অন্যদিকে পরিবারের সদস্য বৃন্দ ও পাড়া-প্রতিবেশী যদি তাদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারকে সামগ্রিকভাবে এই ধরনের সুবিধা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। যেভাবেই হোক কর্জে হাসানাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি যেন কর্য-ই-হাসানাহ্ না পাওয়ার কারণে কারো শিকারে পরিণত না হয়। কর্য-ই-হাসানাহ্ হচ্ছে এক প্রকার ঋণ যা গ্রহীতার নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

"কর্জে হাসানা হলো এমন এক ঋণ যা সুদমুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ফেরৎ দিতে হয় এবং এর মধ্যে কোন প্রকারের লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব থাকে না"।

বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম উমর চাপরার মতে কর্য-ই-হাসানাহ্ হলো,

> "Qard al-hasan is a loan which is returned at the end of the agreed period without any interest or share in the profit or loss of the business". Qard al-Hasan is "An interestfree loan given mainly for welfare purposes. The borrower is only required to pay back the amount borrowed."
> কারয আল-হাসান হল একটি ঋণ যা সম্মত মেয়াদ শেষে ফেরত দেওয়া হয় ব্যবসার লাভ বা ক্ষতিতে কোনো সুদ বা অংশীদারিত্ব ছাড়াই"। কারয আল-হাসান হল "একটি সুদমুক্ত ঋণ যা মূলত কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতাকে শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ধার করা পরিমাণ।[১১০]

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন কর্জে হাসানার পরিচয়ে বলেছেন, Al Qardh Al Hasan means someone cut the right of others with kindness.[১১১]

---

[১১০] A Glossary of Islamic Economic Terms, see Dr. Mohammad Omar Farooq, "*Qard al-Hasan Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking"*, paper was presented at Harvard Islamic Finance Forum, April 19-20, 2008

[১১১] Muhammad Nuruddin Urduniyah, "*al Qardh al Hasan Wa Ahkamuhu Fi al Fiqh al Islamy"*, 2010, Jamiah an Najah al Wathoniyah, Nablus, Palestine, p.12

ইসলামী শরীয়াহ কর্জে হাসানাকে অভাবমুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কারণ কর্য-ই-হাসানাহ্ গ্রহীতার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে উপার্জন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা সাধনা ও উদ্যোগ সৃষ্টি করে।

ইসলামী অর্থনীতিতে দারিদ্র্য বিমোচন করে আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে কর্য-ই-হাসানাহ্ একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কর্য-ই-হাসানাহ্ দেয়া সরাসরি আল্লাহকে ঋণ দেয়ার শামিল। একজন ব্যক্তি যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণ কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদান করতে পারে। এ জন্য ব্যক্তির ইচ্ছাই যথেষ্ট। কর্জে হাসানার মাধ্যমে অভাবী মানুষেরা তাদের কঠিন সময়কে মোকাবেলা করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হতে পারে। কল্যাণকর অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কর্জে হাসানার বিস্তার অত্যন্ত জরুরী। এর ফলে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সম্পদের আবর্তনকে সচল রাখা যায়। জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, দরিদ্র জনসমষ্টির জন্য নতুন নতুন চাকুরীর বাজার সৃষ্টি করা এবং তাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবসায়িক কাজে লাগানো, একটি দুশ্চিন্তামূলক সমাজ গঠন করা, সমাজ থেকে বেকারত্ব দূর করে আত্মনির্ভরশীল করা। এমনকি প্রয়োজনে অমুসলিমকেও কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদান করার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা যায়। সমাজ থেকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে উচ্ছেদ করা যায়। সর্বোপরি, কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদান করে আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করা যায়।

কিন্তু কর্য-ই-হাসানাহ্ লেনদেনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এর ব্যবহার থেকে মানুষ দুরে চলে গিয়ে সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জড়িযে পড়ছে। ইসলামে মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী যা কিছু করতে পারে না। তাকে কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত পথে তার যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তেমনি কর্য-ই-হাসানাহ্ এমন একটি চুক্তি যা নিম্নোক্ত নীতি সমূহকে অনুসরণ করে সমাপ্ত করতে হয়।

৫.২.১৮.১. ইসলামে কর্জে হাসানার গুরুত্ব ও ফজিলত

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে কর্য-ই-হাসানাহ্ ছিল অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। এ সময়ে বায়তুল মালের আয়ের উৎস সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কর্য বা ঋণ। আল্লাহ তা'আলা কর্জে হাসানার গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআনের অনেকগুলো সূরায় কর্য-ই-হাসানাহ্ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا

"আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে।"[১১২]

অন্য সূরায় বলেছেন,

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

"তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দেবেন, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ (কারো কাজের) অতি মর্যাদাদানকারী, সহনশীল।"[১১৩]

---

[১১২] সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০

[১১৩] সুরা তাগাবুন, আয়াত : ১৭

কর্জে হাসানার জন্য আল্লাহ তা'আলা পরকালে বহুগুনে পুরষ্কারের কতা ঘোষণা করেছেন,

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗ وَلَہٗۤ اَجْرٌ کَرِیْمٌ

"কে আছে, যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ, তাহলে তিনি বহুগুণে ইহাকে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য আছে সম্মানজনক পুরস্কার।"[১১৪]

কর্জে হাসানার পুরস্কার সম্পর্কে হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَیْنِ إِلاَّ کَانَ کَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দুবার করয দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়।"[১১৫]

কর্‌য গ্রহিতা থেকে ঋণ আদায় ও প্রদানে অক্ষম হলে কর্‌য দাতার করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاِنْ کَانَ ذُوْ عُسْرَۃٍ فَنَظِرَۃٌ اِلٰی مَیْسَرَۃٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَیْرٌ لَّکُمْ

"যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম"।[১১৬] কর্‌য গ্রহিতাকে প্রয়োজনে কর্‌য মাফ করে দেওয়া অতিশয় পূণ্যের কাজ এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

"এক ব্যক্তির লোকদের কর্জ দিত; যখন সে কোন গরীবকে দেখতো, তখন সে তার চাকরকে বলতোঃ তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। এরপর লোকটির মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[১১৭]

প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম (সা.)-এর মাদানী জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরেরও বেশি কর্‌য-ই-হাসানাহ্ ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ ইসলামী অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। মক্কা বিজয়ের পর জরুরী রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে হযরত রাসূল (সা.) কর্‌য গ্রহণ করেন। হাওয়াজিন যুদ্ধের পূর্বে হযরত রাসূল (সা.) আব্দুল্লাহ বিন রবিয়া থেকে ৩০ হাজার দিরহাম কর্‌য গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর মতে, ২০ হাজার দিরহাম কর্‌য গ্রহণ করা হয়েছিল। হুনাইনের যুদ্ধের সময় হযরত রাসূল (সা.) সাফওয়ান নামক এক অবিশ্বাসীর নিকট থেকে ৫০টি বর্ম ধার করেছিলেন। কর্‌য মুসলিম ও অমুসলিম উভয় উৎস হতে করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সুত্রে জানা যায়। হযরত উমর ফারুক (রা.) এর সময়েই বায়তুল মাল হতে কর্‌য-ই-হাসানাহ্ দেবার রীতি ব্যাপকভাবে চালু হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্যেও বায়তুল মাল হতে কর্‌য-ই-হাসানাহ্ নেবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব হতো না। জনসাধারণ ছাড়াও সরকারী

---

[১১৪] সূরা আল হাদিদ, আয়াত : **১১**

[১১৫] *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ২৪৩০, পৃ. ৩৯২-৩৯৩

[১১৬] সূরা বাক্বারাহ, আয়াত : ২৮০

[১১৭] *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৪৬৯৫, পৃ. ৩৬২

কর্মচারীরাও নিজেদের চাকুরীর জামানতে বায়তুল মাল হতে ঋণ নিতে পারত। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে কর্য-ই-হাসানাহ্ ছিল মামুলি ব্যাপার। দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যে মন-মানসিকতার দিক থেকে সম্পদশালী ব্যক্তিগণ সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অভাবীকে ঋণ দেওয়ার প্রতি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি সময় মতো ঋণ পরিশোধের প্রতিও জোর দিয়েছেন। এমনকি তিনি নিজেও সর্বদা ঋণমুক্ত জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। মানুষের কাছ থেকে উত্তম ঋণ তথা করজে হাসানা নেওয়ার পর তা পরিশোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা যেমন জরুরি। তেমিন তা পরিশোধে মহান আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়ার বিকল্প নেই। কারণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ধার-দেনা পরিশোধের তাওফিক কামনা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ধরনা দেওয়ার কথা বলেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো পেরেশানি অনুভব করতেন, তখনই এ দোয়া পড়তেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ " . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي .

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি, তোমার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামনা করছি এবং আমি তোমার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি"। আবু উমামা (রা.) বলেছেন, অতঃপর আমি ঐরূপ আমল করি, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা আমার চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।"[১১৮]

তাই ঋণ গ্রহন করলে তা ওয়াদাকৃত সময়েই পরিশোধ করা জরুরি। তাহলে এ ব্যাবস্থার প্রতি মানুষের যেমন আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে তেমনি মানুষ এ কাজে উৎসাহিত হবে। ফলে সমাজের অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি এর উপকার ভোগ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ সুগম হবে।

৫.২.১৯. শিল্প, কলকারখানা ও কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে উদ্যোগ গ্রহণ

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি। যেখানে খুব কম মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়। তাই শিল্প, কলকারখানা স্থাপন করে এ দেশে খুব সহজে তা পরিচালনা করা সম্ভব। তাই এ দেশীয় উদ্যোক্তা ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা যদি আরো বেশি পরিমানে শিল্প, কলকারখানা ও কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে এগিয়ে আসেন আর সরকার যদি তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন তাহলে কোন মানুষ কর্মহীন ও বেকার থাকবে না। সবাই কর্মের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ পাবে। এ ছাড়া বিদেশী উদ্যোক্তাদের সুযোগ করে দিলে তারাও এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। বেকার যুবক-যুবতীরা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার থেকে বিভন্ন কাজের ট্রেনিং গ্রহন করে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি খুজে নিতে পারেন। কয়েকজন মিলে মূলধন সংগ্রহ করে নিজেরাও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। মূলধনের সমস্যা হলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন গ্রহন করে প্রতিষ্ঠান দাড় করাতে পারেন।

৫.২.২০. কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা

আত্মনির্ভর প্রয়োজন ব্যক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভর পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। যেহেতু দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত এবং ইচ্ছা করলেই সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে এত অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব না তাই একমাত্র বিকল্প হচ্ছে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা কিন্তু এদেশের যুবসমাজের নিকট আত্মনির্ভরের ধারণা স্বচ্ছ ও যথেষ্ঠ নয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের সামাজিক

---

[১১৮] *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ১৪৫৫, পৃ. ৩৬০-৩৬১

মূল্যবোধ ও পুথিঁগত পড়াশুনার কারণে যুবসমাজ জীবিকা বলতে চাকরিকে বুঝে। তাই বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এর সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে-

১. বর্তমানের যুব ও তরুন সমাজের আগামী প্রজন্মকে আত্মনির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

২. শিক্ষার্থীদের বুঝাতে হবে যে কোনো কাজই ছোট বা অপমানের নয়।

৩. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যারা স্বাবলম্বী হয়েছে তাদের সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ে তথ্য উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। সম্ভব হলে তাদেরকে বিদ্যালয়ে এনে শিক্ষার্থীদের তাদের জীবনকাহিনী শোনাতে হবে যাতে তারা উৎসাহ খুজে পায়।

৪. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করা, প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় মূলধন ও উপকরণের সহজলভ্য করতে হবে।

৫. বেকারদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও বিনা সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

৭. আত্মকর্মসংস্থানকে সামনে রেখে যুব উন্নয়ন ব্যাংক ও শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সুদবিহীন ঋনদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.২.২১. ভালো কাজে সহযোগিতা ও পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা

ভালো কাজে সহযোগিতা করা, উৎসাহ দেওয়া, পুরস্কৃত করা, কিংবা ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করা ইসলামের নির্দেশ। ভালো কাজ করা আর ভালো কাজের একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা একই কথা। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার এমন নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা কল্যাণমূলক ও খোদাভীরুতার কাজে পরস্পর সহযোগী হও, মন্দ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না।"[১১৯]

আল্লাহ মানুষের কল্যাণে ভালো কাজের বিনিময় দেন অনেক গুণ। আর মন্দ কাজের বিনিময় তা-ই দেন; যা সে করে থাকে। মন্দ কাজের বিনিময়ে কোনো বেশি-কম করেন না। আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকর ও ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।[১২০] আমাদের সমাজে অনেক সময় অনেকে অনেক ভালো কাজ করে থাকে। কিন্তু সে মানসিক সাপোর্ট পায়না, সহযোগিতা পায়না ফলে সে কাজের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে যা মুমিন ব্যক্তির জন্য কখনো শোভনীয় নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

১১৯ সুরা আল মায়েদা আয়াত : ২

১২০ সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৮

"কেহ কোন ভাল কাজ করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে, আর কেহ পাপ ও অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবেনা।"[১২১]

এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

> তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়-ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্বেও আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প।[১২২]

সৎ কাজ, ভালো কাজ করার পুরস্কার সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ

"আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব ১০ গুণ হতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়ে থাকে।"[১২৩]

অনেক অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা নিজের কাজে অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও আন্তরিকভাবে কাজ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কিন্তু সে তার এই অবদানের স্বীকৃতি পায় না। অনেক সময় উল্টো আরো সমালোচনা, দুর্নাম সহ্য করতে হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

> হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক।[১২৪]

এই ধরনের গীবৎ, দুর্নাম, কাজের অনুপ্রেরণা ও গতিকে বাধা প্রস্থ করে। যার ফলে অনেকে উৎসাহ হারিয়ে বেকার বসে থাকেন। কিংবা আন্তরিকতা বাদ দিয়ে কোন মতে দায়সারা কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। যার প্রভাব আমাদের জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি ও আত্মনির্ভরশীলতার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। যদি এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রশংসা করা, পুরস্কৃত করা, প্রতিযোগিতা তৈরি করা যেত তাহলে আরো অনেক জ্ঞাণীগুণী, বিজ্ঞানী, উদ্যমী, কর্মঠ জনশক্তি আমাদের তৈরি হত। যা আমাদেরকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ তরান্বিত করত।

---

১২১ সূরা আল আনআম, আয়াত : ১৬০

১২২ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৬০৪৭, পৃ. ৬৮

১২৩ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ২৫৭৮, পৃ. ৭৪-৭৫

১২৪ সুরা আল হুজরাত, আয়াত : ১২

৫.২.২১.১. বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করা

গাছবিহীন এক মুহূর্তও আমরা কল্পনা করতে পারি না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শাস্ত্র-পুরাণ, নীতিকথা, বাণিজ্য, দর্শন, শিল্প-সংস্কৃতি, আশ্রয়-প্রশান্তি এবং যাপিত জীবনের সব কিছুই গাছকে ঘিরে ও গাছকে নিয়ে। গাছ নিহত হলে গাছ শুধু একাই মরে না। মানুষসহ সব প্রাণসত্তার জন্যই তা ঝুঁকি ও উতকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ বছরে যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে তা কমপক্ষে ১০ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বার্ষিক অক্সিজেনের চাহিদা মেটায়। ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি এম দাস ১৯৭৯ সালে পূর্ণবয়স্ক একটি বৃক্ষের অবদান আর্থিক মূল্যে বিবেচনা করে দেখান যে ৫০ বছর বয়সী একটি বৃক্ষের অর্থনৈতিক মূল্য প্রায় এক লাখ ৮৮ হাজার মার্কিন ডলার। টি এম দাসের হিসাবে, ৫০ বছর বয়সী একটি বৃক্ষ বছরে প্রায় ২১ লাখ টাকার অক্সিজেন সরবরাহ করে। বছরে প্রাণিসম্পদের জন্য প্রোটিন জোগায় এক লাখ ৪০ হাজার টাকার।[১২৫]

ইসলামে হালাল জীবিকা উপার্জন ও জনকল্যাণমূলক বিষয় হিসেবে কৃষিকাজ তথা ফলবান বৃক্ষরোপণ ও শস্যবীজ বপনের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতির যতগুলো নিয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে বৃক্ষরাজি। সৃষ্টিকুলের জীবন-জীবিকা ও বৃহৎ কল্যাণের জন্য গাছপালা, বৃক্ষলতা এবং মৌসুমি ফল-ফসলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৃক্ষরাজি যে কত বড় নিয়ামত পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াত থেকে তার প্রমাণ প্রতীয়মান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরা আহার গ্রহণ করে।"[১২৬]

মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, পুষ্টিকর ফলমূল, খাদ্যদ্রব্যের উপকারিতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে ইসলামে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবদেহের জন্য খাদ্য হিসেবে বৃক্ষের ফলমূল বিশেষ উপকারী, তাই আল্লাহ এটিকে সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, "তিনি তোমাদের জন্য বৃষ্টির দ্বারা উৎপাদন করেন ফসল, যায়তূন, খেজুর, আঙুর এবং সর্বপ্রকার ফলমূল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"[১২৭] বর্তমান বিশ্বে বন-বৃক্ষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কারণ উৎপাদনের চেয়ে প্রয়োজনের পরিমান অনেক বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে তার প্রয়োজনও বাড়বে, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং উৎপাদন না বাড়ালে অদুর ভবিষ্যতে যে মানব গোষ্ঠীকে এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) পূর্বেই সচেতন ছিলেন। বিশ্ব আজ বৃক্ষ রোপন অভিযানে জোরদার হয়ে উঠছে। মূলত এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রায় সাড়ে পনের'শ বছর আগে। এর প্রয়োজনীয়তা তিনি তখনই উপলব্দি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "যখন কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপন বা বীজ বপন করে এবং মানুষ ও পশু তা হতে আহার গ্রহন করে তবে তা তার জন্য সাদাকা।"[১২৮] এতে বোঝা যায় মানূষ ও পশুর কণ্যাণ হতে পারে এমন সদুদেশ্যে যদি কেউ বৃক্ষ রোপন করে, তবে তা পূণ্য কাজ বলে গণ্য হবে।[১২৯] এ পৃথিবীতে ৭২% অংশ জুড়ে আছে পানি এবং ২৮% স্থলভূমি। একমাত্র শুষ্ক মরুভূমি, তুষারাচ্ছাদিত মেরু বা পাহাড়ী অঞ্চল বাদ দিলে এ স্থলভূমির প্রায় সব জায়গাতে চোখে পড়ে কোন না কোন

---

১২৫ ইন্ডিয়ান বায়োলজিস্ট, ভলিয়ম-১১, সংখ্যা-১-২

১২৬ সূরা আস সাজদাহ, আয়াত : ২৭

১২৭ সূরা আন নাহল, আয়াত : ১১

১২৮ *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৮২৯, পৃ. ৬৪

১২৯ এ, কে, এম, ইয়াকুব হোসাইন, "বৃক্ষরোপণ ও ইসলাম", নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *পরিবেশ সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সা.)*, *ঢাকা :* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭

সবুজ গাছপালার আচ্ছাদন।[১৩০] এ সবুজ গাছপালার উপরই নির্ভর করে আছে মানুষ সহ সকল প্রাণী জগৎ। কারণ একমাত্র এ সবুজ গাছ-পালাই সালোক-সংশ্লেষণের সময় তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহন করে ও অক্সিজেন বের করে দেয় যার ফলে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায়। গাছের বেঁচে থাকার জন্য নাইট্রোজেনেরও প্রয়োজন। তবে পাছপালা সরাসরি তা বাতাস থেকে নিতে পারে না। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ও নীলাভ সবুজ শৈবাল মাটিতে ও পানিতে নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করতে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে অন্য গাছপালা তা গ্রহন করতে পারে।

বন সংরক্ষণ এবং গাছ আজ একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিনত হয়েছে। বন ও গাছপালার উপকারিতা অপরিসীম। বন জঙ্গল থেকে আমরা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করি। এর লতাপাতা ও ফলমূল আমাদের এবং পশুপাখির আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছপালা প্রকৃতির শোভাবর্ধক এবং মানুষের প্রতি মহান স্রষ্টার এক বিরাট অবদান।[১৩১]

আল্লাহ তা'আলা আপন সৃষ্টি বৈচিত্রের নিদর্শন স্বরূপ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় গাছপালার উল্লেখ করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেছেন, "তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত কর।"[১৩২] মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেছেন, "যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে চলার পথ করে দিয়েছেন, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্য।"[১৩৩]

পবিত্র কুরআনে অন্য জায়গায় আছে, মানুষ তার খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি। তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; আঙ্গুর, শাক-সবজি, জায়তুন, খেজুর এবং বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, এটা তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশু ভোগের জন্য।[১৩৪] এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে বৃক্ষরোপণের বৃহৎ উপকার ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। যা মানবজাতির জীবন ধারণের জন্য ও কাজের ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বনের গাছপালা থেকে শুধু কাঠ, রাবার, ঔষধ কিংবা ফলমুলই সংগ্রহ করা হয় না, এগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য এবং তেলও পাওয়া যায়। বৃক্ষের পরিশুদ্ধ তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরের উপমা দিয়েছেন। মানুষ চেষ্টা গবেষণা করলে বনের বৃক্ষ থেকেও যে উৎকৃষ্ট ধরনের তেল আহরণ করতে পারে এ উপমা নিঃসন্দেহে সে তথ্য সে তত্ত্বেরও ইঙ্গিত বহন করছে।[১৩৫] এ সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত আছে, "সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, তাতে উৎপন্ন হয় তেল এবং আহারকারীদের জন্য যায়তুন।"[১৩৬]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

> আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল

---

১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৩২ সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৬

১৩৩ সূরা ত্বহা, আয়াত : ৫৩-৫৪

১৩৪ সূরা আবাসা, আয়াত : ২৪-৩২

১৩৫ নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

১৩৬ সূরা আল মুমিনুন, আয়াত : ২০

নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্বলিত করা হয় পুত-পবিত্র জাইতুন বৃক্ষের দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তার জ্যোতি দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[১৩৭]

বন এবং বন্য পশু পাখি প্রকৃতির শোভাবর্ধক তাই হযরত রাসূলুললাহ (সা.) এগুলোর সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মক্কা এবং মদিনার এক একটি বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এসব এলাকার গাছপালা কাটা এবং সেখানে বন্য পশু পাখির শিকার করা আজও নিষিদ্ধ।[১৩৮]

উদ্ভিদ সংরক্ষণ সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "যিনি পৃথিবী কে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"[১৩৯]

আল্লাহর জমিনের মধ্যে যে বরকত নিহিত রেখেছেন তা কখনো শেষ হবার নয়। আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিনের ব্যবহার করলে এর অফুরন্ত নিয়ামত থেকে চিরকালই উপকৃত হতে পারব।

আজকাল নির্বীচারে বৃক্ষ নিধন চলছে। ফলে উদ্ভিদ বিরল প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছে। পরিবেশেও এর বিরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বময় বাড়ছে উষ্ণতা এ অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে শ্যামল প্রকৃতি মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, গাছপালার উপকারিতা এবং সেগুলোর নিধনের অপকারিতা সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করা এবং সুন্দর একটি পৃথিবী গড়ার জন্য নিজ বাড়ি, রাস্তার পাশে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পতিত জায়গায় বেশি বেশি গাছ লাগানো। ঔষধি গাছ, ফলের গাছ, জ্বালানি কাঠের গাছ, আসবাবপত্র তৈরির গাছ লাগালে ফল উৎপাদন, জ্বালানির যোগান ও আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ উম্মুক্ত হবে। জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বাড়বে এবং আত্মনির্ভরশীলতার পথ সুগম হবে।

৫.২.২১.২. পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ

বর্তমান বিশ্বে প্রধান প্রধান যেসব সমস্যায় আক্রান্ত তম্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল 'পরিবেশ দূষণ' সমস্যা। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিশ্ব যত উন্নত হচ্ছে ঠিক তার বিপরীতে এর বিরূপ প্রভাবে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে বিরাজমান নানা উপাদানে গড়ে উঠা সকল কিছুই ঐ এলাকার পরিবেশ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তেমনি রয়েছে নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। চারপাশের অবস্থা, প্রতিবেশ পরিবেষ্টন, পরিমন্ডলসহ আকাশ, বাতাস, আলো, মাটি, পানি, গাছপালা সম্প্রসারিত দিগন্ত সবই আমাদের পরিবেশ।[১৪০]

ড. মুহাম্মদ সালেহ আল-আদেলী বলেছেন, মানব মন্ডলীকে বেষ্টন করে আল্লাহ তা'আলার যে সমগ্র সৃষ্টি জগত তাকেই পরিবেশ বলে।[১৪১]

---

১৩৭ সূরা আন নূর, আয়াত : ৩৫

১৩৮ নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

১৩৯ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত-২২

১৪০ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩৭

১৪১ ড. মুহাম্মদ সালেহ আল আদেলী, *আল ইসলাম ওয়াল বিয়া*, রিয়াদ : আধুনিক ফিকহী পবেষণা পত্রিকা, অক্টো-নভে: ১৯৯৪, পৃ. ৭

এই সুবিশাল মহাবিশ্বে পৃথিবী নামক ছোট্ট গ্রহে জীবের বেঁচে থাকার জন্য সব উপাদান দিয়ে আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাদের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ফলে জীবের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ হারাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ অধিকতর গলে যাওয়ার ফলে বিশ্বের কিছু কিছু নিম্নভূমি বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মানুষ তার নানামুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেই চলছে।

খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য অসংখ্য দ্রব্য সামগ্রীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। পুরনো জিনিস ফেলে নতুনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। তাতে অপচয়ের পরিমান বাড়ার সাথে সাথে ব্যবহৃত তরল ও কঠিন বর্জের পরিমাণও বাড়ছে। নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত দ্রব্যও জ্বালানীর ব্যবহার বেড়েই চলছে। এর সাথে ইচ্ছামাফিক অযাচিতভাবে পাহাড় কাটা থেকে শুরু করে প্রকৃতির সকল কিছুতেই মানুষ হস্তক্ষেপ করছে। সব মিলিয়ে পরিবেশকে ক্রমাগত দূষণ করে চলেছে এসব কর্মকান্ড। সাধারণত পরিবেশ দূষণের প্রধান চারটি ধরন রয়েছে-

ক) বায়ু দূষণ
খ) পানি দূষণ
গ) শব্দ দূষণ
ঘ) কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণ

বায়ু দূষণ : কোন পরিবেশের বায়ু যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তখন ঐ পরিবেশের বায়ু দূষিত হয়েছে বলা যায়।[১৪২] বায়ুতে মিথেন, ক্লোরোপুরো, কার্বন, ওজোন, সালফার ডক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, সিসা ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত বায়ু দূষিত হয়।[১৪৩]

পানি দূষণ : পানিতে যখন অক্সিজেনের পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেই পানি বর্জ্য পরিশোধনের ব্যর্থ হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় Biochemical Oxygen Demand (BOD). অর্থাৎ পানিতে BOD-এর মাত্রা বেড়ে গেলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে তা জলজ উদ্ভিদ ও মাছ সহ অন্যান্য প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই পানি কৃষি কাজসহ মানুষের অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হয়ে পড়ে অনুপোযোগী।[১৪৪]

শব্দ দূষণ : গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দ হলো শব্দ দূষণ। শব্দের উৎস থেকে আধা মিটার দূরে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ১০০ ডেসিবেল। এইমাত্রা থেকে বেশি মাত্রার শব্দ মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণ : বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণের পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য ও নানা ভাবে পরিবেশ দূষণ করে থাকে। ইসলাম মানুষকে সীমিত পর্যায়ে পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই মানুষ ইচ্ছা করলেই সব কিছু করতে পারবে না। কারণ ইসলামে কেবল মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়নি বরং মানুষের সাথে জীবজন্তু, পশুপাখি সহ সকল সৃষ্টিকুলের কথাও বলা হয়েছে। তাই আমাদের দায়িত্ব হল পরিবেশ সম্পর্কে ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মাঝে তুলে ধরা। পরিবেশ সংকট সম্পর্কে ইসলামী

---

[১৪২] Raymond E Glos, Richard D. Stead and James R Lowry, op. cit, P. 29

[১৪৩] U.S Environmental Protection Agency National Emission Report, U.S.A May-1976, P.1

[১৪৪] মলয় কুমার ভৌমিক, "*বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ, ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব*" আই.বি.এস জার্নাল ১৪০৪ : ৫, পৃ. ২৮

দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার-প্রসার করা, পরিবেশ দূষণ থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের আলোকে সকলকে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। মানুষ ও পরিবেশ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "মানুষের কৃতকর্মের জন্য সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।"[১৪৫]

ইসলামে প্রসঙ্গক্রমে গাছপালা, প্রাণিজগৎ, পাহাড়-নদী সর্বোপরি প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা উঠে এসেছে বারবার। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব আর অসচেতনতার কারণে প্রকৃতি সংরক্ষণের চেয়ে আমরা প্রকৃতির ক্ষতি করছি বেশি। সেই সঙ্গে অনিশ্চিত করে তুলছি আমাদের ভবিষ্যৎ। দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা ও এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ। গড়ে তোলা সম্ভব সুন্দর পরিবেশে সুস্থ জীবন।

প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণে সুষ্ঠু নিয়ম মেনে চলা, মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া, বন-বনানী থেকে বৃক্ষ উজাড় না করা, পরিকল্পনা ছাড়া ঢালাওভাবে পাহাড় না কাটা, পশু-পাখি নির্বীচারে শিকার না করা, কল-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনে যথাযথ নিয়ম মেনে চলা, ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়ার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জনসাধারণকে আরও অধিক সচেতন হওয়া অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পরিবেশ দূষণ না করে যদি পরিবেশ সংরক্ষন করে চলতে পারি তাহলে পৃথিবীতে মানুষ, পশুপাখি, জীবজন্তুর বেঁচে থাকা সহজ হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ সুগম হবে।

৫.২.২১.৩. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী গ্রহণ

ইসলাম মানুষের জীবনের সব সমস্যার সঠিক সমাধান ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে এসেছে। ইসলাম ছাড়া এ কল্যাণের দাবি ও তার সত্যতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। সামগ্রিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম একটি বিভাগ হলো অর্থনীতি। জীবনের সব অঙ্গনে ইসলাম পরিপালন করা আবশ্যক। সে হিসেবে অর্থনীতিকেও ইসলাম থেকে বাইরে এসে চর্চা করার সুযোগ নেই। পরকালীন সওয়াবের আশা ও মানবতাপ্রীতি থেকে ঋণদাতা অন্যকে সহযোগিতা করে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের এটি একটি অন্যতম উন্নত মাধ্যম। ঋণ সম্পূর্ণ একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি। সর্বপ্রকার বিনিময়হীন মানসিকতা থেকে মুক্ত থেকে ঋণ প্রদান করাই ইসলামের নির্দেশনা। এভাবে বিনিময়হীন ঋণ প্রদান যখন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যকে সহযোগিতার নিয়তে হয়ে থাকে, তখন সেটি হয়ে ওঠে উত্তম ঋণ যা ইসলামী অর্থনীতিতে 'কর্জে হাসানা' নামে পরিচিত। আর ক্ষুদ্র ঋণ বলতে বুঝায় ঐ ঋণ বা আর্থিক সেবা যা দারিদ্রকে বিশেষ শর্তাধীনে সহায়ক জামানত ছাড়াই প্রদান করা হয়। কেননা এসব দারিদ্র মানুষ ব্যাংকে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বীমা, ক্ষুদ্র ঋণের আর্থিক সেবার আওতায় পড়ে।[১৪৬] ক্ষুদ্র ঋণ তারাই পেতে পারেন যাঁদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। ক্ষুদ্র ঋণ জামানতবিহিন প্রদান করা যেতে পারে। এ শর্তে যে, এক বছরের মধ্যে সপ্তাহ ভিত্তিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করবে। এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ইহকালীন ও পরকালীন অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে সুদনির্ভর এনজিওর বিপরীতে যথাযথ আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তা না হলে তাদের এই অশুভ প্রচেষ্টা রুখে দেয়া সম্ভব নয়। অর্থ ছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সংক্ষিপ্ত ও ভিন্ন কোনো পথ নেই। তাই প্রান্তিক জনগণের দারিদ্র থেকে উত্তরণের একটাই পথ; আর তা হলো– টেকসই পদক্ষেপ ও সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের দারিদ্রবিমোচনের পথ তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা,

---

[১৪৫] সুরা রুম, আয়াত : ৪১

[১৪৬] ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণ তত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০, পৃ. ৭

দরিদ্রভাতা প্রদান, এককালীন আর্থিক অনুদান, সুদমুক্ত প্রণোদনা, যথাযথ যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি কর্য-ই-হাসানাহ্ বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এতে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়ে সমাজে আত্মনির্ভরশীলতার পথ সুগম করতে পারে।

৫.২.২১.৪. সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম চালু

ইসলামের দৈনন্দিন পালনীয় বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইসলামের প্রতিটি বিধান সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। দৈনিক পাঁচবার জামায়াতে নামায, শুক্রবারে জুমুআর জামায়াত, ঈদের জামায়াত, হজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব জামাআত মুসলিমদের একতাবদ্ধ হওয়ার চিরন্তন আহবান। তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবায়ের মাধ্যমে একে-অপরকে সহযোগিতা করে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা অবশ্যই ইসলাম সমর্থিত একটি চমৎকার উদ্যোগ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১৪৭]

ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও কল্যাণের পক্ষে তাই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রম নিঃসন্দেহে ইসলাম সমর্থিত ভালো কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে-অন্যকে সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"[১৪৮] বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই 'হিলফুল ফুজুল' নামক সমবায় গঠনের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে তৎকালীন ভয়াবহ ফুজ্জার যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিণতির প্রেক্ষাপটে নিজ চাচা যুবাইর সহ উক্ত সমবায় গঠন করেছিলেন। যদিও নবী করীম (সা.) নবুয়ত পূর্ব জীবনে উক্ত সমবায় গঠন করেছিলেন। তথাপি উক্ত সমবায় বর্তমানের যে কোন সমবায়ের জন্য মডেল হতে পারে। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমবায় গড়ে উঠলে তা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা বা মুনাফা অর্জন নয় বরং ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই সমবায় সমিতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সমবায় সমিতির বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য অর্জন, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, মোটা অংকের মূলধন সৃষ্টি, নৈতিক শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক উন্নয়ন, মধ্যস্থতাকারীদের উৎখাত, সেবার মানসিকতা, সামাজিক বন্ধন, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, সঞ্চয়ী করে তোলা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, আইনগত সত্তা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমবায়ের উদ্দেশ্য হবে বৃহত্তর মানব কল্যাণ, সংকীর্ণ দলীয় বা জাতীয় স্বার্থ নয়। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করে কল্যাণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ' এই ফর্মুলায় সমবায় ভিত্তিক যৌথ কারবার কার্যক্রম গ্রহণ করে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা যায়। আর এক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য, বিশ্বস্ত, আমানতদার কোন একজনের নেতৃত্বে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজের শ্রদ্ধাভাজন আলেম ওলামা, মসজিদের ইমাম, খতিব সাহেবগন ভূমিকা রাখতে পারেন, কেননা তারা সমাজে সবার কাছে বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক স্বল্পপুঁজির লোকজন একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। এর মাধ্যমে কাজ করে কর্মক্ষেত্র তৈরির পাশাপাশি মুনাফাও অর্জন করা যায় যা আত্মনির্ভরশীলতার পথ সুগম করে।

---

[১৪৭] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩

[১৪৮] সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ২

৫.২.২১.৫. খামার ও ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা

আমাদের দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে স্থানীয় লোকদের সাথে সমন্বয় করে খামার ও ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সমাজে অনেক লোক আছে যাদের অর্থ অলস বসে আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে এটা শুরু করা যায়। কাউকে না পেলে তিনি একক প্রচেষ্টায় ছোট্ট করে হলেও শুরু করতে পারেন। এতে করে নিজে যেমনিভাবে উপকৃত হবেন, আত্মনির্ভরশীল হবেন, সেই সাথে সমাজের অন্য লোকদের জন্য আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবেন। পর্যায়ক্রমে বড় হলে অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানও হতে পারে।

৫.২.২১.৬. কারিগরি প্রশিক্ষণ চালু

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে যুগোপযোগী নয়। অনেককেই দেখা যায় বি.এ সম্মান বা এম.এ সমাপ্ত করেও বেকার বসে আছে। একদিকে তারা কোনো চাকুরি ও পাচ্ছে না। অপরদিকে কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে না। কারণ তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সম্মানিত ইমামগণ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ লাভ করে স্থানীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছেলেদেরকে নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে প্রশিক্ষণ হতে হবে অবশ্যই কর্মসংস্থান ভিত্তিক। যাতে তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দ্বারা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। প্রয়োজনে ইমাম সাহেব স্থানীয় লোকদের মধ্যে যারা সময়োপযোগী বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী তাদেরকে নিয়ে কাজে আহ্বান করতে পারেন। এতে বেকার যুবকদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।[১৪৯] যদিও আমাদের দেশে আগের তুলনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসার হচ্ছে কিন্তু তাও সদ নির্ভরতায় পরিণত হচ্ছে, অন্যান্য শিক্ষার মত। দরকার শিক্ষার্জন শেষে আত্মকর্মসংস্থান বা কোন কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হবে, এখানে সনদ মূখ্য উদ্দেশ্য হবে না।

৫.২.২১.৭. মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ

মাছ চাষ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ বাজারে এর চাহিদার প্রেক্ষিতে খুবই লাভজনক। কিভাবে সফল চাষ করা যায় তা না জানার কারণে এই খাত থেকে অনেকেই আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। তবে বর্তমানে সরকার যে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এর মাধ্যমে সব ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায়। উন্নত পোনা, খাদ্য ও রোগ-বালাইয়ের ঔষধ সর্বোপরি এর জন্য ঋণ ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা বর্তমান অপ্রতুল। বর্তমানে মৎস্য চাষে সরকার যেহেতু আগ্রহী এবং সরকারি সহায়তাও পাওয়া যায় তাই একজন শিক্ষিত বেকার, কর্মহীন যুবক ও ইমাম সাহেবগণ তার আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য চাষ কে বেছে নিতে পারেন। নিজের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে সমাজেরও চাহিদা মেটাতে পারেন। এটি ব্যবসার সাথে সাথে একটি সেবামূলক সামাজিক কার্যক্রমও বটে। মানুষের শরীরে শক্তি বর্ধন, পুষ্টি সাধন, আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ, শরীরে ক্ষয় রোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মেধা শক্তি বৃদ্ধি সহ সঠিক স্বাস্থ্য রক্ষায় মৎস্য অপরিহার্য। তাছাড়া মানুষের জীবিকা নির্বাহে আত্মনির্ভরশীলতা জন্য এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "দরিয়া দুইটি একরূপ নয় : একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশ্ত আহার কর এবং আহরণ কর অলংকার যা তোমরা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখ এর বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১৫০]

---

[১৪৯] মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ, কাজী আবু হোরায়রা, *ইমামদের ক্ষমতায়ন*, প্রকাশক : ডা. আলমগীর মতি, ২০০৮, পৃ. ১০৭

[১৫০] সূরা ফাতির, আয়াত : ১২

৫.২.২২. আধুনিক চাষাবাদের প্রচলন

কৃষি ও গ্রামের উন্নয়ন সাধনের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। কৃষি এখনো বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বৃহৎ অংশ এবং আগামী শতাব্দীর বেশি সময় জুড়ে তাই থাকবে। জিডিপিতে কৃষির অংশ ১২.২৯% তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।[১৫১] তবে শিল্পখাতেও আরো কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে কৃষি খাতের প্রাধান্য হ্রাস পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক (৮৭%) গ্রাম এলাকায় বাস করে এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তাই কৃষি খাতের উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের জন্য কোন প্রবৃদ্ধি বা দারিদ্র বিমোচন করে আত্মনির্ভরশীল করার কৌশল সফল হবে না। একটি গতিশীল কৃষি খাতের জন্য একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রয়োজন প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তা অর্জনের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করা।[১৫২] এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণকে দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে জুমার আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সরকারি নীতি সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে উন্নয়নে যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীলতার পথ প্রশস্ত করতে পারেন। সরকারি কৃষি কর্মকর্তাগণও এই জনসচেতনতা মূলক। কাজে অংশ নিয়ে দেশের বেকার শ্রেণির মানুষদের কর্মের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটি করা হলে তা অবশ্যই অত্যন্ত একটি কার্যকর পদক্ষেপ হবে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ ২০১১-১২ অর্থ বছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১৯.২৯ শতাংশ।[১৫৩] অথচ কৃষকদের অধিকাংশ নিরক্ষর বা আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে কৃষকরা হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও কাঙ্খিত মানের ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ। প্রতিবছর দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির উন্নতির বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে সরকার মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে মৌসুম অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে চাষাবাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন।

মহান আল্লাহ চাষাবাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত বর্ষণ করি। তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, পাতা, ঘন উদ্যান।[১৫৪]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।[১৫৫] এ সমস্ত কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতির মাধ্যমে ইমামগণ মুসল্লিদের চাষাবাদের মাধ্যমে আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। যার দ্বারা তারা আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হবেন।

৫.২.২২.১. দেশের চাষযোগ্য সকল জমি চাষের আওতায় আনা

দেশের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ও খাদ্যাভাব দুর করার জন্য দেশের সমস্ত ভূমিকে চাষের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া সরকার ও জনগনের দায়িত্ব। ইসলাম এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

---

১৫১ *বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, জুন, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৭৭

১৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

১৫৩ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৭৭

১৫৪ সূরা আন-নাবা, আয়াত : ১৪-১৫

১৫৫ সূরা আন নাহল, আয়াত : ১০

সকল উর্বর জমিতে ফসল চাষাবাদ করতে হবে

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল উর্বর জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা চাই। জমির মালিক যেই হোক তা যেন অনাবাদি না থাকে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। হযরত রাসূলে কারীম (সা.) এরশাদ করেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

"তোমাদের যার জমি আছে সে যেন তাতে চাষাবাদ করে, যদি নিজে না করতে চায় তবে যেন অন্য ভাইকে জমিটি চাষ করার জন্য দান করে দেয়।"[১৫৬] এটি ইসলামের আখলাকি তথা নৈতিক নির্দেশনা। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্র অস্থায়ীভাবে এমন আপদকালীন আইনও করতে পারে, যাতে করে ফসল উৎপাদনে অনাগ্রহী জমির মালিক আগ্রহী কৃষকদেরকে তা বিনিময় ছাড়া ধার দেয়। এভাবে সকল উর্বর জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশনা প্রদান করেছে ইসলাম।

অনুর্বর জমিকে উর্বর করা

শুধু উর্বর জমিতে ফসল চাষাবাদ করার নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ইসলাম। বরং মরুভূমি এবং অন্যান্য অনুর্বর জমিকে সেঁচের মাধ্যমে চাষের আওতায় নিয়ে আসার এক অপূর্ব ও যুগান্তকারী ঘোষণাও প্রদান করেছেন হযরত রাসূলে কারীম (সা.)। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অনুর্বর) জমিকে জীবিত করবে সেটির মালিক হবে সে নিজে।"[১৫৭] অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি কেউ স্ব-উদ্যোগে আবাদ করে ফসলের উপযুক্ত করলো এর মালিকানা স্বত্ব সে ভোগ করবে। এমনটি করতে হলে সরকারের পূর্বঅনুমোদন নেওয়া লাগবে কিনা-এ ব্যাপারে মুজাতাহিদীনে কেরামের দু'টি মত রয়েছে। তবে বিষয়টি সকল মাজহাবে স্বীকৃত। ফিকহ ও হাদীসে বিষয়টি ইহয়াউল মাওয়াত নামে প্রসিদ্ধ। যার অর্থ হচ্ছে, মৃত (অনুর্বর) জমি জীবিত (চাষাবাদ) করা। এভাবেই ইসলাম সকল খালি ভূমিকে ফসল উৎপাদনের আওতায় এনে খাদ্যসংকট থেকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে এবং এটাই হলো আত্মনির্ভরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমগ্র বিশ্বে যত জমি খালি পড়ে আছে সেগুলোর কিছু অংশও যদি এভাবে উর্বর করে তাতে খাদ্য উৎপাদন করা হয় তবে সহজেই খাদ্যের সংকট দূর করে জাতিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব হবে।

ভূমিহীনদের ভূমি বরাদ্দ দান

হাদীস ও সীরাতের কিতাব সমূহে একটি অধ্যায় রয়েছে আলইক্তা নামে। যার অর্থ জমি বরাদ্দ দান। দেশের পরিত্যক্ত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিগুলো ভূমিহীনদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়ার বিধান রয়েছে ইসলামে। বর্তমানে দেখা যায় তেলা মাথায় তেল দেওয়ার অবস্থা কার্যকর। অর্থাৎ সরকারি জমি বরাদ্দ পেয়ে থাকেন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ। প্রান্তিক কৃষকগণ তার আশাও করতে পারে না। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আর তাদের হাতে জমি গেলেই সেটিতে ফসল উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সরকার ইচ্ছা করলে চাষাবাদ করার শর্তেই তা তাদেরকে দিতে পারে।

ইসলামের বিভিন্ন দিকনির্দেশনার আলোকে আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করার লক্ষ্যে খাদ্য-সংকট দূরীভূত করার জন্য যা যা করা দরকার তা হল-

- শুধু শিল্পের প্রসার নয়, সাথে সাথে কৃষির প্রবৃদ্ধির উপরও নজর দিতে হবে।

---

১৫৬ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২১৮৯, পৃ. ১৭৭

১৫৭ *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৬৩, পৃ. ২৪০ আগস্ট ২০০৬

- আমাদের মত দরিদ্র দেশে কৃষিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। সময়মত যেন কৃষকরা সার, বীজ পায় এবং সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

- দেশের সকল উপযুক্ত জমিকে কৃষির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

- কৃষি জমিতে প্রয়োজনের অধিক বিশাল বিশাল বাড়ি, বাগান-বাড়ি করে কৃষি জমি নষ্ট করা বন্ধ করতে হবে।

- প্রয়োজনে কৃষকদেরকে বিনা সুদে, মুনাফায় ঋণ দিতে হবে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর কারেন্ট একাউন্টে গচ্ছিত টাকার একটি অংশ দ্বারাও এ কাজ করা যেতে পারে।

- উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে এবং গবেষণার মাধ্যমে এক ফসলি জমিকে দু'ফসলি করে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

- মানুষের তেমন কোনো কাজে আসে না অথবা শুধুই তথাকথিত বিনোদনের কাজে আসে এমন কোনো কাজের জন্য বা এ ধরনের পণ্য তৈরির জন্য শিল্প-কারখানা করে জমি নষ্ট করা বন্ধ করতে হবে।

৫.২.২৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ তৈরি করা

আমাদের দেশের অনেক আলেম-ওলামা অসচ্ছলতার কারণে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্খিতরূপে অবদান রাখতে পারছেন না। এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক এর একটি পদ সৃষ্টি হলে এবং তাতে আমাদের দেশের ৩ লক্ষ আলেমকে নিয়োগ দান করলে একদিকে তাদের জন্য একটি নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। অপরদিকে বর্তমান সমাজের নৈতিক অক্ষয়ের বেহাল দশারও উন্নতি ঘটবে। তাতে করে তারা নিজে আর্থিক সাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সমাজেরও উপকার সাধিত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের প্রথম থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা অনুরাগী করে গড়ে তুলতে বিরাট সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে। এভাবেও আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে আলেম-ওলামাগন অবদান রাখতে পারেন।

৫.২.২৪. শিল্পায়নে মানুষকে উৎসাহ দান

শিল্পখাত অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। কারণ শিল্পায়নের অভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেকারত্বসহ নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হলে উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং ব্যাপক শিল্পায়নে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। আমাদের দেশের অনেক ব্যক্তি বা গ্রুপ অব কোম্পানি আছে যারা ইচ্ছা করলেই বড় বড় কলকারখানা গড়তে পারে। বেকারদের কাছে শিল্পায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে শিল্পোন্নয়নের পথ তরান্বিত করে সে খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহযোগিতা করে নিজেও লাভবান হতে পারেন। ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে, জাতি আত্মনির্ভরশীল হবে, সেই সাথে দেশও অনেক উন্নতি লাভ করবে।

৫.২.২৫. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন

আর্থসামাজিক উন্নয়নে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক থাকলেও তার ব্যবহার সীমিত। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার যেমন একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্থ করে। তেমনি উক্ত সম্পদের

সদ্ব্যবহার না করে সে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কাজেই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এর সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সচেতন করে তোলা কিংবা প্রতিটি মসজিদের মাধ্যমে ইমাম সাহেবগন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এভাবে মসজিদের ইমাম ও খতিব সাহেবগন ধর্মীয় কাজে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৫.২.২৬. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে জনশক্তি রপ্তানি

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হলেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকায় অনেক দক্ষ, অদক্ষ, শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, বেকার তরুণ তরুণী বিভিন্ন দেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমন করে থাকে। এ কারণে প্রবাসে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী কর্মরত। রেমিট্যান্স পাঠিয়ে তারা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য মতে, বিশ্বের ১৬৮টি দেশে বাংলাদেশের কর্মীরা কাজ করতে যায়। ১৯৩টি দেশের মধ্যে ৫৮টি দেশে কূটনৈতিক সংযোগ রাখার জন্য বাংলাদেশের ৭৭টি মিশন রয়েছে, এর মধ্যে ৫৯টি পূর্ণাঙ্গ দূতাবাস। কয়েকটি দেশে রয়েছে একাধিক মিশন। আর ১৩৫টি দেশে বাংলাদেশের কোনও কূটনৈতিক মিশন নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশি শ্রমিকরা কাজ করতে যান এমন ১৬৮টি দেশের মধ্যে ১১০টি দেশে কোনও শ্রম কল্যাণ উইং নেই।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (Bureau of Manpower, Employment and Training-BMET) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৬ লাখ ৪ হাজার ৬০ জন বাংলাদেশি কর্মী উপসাগরীয় ও অন্যান্য আরব দেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছে। ২০১৮ সালে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন কর্মী বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে অভিবাসন করেছিল। ১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১ কোটি ২৮ লাখ ৩ হাজার ১৮৪ জন কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে অভিবাসন করেছে।[১৫৮]

কিন্তু প্রবাসে যেতে অবৈধ পথে যাওয়ার চেষ্টা করে অনেক প্রবাসগামী বাংলাদেশী নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। দালালদের খপ্পরে পড়ে তারা সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে যায়। অনেক সময় চাঁদাবাজির শিকার হয়ে দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অনেকে স্বনির্ভরতা অর্জনের পরিবর্তে সর্বস্ব হারিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হন। এ বিষয়ে সরকারি নজরদারি আরো বাড়ানো উচিৎ। কেননা তাদের ঘাম ঝরানো রেমিটেন্স বর্তমানে বাংলাদেশের আয়ের একটি বড় উৎস। আমাদের দেশ থেকেও অনেক সময় অসহযোগিতার অভিযোগে দেখা যায় বিদেশগামী শ্রমিক আন্দোলন, বিক্ষোভ, অথচ র‍্যামিটেন্স যোদ্ধাদের যাওয়া আসা সব জায়গায় রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতা পাওয়ার কথা ছিল। যে ব্যবস্থা আছে তা আরো ঢেলে সাজানো দরকার। কেননা তারা কর্মের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সম্ভাব্য কোন কোন দেশে বাংলাদেশী প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো যেতে পারে, সেটি চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক চ্যানেলগুলোও ব্যবহার করছে। এসব বাজার গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ, বিশেষ করে পোল্যান্ড, আলবেনিয়া ও রোমানিয়া। এশিয়ার মধ্যে নজর দেয়া হয়েছে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার দিকে।

---

[১৫৮] বাংলা ট্রিবিউন ০৫ জানু : ২০২০খ্রি.

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোও (বিএমইটি) ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড আধুনিকায়ন করতে প্রয়োজনীয় তদারকি বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনতে তারা প্রবাসী শ্রমিকদের একটি ডাটাবেজ তৈরি এবং সেটি হালনাগাদ রাখারও চেষ্টা করছে। আশা করা হচ্ছে যে এই মিথস্ক্রিয়ামূলক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া কেবল আমাদের প্রবাসী কর্মীদের কর্মকান্ডের তদারকিই বাড়াবে না, কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের সহযোগিতাও করবে।

কিন্তু প্রবাসের নামে যে সর্বনাসের সংবাদ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোয় প্রতারক দালালদের হাত ধরে হাজারো দারিদ্র তাড়িত মানুষ কিভাবে সমুদ্র পথে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসী হিসেবে প্রবেশের চেষ্টা করছে। তা হতাশাজনক। বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর সংলগ্ন উপকূলীয় জঙ্গলের বর্বর ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার করা এবং তাদের স্বপ্নভঙ্গের দৃশ্য টেলিভিশনে দেখাটা সত্যি হৃদয়বিদারক।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ভালোটাই আশা করতে হবে এবং বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে কানাডা একটি ভালো অপশন হতে পারে। যেখানে শ্রম নিবীড়, নার্সিং, প্রৌঢ়দের সেবা, রিটেইল ওয়ার্ক এবং নির্মাণ প্রকল্পের মতো সেবাধর্মী কাজের বিপুল চাহিদা রয়েছে। সত্য যে, সেখানে যেতে হলে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে উচ্চতর দক্ষতা লাগবে, তবে বাংলাদেশ সরকার কানাডিয় কর্মপরিসরের সঙ্গে উপযোগী সফট স্কিল উন্নয়নে কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে বিশেষ কর্মসূচি বিবেচনা করতে পারে। এ ধরনের চাহিদাভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে উভয় দেশই উপকৃত হবে। এটি আমাদের রেমিট্যান্স সেক্টরেও সাহায্য করবে। এগিয়ে যেতে আমাদের নিজেদের উপরই নিজেদের বিশ্বাস করতে হবে। বাংলাদেশের অভিবাসন সম্ভাবনা সম্পর্কেও এটি প্রযোজ্য। এটি যথেষ্ট বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সময়ান্তরে আমরা বিশেষ করে বাইরের নির্মাণ, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা এবং সেবা খাতে একটা বিশেষ জায়গা দখল করতে সমর্থ হব। যথাযথ বৃত্তিমূলক ও ডিজিটাল প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা বৈদ্যুতিক মেরামত, প্যারামেডিকেল সহায়তা, পানি, গ্যাস, স্যানিটেশন লাইন সংস্কার এবং হিসাব বিদ্যায় আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান খুঁজতে সমর্থ হব। এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা ও আগল ভাঙতে সাহায্য করবে।[১৫৯] সর্বোপরি দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করতে পারলে তারা যেমন ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে, তার মধ্য দিয়ে দেশের বৈদেশিক উপার্জন বৃদ্ধি পাবে, জাতীয় উন্নয়ন তরাণ্বিত হবে।

৫.২.২৭. সমাজের অপরাধী, বন্দী ও কয়েদীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহযোগিতা

চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও নানা অপরাধে জড়িত মানুষগুলোও এই সমাজের অংশ। তাদেরকে বাদ দিয়ে এই সমাজ কখনো আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। তাদের আত্মসংশোধন ও আত্মনির্ভরশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা রাষ্ট্র, সমাজ, আলেম, ইমাম, খতিব সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাহলে তারাও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে মানবীক জীবনযাপন করার সুযোগ পাবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দয়া ও কল্যাণকামিতা ছিল সব মানুষের জন্য। তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতো না সমাজের অপরাধীরাও; বরং তাদের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ মমত্ব ও কল্যাণকামিতা। কারো ভেতর কোনো অপরাধপ্রবণতা দেখা দিলে তিনি প্রথমেই তা সংশোধনের চেষ্টা করতেন। যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। আবার অপরাধ প্রমাণিত হলে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগ করতেন। যেন তা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত না হয়।

অপরাধপ্রবণতা কমাতে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার কথা বলে আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞান। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অপরাধপ্রবণতা দূর করতে এই পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি এমনভাবে অপরাধের স্বরূপ উন্মোচন করতেন যে মানুষের অপরাধ স্পৃহা দূর হয়ে যেত। যেমন, এক যুবক হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে

---

[১৫৯] দৈনিক বনিক বার্তা ২৭ সেপ্টে : ২০২১

ব্যভিচারের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তোমার মা, মেয়ে, বোন, ফুফি ও খালার সঙ্গে কেউ এমন করুক এটা কি তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না, এটা কেউ পছন্দ করবে না। তখন হযরত রাসূল (সা.) তাকে বললেন, মানুষও তার আপনজনের সঙ্গে ব্যভিচার পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি তার পাপমুক্তি ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দোয়া করলেন।[১৬০]

হযরত রাসূল (সা.)-এর সময়ে কেউ কোনো অপরাধ করলে তিনি তার নাম উল্লেখ না করেই মানুষকে সতর্ক করতেন, যেন অপরাধীর আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যখন তাঁর কোনো সাহাবির ব্যাপারে কোনো অভিযোগ পৌঁছাত, তখন তিনি বলতেন না অমুকের কী হলো; বরং তিনি বলতেন, মানুষের কী হলো তারা এমন কাজ করে?[১৬১]

কেউ অপরাধ করলে তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিতে বলেছেন। ইসলামী শরিয়তে শাস্তির যে বিধান রয়েছে তার মূল উদ্দেশ্যও ব্যক্তির আত্মসংশোধন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো দাসী (অবিবাহিত) ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তা প্রমাণিত হয়, তখন তাকে দোররা মেরে তাকে শাস্তি দাও। কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা কোরো না। যদি সে আবারও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে দোররা মেরে শাস্তি দাও। কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা কোরো না। তার পরও যদি সে ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে বিক্রি করে দাও একটি রশির বিনিময়ে হলেও।[১৬২]

মহানবী (সা.) অপরাধীদের মানবীক অধিকার ও উত্তম জীবন কামনা করলেও সার্বিক কল্যাণের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি কাউকে ছাড় দিতেন না। হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে, তাদের মধ্যে যখন কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাদের ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করত, তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে আমি তার হাত কেটে দেব।[১৬৩]

অপরাধীদের সঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণ ছিল অত্যন্ত মানবীক, ন্যায়সংগত ও কল্যাণের ধারক-বাহক। ঠিক যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি কঠোর হৃদয় ও রূঢ় আচরণকারী হতেন, তবে তারা আপনার পাশ থেকে সরে যেত। আপনি তাদের ক্ষমা করুন। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।"[১৬৪] অপরাধীরা যখন শাস্তি হিসেবে জেল খানায় বন্দী জীবনযাপন করে এই সভ্য যুগেও তাদের সঙ্গে যে অমানুষিক আচরণ করা হয়ে থাকে তা কারো অবিদিত নয়। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটানো হয় না। বরং নির্মম ও নির্দয় ব্যবহারের শিকার হয়ে থাকে তারা। ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় বন্দিরা। ফলে আত্মসংশোধন হয় না। যুদ্ধবন্দী ও বিভিন্ন অপরাধে কয়েদীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ইসলামী সরকার বাধ্য। হযরত রাসূলে কারীম (সা.) বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অপূর্ব সুন্দর ব্যবহার করেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজীর বিরল। তাই বন্দীদেরকে তাদের বন্দী অবস্থায় আত্মসংশোধন কল্পে ইসলামের সুমহান আদর্শ উপস্থাপন করে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি আত্মনির্ভর করার জন্য যোগ্যতা অনুযায়ি বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাতে তারা শাস্তি ভোগ করার পর অপরাধপ্রবণতা পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, মুক্তি পেয়ে

---

১৬০ *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৬, হাদীস নং- ২২২১১, পৃ. ৫৪৫

১৬১ *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৪৭১৩, পৃ. ৪৭০

১৬২ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২০৯২, পৃ. ৯০-৯১

১৬৩ প্রাগুক্ত, খ. ৭, হাদীস নং- ৩৯৭৩, পৃ. ১৫৪-১৫৫

১৬৪ সুরা আলে ইমরান, আয়াত :১৫৯

আত্মনির্ভর হতে পারে, তাহলে তারা অপরাধ প্রবণতা ছেড়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হবে, তার ব্যবস্থা করা।

৫.২.২৮. লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন

ইয়াতীম, অনাথ ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের লালন পালন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। মনে রাখা দরকার, যে সমাজে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ছিল সাধারণ ঘটনা সেই সমাজেই হযরত রাসূলের (সা.) বিপ্লবী চেতনার ফলে লা-ওয়ারিশ শিশুরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। তাদের লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত হয়। হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন-যে বেক্তি কোন দায়ভার রেখে যাবে তা বহন করা আমার কর্তব্য।[১৬৫] বায়তুল মাল হতেই এই দায়ভার বহনের বিধান করা হয়েছিল। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিশ সন্তানদের সম্পর্কেও এই একই নীতি অনুসৃত হতো।

৫.২.২৯. অমুলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান

ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকদের জন্যেই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত। বিধর্মীরা অক্ষম অবস্থায় জিজিয়া দেবে না, বরং রাষ্ট্র তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে বায়তুল মাল হতে।

৫.২.৩০. প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা

ইসলাম প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও তাদের ন্যায্য পাওনা সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণত প্রতিবন্ধী বলতে স্বাভাবিক কর্ম সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তিকে বোঝায়। প্রতিবন্ধী মূলত শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণেন্দ্রিয়র ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। তাদেরও মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে। ইসলাম প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম প্রতিবন্ধীদের মানবীক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মানুষকে কর্তব্য-সচেতন হওয়ার তাকিদ দিয়েছে। প্রতিবন্ধীরা শারীরিক, মানসিক কিংবা আর্থ-সামাজিক অক্ষমতা বা অসুবিধার কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। প্রতিবন্ধীর প্রতি দয়া-মায়া, সেবা-যত্ন, সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য-সহৃদয়তার হাত সম্প্রসারণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম মৌলিক অধিকারগুলো তাদেরও ন্যায্য প্রাপ্য। প্রতিবন্ধী সাধারণত দু'ধরণের হয়ে থাকে।

১. শারীরিক, শ্রবণ, বাক, বুদ্ধি ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের একটি অংশ জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী হয়।

২. দুর্ঘটনার কারণে প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হয়।

জন্মগত প্রতিবন্ধীই হোক আর দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধীই হোক, ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তাদের সাথে সদাচরণ করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তাদের অগ্রাধিকার দেয়া অবশ্য কর্তব্য। বিপদ-আপদে সবসময় প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানো মানবতার দাবি ও ঈমানী দায়িত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধীদের সাথে অসদাচরণ বা তাদের উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা ঠাট্টা-মশকরা করা সৃষ্টিকে তথা আল্লাহকে উপহাস করার শামিল।

তাদের মধ্যেও সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি আছে। ইসলামের আলোকে প্রতিবন্ধীদের পরমুখাপেক্ষিতার পথ থেকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে আনার সব রকম প্রচেষ্টা জোরদার করার তাকিদও আছে।

---

[১৬৫] *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২২৪০, পৃ. ২১০

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।[১৬৬]

সমাজে যাদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী বলে থাকি অনেকে তাদেরকে উপহাস করে থাকে। তাদেরকে অনেকে সমাজের বোঝা মনে করে. তারা যে সমাজের বোঝা নয় বরং তাদের রয়েছে একেকজনের একেক বিষয়ে নানা কাজ করার দক্ষতা সে সম্পর্কে তাদের পরিবার ও অন্য কেউ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বোঝার চেষ্টাও করেন না। বরং তাদেরকে লোক লজ্জার ভয়ে গোপন করে রাখে। অযত্ন, অবহেলায় তাদেরকে ফেলে রাখে, তাদের সাথে মানবীক আচরণ করে না। যা অত্যন্ত দু:খজনক ও ইসলাম বিরোধী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।"[১৬৭]

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সা:-এর কাছে কোনো সামাজিক শ্রেণিভেদ ছিল না। তিনি সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। বরং নবী কারীম (সা.) সমাজের অবহেলিত লোকদের ব্যাপারে একটু বেশিই খোঁজখবর নিতেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাদের অধিকারের প্রতি সজাগ থাকতে সাহাবিদের নির্দেশ দিতেন। তাই দেখা যায়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কে নবীজী (সা.) তাঁর অপার ভালোবাসায় ধন্য করেছেন। আর হযরত রাসূল (সা.) যখনই তাঁকে দেখতেন, তখনই বলতেন, مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل স্বাগতম জানাই তাকে, যার সম্পর্কে আমার প্রতিপালক আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন। হযরত রাসূল (সা.) তার সম্মানে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিতেন।[১৬৮]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে,

اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى

"মহানবী (সা.) ইবনে উম্মে মাকতুমকে দুবার মদীনার খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি অন্ধ থাকা অবস্থায় তাদের নামাজে নেতৃত্ব দেন।"[১৬৯] এ জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন নবী কারীম (সা.)-এর অনুসরণীয় সুন্নত বটে।

জন্মগত প্রতিবন্ধী হোক কিংবা দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধীই হোক; ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের বিভেদ ভুলে তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। তিনি সেই প্রতিবন্ধী সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) একজন ক্বারী, আলেম, ফকীহ, প্রথম হিযরতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, মানুষের বিচার ফয়সালাও করতেন এমনকি তাকে আজান দেওয়ার কাজেও নিযুক্ত করেছিলেন।

---

১৬৬ সূরা আল হাদিদ, আয়াত: ২২-২৩

১৬৭ সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১১

১৬৮ আল্লামা শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহনাফ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, দিল্লী : মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, তা.বি., খ. ১৯, পৃ. ১৮২

১৬৯ *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, হাদীস নং- ১৩০০০, পৃ. ৩০৭

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কে আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনা করেছেন শুধু অন্ধ সাহাবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ١ ۝ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٢ ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ

"তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে এক অন্ধ আগমন করেছে। আপনি কি জানেন? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো।"[১৭০] আমাদের সমাজে অনেক অন্ধ হাফেজ আছেন যারা সম্মানের সাথে কুরআনের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে ও নানা কাজ করে সমাজ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধী শ্রেণির সামাজিক সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই রয়েছে সমান অধিকার। ইসলাম প্রতিবন্ধী শ্রেণিকেও সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য করে, তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করে না। প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে প্রধান বাধা সমাজ ব্যবস্থা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, যানবাহনসহ সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়া তাঁদের জন্মগত অধিকার। প্রতিবন্ধী বান্ধব সমাজ ব্যবস্থা সমাজের উপযোগি হিসেবে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব প্রতিটি পরিবার, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্রের। সবার সামান্য সহযোগিতাই প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে। প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে এখন সমাজ ব্যবস্থা বাঁধা হয়ে আছে। এসব সামাজিক প্রতিবন্ধিতা দূর করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধীরা আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজের নেতিবাচক ধারণার কারণে প্রতিবন্ধীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য যানবাহনে আসনের ব্যবস্থা করা, পরীক্ষার সময় বাড়ানো, পরীক্ষার সময় শ্রুতিলেখকের ব্যবস্থা রাখা এবং চাকরিতে কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। একই সঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পাল্টাতে হবে। সমাজের এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পেলে একজন প্রতিবন্ধীও সুন্দর ও সুস্থভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে। অনুকূল পরিবেশ, আর্থিক সহযোগিতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে তারাও সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারে। প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অক্ষমতার জন্য দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের প্রতি অন্যদের মতো সুন্দর আচরণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবীক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সমাজের এই অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেকে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান, চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। তারা আমাদেরই সন্তান, ভাই-বোন তাই তাদের অবজ্ঞা না করে মানব সম্পদে রুপান্তর করে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৫.২.৩১. আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণে কতিপয় বিশেষ সুপারিশ

যেহেতু দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত এবং ইচ্ছা করলেই সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এত অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই এর বিকল্প হচ্ছে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কিন্তু এ দেশের যুব সমাজের নিকট আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা স্বচ্ছ ও যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে দীর্ঘ দিনের সামাজিক মল্যবোধে ও পুঁথিগত পড়াশুনার কারণে যুব সমাজ জীবিকা বলতে চাকরিকে বুঝে থাকে। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমান যুব ও তরুণ সমাজ ও আগামী প্রজন্মকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এ বলে যে, কোনা পেশা বা কাজই ছোট ও অপমানের নয়।

---

[১৭০] সূরা আবাসা, আয়াত: ১-৩

২. স্ব স্ব এলাকার আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র গুলোর তালিকা প্রণয়ন করে বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. স্ব স্ব এলাকার আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যারা স্বাবলম্বী ও সফল হয়েছে তাদেরকে বিদ্যালয়ে এনে শিক্ষার্থীদের তাদের জীবন কাহিনী শোনাতে হবে।

৪. বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে যে সকল শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে কিংবা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ পায় না তাদেরকে বিভিন্ন উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও ঋণদান ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে পর্যাপ্ত ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. আত্মকর্মসংস্থানকে সামনে রেখে যুব উন্নয়ন ব্যাংক ও শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সহজ শর্তে সুদ বিহীন ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অভাবী, দরিদ্র, বেকারদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সব ধরনের আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. মসজিদের ইমাম, খতিব, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে সহযোগিতা, উৎসাহ প্রদান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করণে সরকারি নিয়ম কানুন সহজ ও সহজলভ্য করা।

৯. দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে সহজ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

১০. জনগণকে সৎ, ন্যায়পরায়ন, দায়িত্বশীল ও উৎপাদনমুখী হতে উৎসাহ উদ্দীপনার ব্যবস্থা করা।

৫.২.৩২. অর্থ সম্পদ বৈধ পন্থায় বিনিয়োগ করা

মহান আল্লাহ পাক মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। শুধু নামাজ রোজা, হজ্ব ও যাকাত আদায় করার নাম ইবাদত নয়: বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম অনুসারে যখন যা করা হবে তাই ইবাদত রুপে গণ্য হবে। মুমিন ব্যক্তির যাবতীয় কর্মই ইবাদাত। তাই অর্থ সম্পদ হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে উপার্জনের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিনিয়োগের বিশাল ক্ষেত্র হচ্ছে বাণিজ্য। হালাল উপার্জনের একটি অনন্য পন্থা। ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- আল্লাহপাক ব্যবসাকে বা কেনাবেচাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।[১৭১] অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ঘ্রাস করো না কিন্তু পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[১৭২]

যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে ব্যবসা করে তারা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান। যারা আল্লাহর অন্যান্য বিধান পালন করতঃ সৎভাবে ব্যবসা করে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন "সেই সকল লোক যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে"।[১৭৩]

---

[১৭১] সূরা আল বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫

[১৭২] সূরা আন নিসা, আয়াত:-২৯

[১৭৩] সূরা আননূর আয়াত: ৩৭

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় আল্লাহ পাক মানুষকে তাদেরকে অর্থ সম্পদ হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে বলেছেন অর্থাৎ যে সকল পণ্য সামগ্রী ইসলামীক দৃষ্টিকোনে হালাল সেখানে বিনিয়োগ করে ব্যবসা করে উপার্জন করে আত্মনিভরশীল হতে বলেছেন। আর সৎ ব্যবসায়ী আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় না, আল্লাহর বিধান পালনে সে সর্বদা তৎপর থাকে। একজন সৎ ব্যবসায়ী মানুষকে ওজনে কম দিতে পারে না। পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে তা বিক্রি করতে পারে না। আল্লাহর বিধান পালনকারী একজন ব্যবসায়ী ব্যবসার ক্ষেত্রে কখনও কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না। অসৎ ব্যবসায়ীরা মানুষকে ওজনে কম দেয়, পণ্যে নানা ধরনের ভেজাল মিশ্রিত করে বাজারকে অস্থির করে তুলে। এতে করে ক্রেতাদের দুর্ভোগ চরমে পৌছে যা সম্পূর্ন হারাম। এরা বাহ্যিক লাভবান হয় বটে; কিন্তু এদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এদের করুণ পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে লওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে।"[১৭৪] যে সকল সৎ ব্যবসায়ী সঠিকভাবে মেপে দেয়, ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেয় না তাদের সু মহান মর্যাদা ও শুভ পরিণাম ঘোষণা করে আল্লাহপাক এরশাদ করেন- "মেপে দিবার সময় পূর্ণভাবে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[১৭৫]

অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের আকণ্ঠে নিমজ্জিত আমাদের সমাজ। অবৈধ ব্যবসার ছড়াছড়ি আজ সর্বত্র। আমাদের সমাজে অনেক লোক আছেন যারা তথাকথিত ব্যবসার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রেখে মাসিক ১০% বা ২০% হারে লাভ পেয়ে থাকে। বিনা কষ্টে এই টাকা পেয়ে তারা মনে করেন এটা ব্যবসা। এটা তাদের সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। আসলে এটা সুদ। এই সুদকে তারা খোড়া যুক্তি দিয়ে ব্যবসা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। ব্যবসার নাম নিয়ে সুদের লেনদেন করছেন আমাদের সমাজের অনেকে। এদের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- তাদের অনেককেই তুমি দেখবে পাপে সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে (সুদ, ঘুষ-দুর্নীতিতে)" তৎপরঃ তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট।[১৭৬] ব্যবসা তো হচ্ছে সেটা যাতে টাকা বিনিয়োগ করা হয়, চিন্তা ফিকির ও পরিশ্রম করা হয় এবং লাভ ক্ষতি উভয়টাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া হয়। ব্যাংক থেকে ২০% বা ৩০% লাভে বিনা পরিশ্রমে যা পাওয়া যায় তা সরাসরি সুদ। সুদকে ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে হযরত রাসূল (সা.) এরশাদ করেন-

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

"সুদের গুনাহের সত্তরভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তির নিজের মাকে বিয়ে করে"।[১৭৭]

আলকামাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

"সুদ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপরই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের লানত।"[১৭৮]

---

[১৭৪] সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১-৫

[১৭৫] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৫

[১৭৬] সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৬২

[১৭৭] *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ২২৭৪, পৃ. ৩২৩

[১৭৮] *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৯৪৭, পৃ. ১০১

ইসলামে হালাল ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা করার সময় ক্রেতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে ব্যবসায়ীর প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত খুশী হন। তাকে জান্নাত দান করেন।

সৎ ব্যবসায়ির শান-মান বর্ণনা করে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে হযরত রাসূল (সা.) এরশাদ করেন- "সত্যবাদী আমানতদার ও বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে নবীগণ সিদ্দিকগণ এবং শহিদগণের দলে থাকবেন"।[১৭৯]

জীবিকা হালাল হওয়ার কারণে বান্দার সব ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। সামান্য ইবাদতেই সে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আবার হালালভাবে ব্যবসা পরিচালনা করায় সে হাশরের ময়দানে এক মহান পুরস্কারে ভূষিত হবেন। তা হলো ওই লোকটি হাশরের ময়দানে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

৫.২.৩৩. আত্মনির্ভরশীলতার জন্য পর্যটন শিল্পে যা করণীয়

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধি প্রয়োজন। এ জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

১) ইসলামের আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে পর্যটন সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সহজে পৌঁছা যায় এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩) বিদেশি পর্যটকরা যাতে নির্বীঘ্নে অবস্থান করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) পর্যটন বিষয়ে ব্যাপক গণশিক্ষা এবং স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যটন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

৫) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা সম্পন্ন পর্যটক গাইড (Tourist Guide) গড়ে তুলতে হবে।

৬) পরিবহন খাতের ঝুঁকি কমাতে হবে। যাতে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা কোনো ঝামেলা ছাড়াই বিমান, লঞ্চ, বাস বা অন্যান্য যানবাহনে করে পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে।

৭) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৮) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্যগুলোকে প্রচারণার মাধ্যমে উপস্থাপন করে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে হবে।

৯) পর্যটকদের জন্য ভিসানীতি সহজীকরণ করতে হবে।

১০) দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১১) পর্যটনে বেসরকারি খাতকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিতে হবে।

১২) সর্বোপরি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতকে শক্তিশালী করার জন্য পর্যটন শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ শিল্পের বিকাশের পথের বাধাগুলোকে দূর করে একে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এ জন্য

---

[১৭৯] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১২১২, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা। এ শিল্পের বিকাশ শুধু অর্থনৈতিক লাভের জন্যই নয় বরং দেশের ভাবমূর্তির বিষয়টিও এর সাথে জড়িত। উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম একটি খাত হিসেবে পর্যটনকে প্রতিষ্ঠা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

৫.২.৩৪. আত্মনির্ভর জাতি গঠনে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা

প্রতিটি মসজিদ একটি প্রশিক্ষন কেন্দ্র। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সহ জুমআর নামাজের খুৎবায় তারা মুসল্লীদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে প্রয়োজনীয় বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। আত্মনির্ভরশীলতার বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম সাহেব তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরতে পারেন।

এছাড়া বর্ণিত সুপারিশমালায় উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তার এলাকার মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। কেননা হাদীসের পরিভাষায়- "ইমাম তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"।[১৮০]

ইমাম সাহেব তার মসজিদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিত্তবান ও স্বনির্ভর ব্যক্তিবর্গকে বেকার ও কর্মহীন লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সচেতন করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে উপযোগী ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যয়ের কল্যাণময় স্বেচ্ছামূলক নিম্ন বর্ণিত খাতে আর্থিক সহায়তা করার বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন-

৫.২.৩৪.১. ব্যয়ের কল্যাণময় খাতসমূহ

কুরআন এবং হাদিসে মুমিনদেরকে ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছামূলক দান করতে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। এই খাতগুলোতে আমাদের অংশগ্রহন বাড়লে আত্মনির্ভরশীলতার বাস্তবায়ন খুব সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ

"তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"[১৮১] এসব দানের প্রক্রিয়া ও খাত নিম্নরূপ :

সাধারণ দান

এটাকে সাধারণত, দান, খয়রাত (কল্যাণের কাজ), সদকা ইত্যাদি বলা হয়। অভাবী এবং বিপদগ্রস্তদের সব সময় সর্বাবস্থায় এ দান করা যায়। এ দানের একটি বড় খাত হলো আল্লাহর পথে দান করা। এ দানের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নায় আহবান জানানো হয়েছে দান করতে : আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন,

مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِیْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِیْرَ

"তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্‌ক হিসাবে দান করেছেন অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।"[১৮২]

---

১৮০ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ৮৪৯, পৃ. ১৭৪

১৮১ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৯২

যে সকল খাতে সাধারণ দান করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো-

ক. দরিদ্র অভাবী অত্মীয়-স্বজনকে।

খ. অভাবী প্রতিবেশীদেরকে।

গ. ফকির তথা নিঃস্ব সাহায্যপ্রার্থীদেরকে।

ঘ. সাধারণ অভাবী লোকদেরকে।

ঙ. অভিভাবকহীন বিধবাদেরকে।

চ. নিঃস্ব এতিমদেরকে।

ছ. মযলুমদেরকে।

জ. বিপদগ্রস্তদের সাহায্যার্থে।

ঝ. নিগৃহীত, ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদকৃত এবং মুহাজিরদের সাহায্যার্থে।

ঞ. নিঃস্ব পথিকদেরকে।

ট. ঋণগ্রস্ত দেউলিয়াদেরকে।

ঠ. পরের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তির কাজে।

ড. জনকল্যাণের কাজে (অর্থাৎ শিক্ষা, চিকিৎসা, জনপথ তৈরি, সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি, পানি সরবরাহসহ যাবতীয় মানব কল্যাণের কাজে ব্যয় করা)।

ঢ. মসজিদ নির্মাণের কাজে।

ইসলাম প্রচার প্রসারের কাজে দান

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র, হামলা ইত্যাদি প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার কাজে, মুসলিমদের স্বনির্ভর করার কাজে। কুরআন মজিদে এ খাতটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব কাজে ব্যয় করাকে কুরআন মজিদে এবং হাদিসে মুমিনদের জন্যে প্রভূত নেকি, সওয়াব, মর্যাদা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা নিজেদের অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের (দানের) উপমা একটি শস্যবীজ, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ এবং প্রত্যেক শীষে শতদানা। (এভাবেই) যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। তিনি মহা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী।[১৮৩]

উপহার বা হাদিয়া হিসেবে দান

আমাদের সমাজে অনেক অভাবী, অক্ষম ও দারিদ্র লোকজন বাস করে। এরা অনেক সময় আত্মীয় স্বজনও হতে পারে। তাদেরকে আত্মনির্ভর করার জন্য হাদিয়া দিয়ে সহযোগিতা করা যেতে পারে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

---

১৮২ সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ২৮

১৮৩ সূরা আল বাক্বারা : আয়াত ২৬১

قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পরস্পরকে ভালবাসার জন্য উপহার দাও।[১৮৪]

অসিয়তের মাধ্যমে দান

কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করে (আদেশ /উপদেশ দিয়ে) দান করে যেতে পারেন। তবে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে,

> হে ঈমানদারগন! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয়; অসিয়ত করার এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মানুষকে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, আর তোমরা যদি প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে।[১৮৫]

ইসলাম অসিয়ত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এর জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। মৃত্যুর পর এর জন্য রয়েছে বিশাল সওয়াব। কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যমতে অসিয়ত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত। হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ، يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

কোনো মুসলমানের জন্য যার কাছে অসিয়ত করার মতো কোনো বিষয় থাকে তাহলে দুরাতও অসিয়ত লিখে সংরক্ষণ না করে অতিবাহিত করা উচিত নয়।[১৮৬]

হেবা

হেবা হলো কোনো ব্যক্তিকে স্থায়ী ও নিঃস্বার্থভাবে নিজের কোনো সম্পদ দিয়ে দেয়া। কোন বিনিময় ব্যতিত কাউকে কোন সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া।

ফল বা উৎপাদন ভোগের সুবিধা প্রদান

এটা হলো নির্দিষ্ট মওসূম বা সময়ের জন্যে নিজের কোনো বাগান বা গাছের ফল কিংবা গাভীর দুগ্ধ কাউকেও ভোগ করার সুবিধা দান করা। কোন অভাবী ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে এ ধরনের দান করা যেতে পারে।

আকস্মিক সংকট উত্তরণে সাহায্য করা

এটা হলো হঠাৎ কেউ কোনো সংকটে, সমস্যায় বা বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা। ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারিতে বা কোন বিপদ আপদে পড়লে তাদের সহযোগিতার জন্য পাশে দাঁড়ানো। তাদের আত্মনির্ভর হতে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা, প্রযোজনীয় দান করা। দান করার অসীম কল্যাণ সম্পর্কে কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে

---

১৮৪ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.), [অনু., মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, খ ২, হাদীস নং- ১৬, পৃ. ৬২৬

১৮৫ সূরা মায়েদা, আয়াত : ১০৬

১৮৬ *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ২৫৫১, পৃ.৭৫

অবহিত করেছেন। এর জন্যে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ

তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করোনা। আর ইহসান (দয়া ও সহানুভূতিমূলক আচরণ) করো পিতামাতার সাথে, অত্মীয় স্বজনের সাথে, এতিমদের সাথে, অভাবীদের সাথে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে, অনত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে, সাথি বন্ধুদের সাথে, পথিকদের সাথে এবং তোমাদের অধিনস্ত ভৃত্যদের সাথে। জেনে রাখো, আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদের পছন্দ করেননা, যারা কার্পণ্য কঞ্জুসি করে, মানুষকে কৃপণতার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ (অর্থ সম্পদ) থেকে তাদের যা দান করেছেন তা গোপন করে রাখে। এ ধরনের অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে আমি অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। (আর ঐ সব লোকদেরও আল্লাহ পছন্দ করেন না) যারা কেবল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থ সম্পদ দান করে।[১৮৭]

দান সম্পর্কে কুরআন মজিদে আরো এ সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক হাদিস আছে। যা আমাদেরকে দান করতে উৎসাহ যোগায়।

আত্মনির্ভরশীলতা সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করা, দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিলেবাস প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিক্ষা মেনে শুধু জাতির অলঙ্কারে পরিণত না হয়। সে মর্মেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, আত্মনির্ভরতার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাত্মকব সহযোগিতায় সহজলভ্য করে এ খাতে প্রয়োজনে আলাদা বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। তাহলে আমরা বিশ্বের বুকে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাড়াতে সুযোগ পাবো।

৫.৩. আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাসমুহ

অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে বর্ণিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে আমরা উক্ত সুপারিশমালার প্রয়োগিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার উদ্ভব হবে বলে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি। তন্মধ্যে কতিপয় সমস্যা নিম্নরূপ :

১। সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প মাথাপিছু আয় ও মূলধনের স্বল্পতা
২। কারিগরি জ্ঞানের অভাব
৩। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব
৪। রাজনৈতিক অস্থিরতা
৫। রাজনৈতিক অস্থিরতা

[১৮৭] সূরা আন নিসা : আয়াত ৩৬-৩৮

৬। সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা
৭। উৎপাদনে হালাল-হারাম নিরূপন না করা
৮। অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা
৯। কৃষি জমির অপব্যবহার
১০। পণ্য উৎপাদনে ভেজাল উপকরণের ব্যবহার
১১। পরকালীন জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
১২। প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব
১৩। ধর্ম চর্চায় উদাসীনতা
১৪। বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী আইন না থাকা
১৫। আইনের শাসন বাস্তবায়নে দুর্বলতা
১৬। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা, অনৈতিকতার প্রসার
১৭। প্রতারক, ধোঁকাবাজ, অপরাধীদের দৌরাত্ম
১৮। মাদকের সহজলভ্যতা
১৯। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাতের বিধান না থাকা
২০। সহজ শর্তে ও বিনা সুদে মুনাফাভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা না থাকা
২১। বেকার, দরিদ্র, অসহায়, অভাবীদের শহরমূখী হওয়া
২২। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের অচেতনতা
২৩। তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার
২৪। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে জনগণের অসচেতনতা
২৫। দারিদ্র্য
২৬। অশিক্ষতি ও অদক্ষ জনশক্তি
২৭। দুর্বল অবকাঠামো
২৮। শিল্পের অনগ্রসরতা
২৯। স্বল্প মাথাপিছু আয়
৩০। আমদানি নির্ভরতা
৩১। বৈদেশিক সাহায্য
৩২। প্রাকৃতিক দুর্যোগ
৩৩। ঋণখেলাপীদের দৌরাত্ম্য
৩৪। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি
৩৫। দুর্নীতি
৩৬। শ্রমিকদের ধর্মঘট, হরতাল অবরোধ ইত্যাদি
৩৭। বেকার সমস্যা
৩৮। সরকারী নীতি বাস্তবায়নে ধীর গতি
৩৯। প্রাকৃতিক সম্পদে অপূর্ণ ব্যবহার
৪০। উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব
৪১। দক্ষ জনশক্তির অভাব

৪২। মূলধন গঠনের নিম্নহার

৪৩। উদ্যোক্তার অভাব

৪৪। শিক্ষার অভাব

৪৫। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব

৪৬। খাদ্য ঘাটতি

৪৭। প্রতিকূল ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি।

৫.৪. গবেষণা থেকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরকরণের উপায়সমূহ

বর্ণিত উক্ত সমস্যাবলী দূরকরণের নিমিত্তে সম্ভাব্য উপায়সমূহ অবলম্বন করলে আশা করা যায় যে, গবেষণায় বর্ণিত সুপারিশমালা বস্তাবায়ন সম্ভব হবে এবং একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। সম্ভাব্য উপায়সমূহ হলো :

১। উৎপাদন ক্ষমতা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মূলধনের গঠন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে।

২। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজার প্রসার লাভ করতে হবে।

৪। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন খাতের অগ্রাধিকার প্রশ্নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৬। দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির পথকে সহজতর করতে হবে।

৭। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। কৃষি ও শিল্পখাতে বিনিয়োগ সহজলভ্যকরণ

৯। আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নততর করা।

১০। প্রযুক্তির উন্নয়ন

১১। শিক্ষার বিস্তার

১২। খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণতা অর্জন

১৩। দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি

১৪। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি

১৫। প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য দূর করা

১৬। আকস্মিক সংকট উত্তরণে সাহায্য করা

১৭। দ্বীন ইসলামের পুর্ণ প্রতিষ্ঠা করা

১৮। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও বিনিয়োগে সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন

১৯। প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

২০। অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা, শাসন ও বিচার-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করা,
২১। উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি
২২। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন
২৩। দক্ষ প্রশাসন
২৪। রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং স্থিতিশীলতা
২৫। সামাজিক নিরাপত্তা
২৬। পরিকল্পিত উন্নয়নের সূচনা
২৭। জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমোন্নতি
২৮। শিল্প উন্নয়ন
২৯। কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার
৩০। উন্নত মুদ্রা বাজার
৩১। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
৩২। অবকাঠামের উন্নয়ন
৩৩। রপ্তানী বৃদ্ধি
৩৪। শিল্পের প্রসার
৩৫। বিনিয়োগ বৃদ্ধি
৩৬। শিক্ষার প্রসার
৩৭। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যাবহার
৩৮। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
৩৯। কৃষির উন্নয়ন
৪০। কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার
৪১। ঋণখেলাপি সংস্কৃতির অবসান
৪২। স্বচ্ছ,জবাবদিহিতামূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিতকরণ
৪৩। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থান
৪৪। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন
৪৫। যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি
৪৬। উদ্ধৃত্ত পণ্যের রপ্তানি
৪৭। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস
৪৮। প্রযুক্তি বিদ্যার আমদানি
৪৯। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি
৫০। বাজারের বিস্তৃতি
৫১। মূলধন বৃদ্ধি
৫২। একচেটিয়াত্ব প্রতিরোধ
৫৩। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা
৫৪। খাদ্য ঘাটতি পূরণ
৫৫। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

৫৬। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার

৫৭। হালাল উপায়ে উপার্জন ও হারাম পথ বর্জন

৫৮। সুদ উচ্ছেদ

৫৯। ব্যবসায়িক অসাধুতা উচ্ছেদ

৬০। যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

৬১। সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৬২। মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন

কুরআন ও হাদীস সমূহ হতে শ্রমনীতি সম্পর্কে যেসব মানবিক মূলনীতি পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে কতিপয় মানবিক শ্রমনীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

- উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক মজুর-শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এ ক্ষেত্রেও সে রকম সম্পর্ক থাকবে।
- অন্ন বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে। মালিক যা খাবে ও পরবে শ্রমিককেও তাই খেতে ও পরতে দেবে।
- সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই শ্রমিকদের সাধ্যমতো দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, তার বেশী নয়। শ্রমিককে এত বেশী কাজ দেওয়া উচিৎ হবে না যাতে সে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না, যার ফলে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। শ্রমিকের কাজের সময় নির্দিষ্ট হতে হবে এবং বিশ্রামের সুযোগ থাকতে হবে।
- যে শ্রমিকের পক্ষে একটি কাজ করা অসাধ্য তা সম্পন্ন হবে না এমন কথা ইসলাম বলে না। বরং সে ক্ষেত্রে আরও বেশী সময় দিয়ে বা বেশী শ্রমিক নিয়োগ করে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- শ্রমিকদের বেতন শুধুমাত্র তাদের জীবন রক্ষার জন্যে যথেষ্ট হলে হবে না। তাদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা রক্ষার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ভিত্তিতেই বেতন নির্ধারণ করতে হবে।
- উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ বা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশও শ্রমিকদের দান করতে হবে।
- শ্রমিকদের কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তাদের প্রতি অমানুষিক আচরণ বা নির্যাতন করা চলবে না। বরং যথাযথ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।
- চুক্তিমত কাজ শেষ হলে অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে শ্রমিককে দ্রুত মজুরী বা বেতন পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি বা গাফলতি করা চলবে ন।
- পেশা বা কাজ নির্বাচন করার ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কেও দর-দস্তর করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। বিশেষ কোন কাজে বা মজুরীর বিশেষ কোন পরিমাণের বিনিময়ে কাজ করতে জবরদস্তি করা যাবে না।
- কোন অবস্থাতেই মজুরদের অসহায় করে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তারা অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে পেনশন বা ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বায়তুল মালের তহবিল ব্যবহৃত হতে পারে।

৬৩। ওশরের প্রবর্তন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইসলামী করণ

৬৪। উত্তরাধিকার ব্যবস্থার যৌক্তিক রূপদান

৬৫। ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান, এবং

৬৬। বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা

অর্থ-সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত, সদাকাতুল ফিতর, কাফফারাহ, ওশর, খারাজ, গণীমতের মাল ও ফাই, জিজিয়া, খনিজ সম্পদের আয়, নদী ও সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চামাংশ, ইজারা ও কেরায়ার অর্থ (টাকা), মালিক ও উত্তরাধিকারহীন সম্পদ, আমদানী ও রফতানী শুল্ক, রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন জমি, বন ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা, শরীয়াহ মোতাবেক আরোপিত কর এবং বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অনুদান ও উপঢৌকনের মাধ্যমে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উপসংহার

পরনির্ভরশীলতা হল রক্তশূণ্যতা বিশেষ। অর্থ সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে যা রক্ত করে মানুষের দেহের জন্য। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্ত স্বল্পতা দেখা দিলে মানুষের দেহে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপ সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে। তা যেমন ব্যক্তি জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তেমনি করে সামষ্টিক জীবনে। কারণ মানুষের আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয় জন্ম মুহূর্ত থেকেই। অর্থ সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি মান-মর্যাদা থাকে না তেমনি পরনির্ভরলশীল জাতিও বিশ্বে জাতিসমূহের সামনে সম্মান সম্ভ্রম থেকে হয় বঞ্চিত। এ বঞ্চনা ও অবমাননা হতে মুক্তির লক্ষে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। মহানবী (স.) রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর সামনে এক উজ্জ্বল শিক্ষা ও আদর্শ।

সমাজে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ, সংঘাত-সহিংসতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা চলছে, এসব অনাচার থেকে পরিত্রাণ না পেলে কোনো জাতি স্বনির্ভর বা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। তাই ইসলামের শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা না গেলে কিংবা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে শুধু কিছু সুনির্দিষ্ট ইবাদাত ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ইসলামের মৌলিক স্পিরিট মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে না। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়ন করে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিকে উপেক্ষা করা হলে আত্মনির্ভরশীলতার যে আলোচনা এ অভিসন্দর্ভে আলোকপাত করা হয়েছে তার সুফল প্রাপ্তি হবে সাময়িক। তবে ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যবস্থায় একটি দেশ বা জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করতে অক্ষম। আমার অভিসন্দর্ভে এ বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি আমার এ গবেষণা জ্ঞানের জগতে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে এবং এটিকে কেন্দ্র করে আরো উচ্চতর গবেষণা সম্প্রসারিত হবে।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমস্যা, সম্ভাবনা, সমাধান ও সুপারিশমালা ইত্যাদি অত্র অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হলো। যদি এর আলোকে আমাদের অর্থনীতি ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় তাহলে বাংলাদেশ হবে স্বনির্ভর ও জাতি হিসেবে আমরা হতে পারবো আত্মনির্ভরশীল। সর্বোপরি বিজ্ঞ পাঠকমহল, গবেষকবৃন্দ এবং সর্বসাধারণ এ গবেষণাকর্ম থেকে উপকৃত হলেই কেবল আমার এ গবেষণাকর্মটি সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন ও তাফসীর গ্রন্থ

১. আল-কুর'আন

২. *আল-কুরআনুল করীম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

৩. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, কায়রো: মাকতাবাতে ইবনে তাইমিয়া, তা.বি.

৪. আল্লামা মুফতী মোহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা ১৪০০ হিঃ।

৫. আল্লামা শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহনাফ আলআনসারী আলকুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, মাকতাবাতুল ইসলামীয়া, খ. ১৯

৬. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি., ১৩তম খণ্ড

৭. ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *তাফসীর আদদুররে মানসুর*, অনুবাদ, মারুফ আর রুসাফি, দারুস সাআদাত, ফেব্রুয়ারি ২০২১, খণ্ড ৬

৮. কাজী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী, *তাফসীরে বায়যাবী*, বৈরুত: দারু এহইয়াউত তুরাস আল আরাবী, ১ম খণ্ড

৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী, আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার মিন উমুরি রসূলিল্লাহি স. ওয়া সুনানিহী ও আইয়্যামিহি [সহীহুল বুখারী], বৈরুত : দারু তুকিন্নাজাহ্, ১৪২২হি.

১০. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) (অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, ১ম থেকে ১০ম খণ্ড।

১১. আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, ১ম থেকে ৭ম খণ্ড।

১২. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি./ ১৯৫৬খ্রি.

১৩. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], তিরমিযী শরীফ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ (১৯৯২ থেকে ২০০৭) [তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

১৪. আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০খ্রি.

১৫. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), আবু দাউদ শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. ড. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক; সম্পা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ], ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ (তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ড)

১৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিসতানী, সুনান আবূ দাউদ, কানপুর : আল্-মাত্বা আল্- মজীদী, ১৩৭৫ হি./ ১৯৩৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড।

১৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী (অনুবাদ, ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ কে এম আব্দুস সালাম), *সুনানু ইবনে মাজাহ*, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, ১ম থেকে ৩য় খণ্ড।

১৯. আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন আল-ফাদল বিন বাহরাম বিন আবদ আল-সামাদ আল-দারেমি সমরকন্দি, *সুনান আদ দারেমী*, করাচি : কদেমি কুতুবখানা, তা.বি., ২য় খণ্ড

২০. আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী (সম্পাদনায়: আব্দুল কাদির আতা), *সুনান আল-বায়হাকী*, মক্কা আল-মুকাররমা : মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি/১৯৯৪ খ্রী.) ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২১. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, তা.বি., প্রথম খণ্ড।

২২. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.), *মুসনাদে আহমাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা.বি.।

২৩. আবু বকর আহমাদ ইবনু হুসাইন আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৪০৬হি.

২৪. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২৫. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী আল-বাইহাকী, *আল জামে লি শু'আবিল ঈমান*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, তা.বি.

২৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুজাইমাহ আস-সুলামী আন-নিসাপুরী, *সহীহ ইবন খুযাইমাহ*, বৈরুত : আলমাকতাবুল ইসলামী, তা.বি.

২৭. আল্লামা আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী (অনুবাদ : ডঃ এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান), *এন্তেখাবে হাদীস*, ঢাকা : ভুইয়া প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.।

২৮. আল্লামা আমিনুর রশীদ ইবনে আবেদীন শামী (রহ.), *রদ্দুল মুহতার*, রিয়াদ : দারু আলেমুল কুতুব, তা.বি. ৩য় খণ্ড

২৯. আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত্-তাব্রিযী রহ. (অনুবাদ, মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.

৩০. আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী *মিশকাতুল মাসাবীহ*, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: হাদিস একাডেমী, ২০১৬।

৩১. আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতি, *জামেউস সাগীর*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি., ১ম খণ্ড।

৩২. আলা উদ্দিন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫খ্রি.

৩৩. আবি বকর আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবি শায়বা, *মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা*, সৌদি আরব, রিয়াদ, দারে কুনুজ ইসবিলিয়া, ষষ্ঠ খণ্ড,

৩৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, বৈরুত: মুয়াসসাতুর রিসালাহ, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) [অনুবাদ : মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১

৩৬. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৩৭. মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাওলানা শফিকুল ইসলাম খান, *বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন*, ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স, তা.বি.

৩৮. আবূ উবাইদ আল-কসেম ইবনে সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, ইসলামাবাদ: ইদারাহ তাহকিকাতে ইসলামী, ১৯৮৬

৩৯. আবু ইউছুফ, *কিতাবুল খারাজ*, ইসলামাবাদ : দারুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৬খ্রি.

৪০. আহমাদ শালাবী, *আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়্যাহ*, কায়রো : দারুল আরব, ১৯৯১

৪১. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, "বৃক্ষরোপণ ও ইসলাম", নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *পরিবেশ সংরক্ষণে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.

৪২. ইবনু মুফলিহ আল-মাক্বদিসী, *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৩৯১ হি. ২য় খণ্ড

৪৩. ইবনু মুফলিহ আল-মাক্বদিসী, *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৩৯১ হি.

৪৪. ইমাম নববী, *তাহরীরু আলফাযিত তানবীহ*, দামেশক : দারুল কলম, ১৪০৮ হি.

৪৫. ইমাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবি বকর আল মারগিনানী, *হিদায়া শরহে বিদাযাতুল মুবতাদী*, করাচি: ইদারাতুল কুরআন ওয়ার উলুমুল ইসলামিয়া, তা.বি.

৪৬. এ জেড এম শামসুল আলম, *ক্রীতদাস থেকে সাহাবি*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৯খ্রি.

৪৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.

৪৮. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহঃ), *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১১খ্রি.

৪৯. মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ, *ইসলামের শ্রমিকের অধিকার*, ঢাকা : পাথেয় পাবলিকেশন্স, ২০১৪খ্রি.

৫০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহঃ), *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২খ্রি.

৫১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০খ্রি.

৫২. মাওলানা শায়েখ নিজাম, *ফতোয়ায় হিনদিয়া*, বৈরুত : দারুল ফিকার, তা.বি., ১ম খণ্ড

৫৩. মাওলানা হিফজুর রহমান (অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আউয়াল), *ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি.

৫৪. মুফতী মুহাঃ ত্বকী উসমানী (অনুঃ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন), *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৫খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. মুহাম্মদ আল-আমাসি (১৪২৩ হি.), *রাবি' আল-আবরার* (প্রথম সংস্করণ), আলেপ্পো : দার আল-কালাম আল-আরাবি, তা.বি.

৫৬. মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রুফ, কাজী আবু হোরায়রা, *ইমামদের ক্ষমতায়ন*, ঢাকা : ডা. আলমগীর মতি, ২০০৮খ্রি.

৫৭. মুহাম্মাদ আমিনুসসাহীর বি ইবনে আবেদীন, *ফাতাওয়া শামি*, রিয়াদ : দারু আলিমীল কুতুব, তা.বি.

৫৮. শরীফ আলী জুরজানী, *কিতাবুত তারীফাত*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি.

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৬০. Muhammad Nuruddin Urduniyah, *al Qardh al Hasan Wa Ahkamuhu Fi al Fiqh al Islamy*, 2010, Nablus, Palestine : Jamiah an Najah al Wathoniyah, p.12

৬১. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৬ খ্রি.

৬২. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী (অনুবাদ, হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক), *আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব*, ঢাকা : হাসনা পাবলিকেশন, ২০১৬ খ্রি.

৬৩. Professor Raihan Sharif, *Islamic Economics : Principles and Applications*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985

৬৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খ্রি.

৬৫. ড. মায়েজুর রহমান, *খাদ্য সমস্যাও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭খ্রি.

৬৬. ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণ তত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০ খ্রি.

৬৭. ড. মুহাম্মদ সালেহ আল আদেলী, *আল ইসলাম ওয়াল বিয়া* (রিয়াদ : আধুনিক ফিকহী পবেষণা পত্রিকা, ১৯৯৪ খ্রি.)

৬৮. তাকিউদ্দিন আন নাবহানি, *আন নিজামুল ইকতিসাদি ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারুল উম্মাহ, তা.বি.

৬৯. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, *দারিদ্র ও বেরাকত্ব দুরীকরণ ইসলামী দৃষ্টিকোন*, ঢাকা : শিরীন পাবলিকেশন, তা.বি.

৭০. গোলাম মোস্তাকীম, *বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭

৭১. A Glossary of Islamic Economic Terms, see Dr. Mohammad Omar Farooq, *Qard al-Hasan Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking*, paper was presented at Harvard Islamic Finance Forum, April 19-20, 2008

Dhaka University Institutional Repository

৭২. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *কোর্ট মার্শাল আমি মৃত্যুকে পরোয়া করি না*, ঢাকা : সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৭৩. অধ্যাপক, রায়হান শরীফ, ইসলাম সোস্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.

৭৪. ইবন খালদুন, *মুকাদ্দমা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১

৭৫. ইমাম আবু বকর আল রাযি আল জাসসাস, *শরহু মুখতাসারিত তহাবি*, দারুল বাশাইরিল ইসলামীয়া, দারুস সিরাজ, তা.বি.

৭৬. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮

৭৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০

৭৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র*, মুজিবনগর প্রশাসন, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮২

৭৯. মলয় কুমার ভৌমিক, "*বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ, ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব*", ঢাকা : আই.বি.এস. জার্নাল, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

৮০. Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. 2012. *Tourism: principles, practices, philosophies*, New York: John Wiley and Sons Inc.

৮১. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা : প্রতীতি, ২০০৯

৮২. Homayoon, (MV.) H., 2005. *Tourism, Intercultural Communication,* Tehran : Tehran University of Imam Sadeq (AS).

৮৩. Ibn Battūta, *Travels in Asia and Africa: 1325-1354*. New york: Routledge Curzon, 2004 AD.

৮৪. সংকলক : নজরুল ইসলাম, *বজ্রনিনাদ*, ঢাকাক : জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০২২খ্রি.

৮৫. মিঠুন সাহা, *বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-ভাবনা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০২০ খ্রি.

৮৬. Zaman, S. M. Hasanuz, *Definition of Islamic Economics (1984)*.

৮৭. RSSRN: https://ssrn.com/abstract=3127466

৮৮. আবুল কাসেম আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল মা'রুফ বির রাগিব আল ইস্পাহানী, *আলমুফরাদাত ফি গরীবিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, তা.বি.

৮৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফি আধুনিক বাংলা-ইংরেজী-আরবী অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৮

৯০. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬

৯১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.

৯২. Dr. Islam Mohammad Hashanat, Dr. A. H. Khan, and K. N. Akhi, *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* Sahitya Sambher, Dhaka, January 2016

৯৩. নজরুল ইসলাম (সংক.), *বাংলাপিডিয়া*, ১৩শ খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

৯৪. Md. Fazlur Rahmān, *Adhunik Arabic- Bangla Ovidhan (Modern Arabic-Bengali Dictionary).* Dhaka : Riyad Publication, 2015.

৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬

৯৬. সাদী আবু হাবীব, *আল-কামুসুল ফিকহ*, ইসলামাবাদ : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামীয়াহ, তা.বি.

৯৭. ড. আহমাদ মুখতার উমর, *মুজামু লুগাতিল আরবিয়্যা আল মুআসিরা*, খণ্ড ৩

৯৮. আবুল খালেক, "বিশ্বনবী (সঃ) এর কর্মসূচীতে অর্থনীতির রূপ", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৯৫ খ্রি.

৯৯. Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. "Halal tourism : Concepts, practises, challenges and future." *Tourism management perspectives.*2015

১০০. BTB Act, Bangladesh Tourism Board Act, 2010. Act 37, Justice and Parliamentary Affairs : People's Republic of Bangladesh.

১০১. Din, Kadir H. 1989. "Islam and tourism: Patterns, issues, and options." *Annals of tourism research 16*

১০২. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন, ২০১২ খ্রি.

১০৩. Lectures on Islamic Economic Thoughts, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Jeddhah : Islamic Development Bank, 1992

১০৪. গাজী শামছুর রহমান, "রাসূল (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় কৃষক", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ১৯৯৮ খ্রি.

১০৫. World Travel & Tourism Council (WTTC) Report 2012

১০৬. Resource UNDP Human development report, Delhi : Oxford University prass, 1994

১০৭. U.S Environmental Protection Agency National Emission Report, U.S.A May-1976

১০৮. The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), Report 2017, p.6

১০৯. দৈনিক বনিক বার্তা ২৭ সেপ্টেঃ ২০২১

১১০. দৈনিক যুগান্তর ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

১১১. দৈনিক যুগান্তর, ১২ এপ্রিল ২০১৯

১১২. দৈনিক সময়ের আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২১

১১৩. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৫ মে ২০১৯

১১৪. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৪ জানুয়ারি ২০২১

১১৫. বাংলা ট্রিবিউন ০৫ জানু: ২০২০

১১৬. www.dailyinqilab.com/2014/5/18

১১৭. http//www.dailyinqilab.com/2014/5/20

১১৮. http//www.ittefaq.com.bd/donrmochinta/2015/5/1

১১৯. http://islamicfoundation.gov.bd › site › page › যাকা...

১২০. http:www.alokitobangladesh.com/islam& economic 2014/04/27

১২১. https://bangladesh.gov.bd › files › files › policy

১২২. https://www.bbc.com › bengali › news-56872708

১২৩. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক [উদ্ধৃত- http://www.bangladesh.gov.bd বাংলাদেশের অর্জন

১২৪. www.islamweb.net